পরিমল গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-গল্প

পরিমল গোস্বামী

বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪

বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪
হইতে শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী কর্তৃক প্রকাশিত
প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯৫৪

মূল্য : পাঁচ টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস-কর্তৃক মুদ্রিত

পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গ গল্প

পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গ গল্পের আমি একজন অনুরাগী পাঠক, অবশ্য আরও অনেকে আছেন। পরিমল বাবু ও আমি প্রায় একই সময়ে লিখিতে আরম্ভ করি, তারপরে আমাদের দুজনের রচনার ধারা দুই ভিন্ন দিকে গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার রচনার প্রতি আমার অনুরাগ বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

বর্তমানে হাসির গল্প ও ব্যঙ্গ গল্পের লেখকের অভাব নাই। সকলের উপরে আছেন পরশুরাম। আরও আছেন বনফুল, বিভূতি মুখুজ্জে, শিবরাম চক্রবর্তী, অ-কৃ-ব বা অজিতকৃষ্ণ বসু। সম্প্রতি গৌরকিশোর ঘোষ বা রূপদর্শী প্রখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই রচনারীতি ভিন্ন। ইঁহাদের সকলের গল্পেই কিছু কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের মিশাল আছে, কিন্তু পরিমলবাবুই বোধ হয় একমাত্র লেখক যিনি নিছক ব্যঙ্গ গল্প লিখিয়া থাকেন।

পরিমল বাবুর ব্যঙ্গ গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ব্যঙ্গ ইস্পাতের ছোরার ন্যায় অত্যন্ত হ্রস্বকায়, তাই বলিয়া ধার কম নয়, এবং উজ্জ্বলতাও যথেষ্ট। ইস্পাতের ছোরাখানা লেখকের কোমরবন্ধে কোথায় যে লুক্কায়িত সব সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না, হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া আঘাত করে, আবার বিদ্যুতের চমকের মত মেঘান্তরালে মিলাইয়া যায়। এই জন্যই তাহা ব্যঙ্গের তলোয়ারের চেয়ে বেশি মারাত্মক। যে আঘাত পায় সেই বিভ্রান্ত ব্যক্তি যখন বিস্ময়ে এদিক ওদিক সন্ধান করে, আর সকলে হাসিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ সতর্কতাও অবলম্বন করে।

অত্যন্ত পরিচিত ও সাধারণ ঘটনাকে উল্টাইয়া লইয়া পরিমলবাবু ব্যঙ্গ গল্পের কারবার করেন। মনে করুন এক সময়ে লোকে বিলাত-ফেরৎকে 'একঘরে' করিত, এখন কালের বদল হইয়াছে, বিলাতে এখন কে না যায়। এক গ্রামের লোকে সকলেই বিলাত ফেরৎ কেবল একজন ছাড়া। সকলে মিলিয়া তাহাকে 'একঘরে' করিল, বিলাত না যাইবার অপরাধে। তখন সে সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া পুনরায় জাতে উঠিল এবং শীঘ্রই বিলাত যাইবে স্বীকার করিল। এই যে প্রচলিত রীতিকে উল্টাইয়া লইয়া ব্যবহার ইহাই পরিমলবাবুর অধিকাংশ গল্পের সাধারণ কাঠামো। অঙ্গের বৈপরীত্যই ব্যঙ্গ। পরিমলবাবুর প্রায় প্রত্যেক গল্পকে উল্টাইয়া লইলেই একটি 'সিরিয়াস' গল্প হইতে পারে। এ বিষয়ে তিনি বিখ্যাত লেখক ষ্টিফেন লিককের সগোত্র।

পরিমলবাবুর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-গল্প সঙ্কলনের আবশ্যক ছিল। প্রকাশক সেই কাজটি করিয়া রসিক সমাজের ধন্যবাদ ভাজন হইলেন। এবারে আশা করিতেছি যে, পাঠক সমাজ বইখানির আদর করিয়া নিজেদের রসবোধের পরিচয় দিবেন।

২৭. ২. ৫ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

নি বে দ ন

অধিকাংশ গল্পেরই প্রেরণা সমসাময়িক ঘটনা, সেজন্য গল্পের সঙ্গে তারিখ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে সঙ্কলিত ৩৭টি গল্পের পটভূমি গত কুড়ি বছরের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ব্যাপ্ত। গল্পের ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে পার্থক্য তাতেও লেখকের হয় তো দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ছাপ।

রচনাকালের ক্রম অনুযায়ী গল্পগুলি ছাপা হলে ভাল হত, কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি, সেই ত্রুটি সূচীপত্রে সংশোধন করা হল।

মুদ্রণপ্রমাদ সামান্য দু চারটে আছে, এটি এদেশে অনিবার্য। যে দিন নির্ভুল মুদ্রণে বাংলা বই প্রকাশিত হবে সে দিন জাতীয় উৎসবের দিন।

বিহার সাহিত্য ভবনের শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী গ্রন্থ নির্বাচনে ব্যঙ্গ কৌতুকের দিকে ঝুঁকেছেন, সেজন্য এই গল্পগুলি বাছাইয়ের ব্যাপারে ব্যঙ্গের লেশমাত্র গন্ধ পেলেও সেটিকে তিনি হাতছাড়া করেন নি। "শ্রেষ্ঠ" নামও তাঁরই দেওয়া।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার এবং আক্ষরিক অংশে শ্রীশ্যামদুলাল কুণ্ডুর সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করছি।

কলিকাতা
মার্চ ১৯৫৪

পরিমল গোস্বামী

শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

সাধু হীরালাল

১

হীরালাল যখন স্কুলে পড়ে, তখন সে মনে করিয়াছিল বড় হইয়া উকিল হইতে হইবে, কারণ তাহার পিতা উকিল ছিলেন। উক্ত হীরালাল যখন স্কুল ছাড়িয়া কলেজে ভর্তি হইল তখন তাহার মত বদলাইয়া গেল, কারণ সে তখন বিজ্ঞান পড়িতেছে। তাহার মনে হইল, এম. এস-সি. পাস করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবে। কিন্তু আই. এস-সি. পাস করিয়া তাহার সে মতও পরিবর্তন হইয়া গেল। কারণ এই সময়ে তাহার বিবাহ হইল।

হীরালাল বি. এস-সি. পড়িতে পড়িতে স্থির করিল, কোনো রকমে পাসটা করিয়া ফেলিতে পারিলে মন দিয়া একবার সংসার করিয়া দেখিবে। স্ত্রীকে ছাড়িয়া বৎসরের মধ্যে ছয় মাস বিদেশে কাটানো তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য বোধ হইল। বিজ্ঞানের ছাত্র হইলেও হীরালালের মনটা ছিল অত্যন্ত নরম। এই কাহিনীটা উপমা প্রয়োগ করিয়া ইয়ার্কি করিতে করিতে বলিবার মতো হইলে বলা যাইত—মনটা ছিল তাহার জমানো শর্করার একটি খণ্ড। তাহার এক প্রান্ত তরল পদার্থে ডুবিয়া গলিয়া যাইতেছে, অপর প্রান্তটি এখনও কঠিন আছে। কিন্তু কাহিনীর গুরুত্ব উপমাপ্রয়োগের উপযুক্ত নহে, সেজন্য পাঠক ক্ষমা করিবেন।

হীরালাল যথাসময়ে বি. এস-সি. পাস করিয়া একবার পশ্চাতে চাহিল। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-চিহ্নিত পথ সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে তাহার দিকে চাহিয়া সে একটু হাসিল মাত্র। হাসিয়া সম্মুখে চাহিল। দেখিতে পাইল, সম্মুখভাগে মাসে তিন শত টাকা উপার্জনকারী পিতা বৈতরণী পার হইতেছেন।

হীরালাল মুহূর্তকাল চোখ বুজিয়া অগ্র এবং পশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিল, এবং দেখিয়াই বুঝিতে পারিল চাকুরির চেষ্টায় পথে পথে ঘুরিতে হইবে, মন দিয়া সংসার করা আর তাহার হইবে না। কিন্তু কথাটা হীরালালের নিজের কাছেও কেমন হাস্যকর বোধ হইল। কারণ সে অহরহ শুনিতেছে, যে-ব্যক্তি দশটা-পাঁচটা অফিসে থাকে সে সংসারী, আর যে-ব্যক্তি বাড়িতে বসিয়া থাকে সে বিবাগী। হীরালাল যেটা সংসার মনে করিয়াছিল, সর্বজনীন ভাষায় সেটা আশ্রম। আশ্রম!—কি নিষ্ঠুর পৃথিবী!

২

যথাসময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া হীরালাল চাকুরির চেষ্টায় দিন কাটাইতে লাগিল। চাকুরি কিছুতেই মিলিল না। কাগজের 'অণ্টেড'-কলম দেখিয়া দরখাস্ত দিলে চাকুরি মেলে না ইহা সে জানিত, তবু একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। অপরপক্ষে বাড়িতেও তো আর বসিয়া থাকা যায় না। হীরালাল তথাপি বাড়িতে বসিয়াই কিছু কিছু লেখা অভ্যাস করিতে লাগিল। মফঃসলের সংবাদদাতা হইয়া মাস তিনেক 'বিশ্বদূত' নামক বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ বিনামূল্যে লাভ করিল, তাহার বেশি কিছু হইল না।

একটি কর্তব্য তাহার এখনও বাকি ছিল। এমন দেখা যায়, লোকে কোনো একটা কিছু লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কিছুতেই তাহা লাভ করিতে পারিতেছে না। তখন লোকে মরীয়া হইয়া ওঠে। এবং দেখা যায় মরীয়া হইয়া উঠিলেই প্রার্থিত বস্তু লাভ করিতে পারে। হীরালালের এই কৌশলটি জানা ছিল। সে এখন এই কৌশলটিই প্রয়োগ করিল। সে মরীয়া হইয়া শহরে চলিয়া আসিল এবং মরীয়া হইয়া 'বিশ্বদূত'-সম্পাদকের কাছে কাঁদিয়া পড়িল—যে কোনো একটা কাজ দিতেই হইবে।

সম্পাদক মহাশয় সামান্য পঁচিশ টাকা বেতনে সংবাদ-অনুবাদের কাজে হীরালালকে নিযুক্ত করিলেন। ইহা ছাড়া সপ্তাহে একটি করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা সংবাদ ইংরেজী পত্রিকা লইতে সঙ্কলনের ভারও সে পাইল। ক্রমশঃ তাহার কাজের উন্নতি হইল। বেতন বাড়িয়া ক্রমশঃ চল্লিশ হইল এবং বিজ্ঞাপন বিভাগও তাহার হাতে আসিতে লাগিল।

কাজ যখন কোথাও জোটে না, তখন পঁচিশ টাকার কাজ দুর্লভ বলিয়া বোধ হয়, পরে চাকরিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে চল্লিশ টাকা তুচ্ছ হইয়া যায়। তাহাদেরই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া কত অশিক্ষিত লোক কত টাকা উপার্জন করিতেছে, আর সে বি. এস-সি পাস করিয়া সামান্য চল্লিশ টাকা উপার্জন করে। এক মিনিটের চিন্তার ফলে চাকরিতে তাহার ধিক্কার আসিল।

এমন সময় সেই শহরে হিম সাধু নামক এক সাধুর আবির্ভাব হওয়াতে সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। সাধু হিমালয় হইতে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হিম সাধু। হিম সাধু অলৌকিক ক্রিয়ায় সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহার সংবাদ প্রতি সপ্তাহে বড় বড় অক্ষরে 'বিশ্বদূতে' ছাপা হইতে লাগিল। হিম সাধু দশ হাত শূন্যে ঝুলিয়া থাকিতে পারেন, যতদিন

ইচ্ছা অনাহারে বাঁচিতে পারেন; হিম সাধু কুকুরকে বিড়াল এবং বিড়ালকে ইঁদুর বানাইতে পারেন। তিনি স্বয়ং ময়ূর হইয়া পেখম তুলিয়া নাচিয়া হাজার হাজার লোককে মুগ্ধ করিতেছেন এরূপ সংবাদ 'বিশ্বদূতে' ছাপা হইল। প্রুফ দেখিতে দেখিতে হীরালালের হঠাৎ মনে হইল, হায়, সেও যদি ময়ূর হইয়া নাচিতে পারিত!

হীরালালের মন টলিতে লাগিল। একটিমাত্র নিদ্রাহীন রজনী ভোর করিয়া হীরালাল হিম সাধুর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিল। হিম সাধু এক মাস শহরে ছিলেন, হীরালাল প্রতিদিন একবার করিয়া দেখা করিল। সাধু খুশি হইয়া বলিলেন, আগামী চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে হিমালয়ে আমার সঙ্গে দেখা করিস, তোকে দীক্ষা দেব।—বলিয়া তাহাকে তাঁহার ঠিকানা লিখিয়া দিলেন।

আগামী চৈত্র সংক্রান্তি। সে যে পুরা এক বৎসর! কিন্তু এদিকে যে হীরালালের মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে—টাকার কল্পনায় সে চঞ্চল—সে যে আর চাকরি করিতে পারিবে না। শর্করাখণ্ডের যে দিকটা গলিবার উপক্রম হইয়াছিল সেই দিকটা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিল। আর তো বাঁশীর আওয়াজ নয়, সে এবারে চৈত্র-সন্ন্যাসীর শিঙার আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছে।

হীরালাল কিছুদিন হইতে অসাধ্য কিছু করিবার কল্পনা করিতেছিল বটে, কিন্তু কল্পনা এরূপ স্পষ্ট রূপ লইয়া ইতিপূর্বে আর দেখা দেয় নাই। যদি কার্যে পরিণত হয় তাহা হইলে তাহার উচ্চাশা কিছু পূর্ণ হইতে পাবে। হীরালাল সম্পাদকের সঙ্গে পাঁচ-ছয়দিন ধরিয়া নানারূপ পরামর্শ করিল। সম্পাদক অবশেষে বুঝিলেন হীরালালের প্ল্যানে লাভ ছাড়া লোকসান নাই এবং তাহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

৩

পর-সপ্তাহেই 'বিশ্বদূতে' একটি অভিনব সংবাদ বাহির হইল :—

"পুনরায় অলৌকিক সাধুর আবির্ভাব। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, শহর হইতে দুই মাইল দক্ষিণে যে জঙ্গল আছে সেখানে রজনী-বাবা নামক বিখ্যাত সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে! তিনি দিনে ষোল আনা অদৃশ্য হইয়া যান, রাত্রে দেখা দেন। রাত্রে দেখা দেন বলিয়াই তাঁহার নাম রজনী-বাবা। রাত্রি বারোটার পর জঙ্গলের কেন্দ্রস্থলে আগুন জ্বলিবে। সেইখানে গেলে তাঁহার দর্শন মিলিবে। এই সাধুর বিশেষত্ব এই যে, ইঁহার কাছে যে যাহা প্রার্থনা

করিবে ইনি তাহাকে তাহাই দিবেন। ইনি মন্ত্রপূত একটি দ্রব্য দান করেন। এই দ্রব্য কবচে ধারণ করিলে এক বৎসর পরে কামনা পূর্ণ হয়।

"ইনি সুদীর্ঘ এক শত বৎসর আমেরিকায় ছিলেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক ইঁহারই কৃপায় কোটিপতি হইয়াছে। ইঁহার সংবাদ এতদিন প্রকাশ করা নিষেধ ছিল, এখন আর সে নিষেধ নাই। এক শত বৎসর আমেরিকায় বাস করিলেও ইনি খাঁটি বাঙালী। বাংলা কথা সবই বুঝিতে পাবেন, কেবল বলিতে পারেন না। মন্ত্রপূত দ্রব্যের মূল্য বাবদ মাত্র চারি আনা দিতে হয়।

"সাবধান। সাবধান।।

"সাবধান, কেহ রাত্রি বারোটার পূর্বে কিংবা রাত্রি তিনটার পরে জঙ্গলে থাকিতে পারিবে না। থাকিলে তাহার কামনা ব্যর্থ হইবে। বজনী-বাবার বয়স কেহ অনুমান করিতে পারে না, কেহ বলে দুই শত, কেহ বলে তিন শত বৎসর। কেহ ইহা অপেক্ষাও বেশি মনে করে। সাবধান, দুই শতের কম কেহ অনুমান করিও না, করিলে কামনা ব্যর্থ হইবে।"

'বিশ্বদূত' প্রতি শুক্রবারে বাহির হয়, সুতরাং সম্পাদক অনুমান করিলেন, শুক্রবার রাত্রি হইতেই সাধুদর্শনের ভীড় আরম্ভ হইবে। সেজন্য যথারীতি বন্দোবস্ত করা হইল। হীরালাল বুধবার রাত্রি হইতেই জঙ্গলে গিয়া আগুন জ্বালাইতে লাগিল। সে বৈজ্ঞানিক রীতিতে মাটির নীচে লুকাইয়া থাকিবার একটি গর্তও প্রস্তুত করিল। গর্তের উপরে খড়ের চালা উঠিল, গর্তটা সে গোপনে নিজ হাতে খুঁড়িল। এই সব প্রাথমিক কাজের জন্য সম্পাদক তাহাকে তিন দিনের ছুটি দিয়াছিলেন। কোনো হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিলে আত্মরক্ষা করিতে হইবে,' গর্তের উদ্দেশ্য ইহাই।

বন্দোবস্ত পাকা বৈজ্ঞানিক রীতিতে হওয়ায় সম্পাদক নিশ্চিন্ত হইলেন। হীরালাল যথারীতি শুক্রবার রাত্রি দশটার সময় জঙ্গলে গিয়া বসিল। সঙ্গে ঘড়ি ছিল। ঘড়িতে এগারোটা বাজিল, হীরালাল মুখে দাড়ি এবং মাথায় চুল পরিল। ঘড়িতে সওয়া এগারোটা বাজিল, হীরালাল নিজের কাপড় জামা গর্তে লুকাইয়া রাখিয়া কৌপীন পরিল। ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজিল, হীরালাল গায়ে ভস্ম মাখিয়া সংগৃহীত কাঠের স্তূপে আগুন জ্বালাইয়া দিল। বারোটা বাজিয়া পনেরো মিনিট হইতে না হইতে প্রার্থীদের কোলাহলে জঙ্গল মুখরিত হইয়া উঠিল।

৪

পরদিন সকাল আটটার মধ্যেই সম্পাদকের সঙ্গে হীরালালের দেখা হইয়া লভ্যাংশ ভাগ হইয়া গেল। মোট আয়ের পরিমাণ ৫০ টাকা। প্রাথমিক খরচ বাদ গেল ১০ টাকা। রিজার্ভ ফণ্ডে গেল ১০ টাকা। বাকী রহিল ৩০ টাকা। ৩০ টাকা দুই ভাগে ভাগ করিয়া হীরালাল নিজে ১৫ টাকা আর সম্পাদককে ১৫ টাকা দিল। সম্পাদক প্রথম দিনেই ১৫ টাকা পাইয়া পরবর্তী দিনগুলির কথা স্মরণ করিলেন। তাঁহার এত আনন্দ হইল যে, হীরালালকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া তিনি তাহার গণ্ডস্থলে চুম্বন করিলেন। এইরূপে 'বিশ্বদূতে'র প্রচারগুণে প্রত্যেকের প্রতি রাত্রে পঞ্চাশ-ষাট টাকা করিয়া লাভ হইতে লাগিল।

কিন্তু কবি বলিয়াছেন, মানুষের চিরদিন সমান যায় না। কবি এ কথা কেন বলিয়াছেন, তাহার কারণ অজ্ঞাত। মনে হয়, না বলিলেই ভাল করিতেন। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। বৈচিত্র্য এখন মানুষের 'চিরদিনে' একরূপ জোর করিয়াই প্রবেশ করিতেছে।

হীরালালের অদৃষ্টে এই সুখও টিকিল না। সে ক্রমাগত অসাধু উপায়ে সাধু সাজিয়া নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। বিরক্তির প্রধান কারণ লাভের অর্ধেক অংশ অকারণ সম্পাদককে দিতে হয়। ব্যবসায়ের মূল নীতি অনুসারে ইহা অন্যায় নহে, কিন্তু দুইজনের ব্যবসায়ে দুইজনেই ম্যানেজিং এজেণ্ট ইহা তাহার ভাল লাগিল না। তদুপরি রজনী-বাবা সম্পর্কে যাবতীয় প্রবন্ধ এবং চিঠিপত্র তাহাকেই লিখিতে হয়, সম্পাদক কিছুই লেখেন না। একজন কর্মী একজন উপস্বত্বভোগী ইহা তাহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সে ভুলিয়া গেল যে 'বিশ্বদূত' কাগজ তাহার নিজের নহে, অথচ এই কাগজের প্রচারের ফলেই তাহার এই ভাগ্য পরিবর্তন।

হীরালাল কর্তব্য স্থির করিল। অর্থাৎ সে একদিন আর জঙ্গল হইতে ফিরিল না। সে সেদিন পূর্বার্জিত সমস্ত টাকা (সমস্তই নোটে রূপান্তরিত) এবং সেই রাত্রের উপার্জিত প্রায় চারি শত সিকি লইয়া রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। নিরুদ্দেশ হইবার দিন যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এই—

বৃহস্পতিবার রাত্রে জঙ্গলে যাইবার পূর্বে হীরালাল লিখিল, "ভয়ানক সংবাদ! রজনী বাবা কোনো অজ্ঞাত কারণে অন্তর্ধান করিয়াছেন। আবার কবে ফিরিবেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। দুই শত বৎসরের পূর্বে ফিরিবেন

এরূপ আশা নাই।" (কম্পোজিটারগণ ইহা ছাপিতে গিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু হীরালাল বলিয়াছিল, রজনী বাবার নিজস্ব সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন, এবং বলিয়া দিয়াছেন কাগজে ছাপার আগে এ সংবাদ যেন প্রকাশ না হয়। এ কথা শুনিয়া তবে কম্পোজিটারগণ আশ্বস্ত হয়।)

হীরালাল লেখার শেষ প্রুফ দেখিয়া ছাপিবার অর্ডার দিয়া তবে অফিস হইতে বাহির হইল, এবং ঐ তাহার শেষ বাহির হওয়া।

হীরালাল সোজা নিজের গ্রামে গিয়া উঠিল। পথে তাহার মনে হইয়াছিল এইবার কিছুদিন শান্তিতে থাকা যাইবে, কিন্তু দুই দিন যাইতেই হীরালাল বুঝিতে পারিল সংসার মরুভূমি এবং শান্তি মরীচিকা।

টাকার পথে সে যে আলো দেখিয়াছিল, গৃহের পথে সে আলো নাই। গৃহ ছায়াময়, অর্থাৎ বিষাদময়, অর্থাৎ বিষময়। তাহার শ্বাসবোধ হইবার উপক্রম হইল। বন্ধনে তাহার মুক্তি মিলিল না। সে হিমালয়ের সাধুর কথা চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে তাহার মন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং ক্ষিপ্ততার উগ্রতায় সে একদিন ঘুমন্ত স্ত্রীকে ফেলিয়া চৈতন্যদেবের মতো গৃহত্যাগ করিয়া গেল।

গ্রামে প্রচার হইয়া গেল, হীরালাল সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক মাস পরে হীরালাল নিজে ঠিকানাহীন একখানা চিঠি দিয়া জানাইল, সে সাধু হইয়াছে। চিঠিখানা অবশ্য চৈত্র সংক্রান্তির পরে লেখা।

৫

কিছুদিন পূর্বে শিলিগুড়ি অঞ্চলে অতিকায় মানুষের পায়ের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' শঙ্কিত হইয়াছিলেন, এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, উহা কিং-কংএর পদচিহ্ন। কিন্তু কিং-কংএর পদচিহ্ন যে নহে তাহার একটি কারণ কিং-কং বলিয়া বাস্তব জগতে কোনো অতিকায় প্রাণী নাই। সিনেমা-জগতে কিছুদিন আগে এক কিং-কংএর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, কিন্তু সে কিং-কংএর পা ছিল না এবং পা ছিল না বলিয়া পদচিহ্নও ছিল না। সিনেমায় যাঁহারা কিং-কং দেখিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না—যখন কিং-কংএর বিরাট মূর্তি দেখানো হইতেছিল, তখন তাহার পায়ের দিকটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য ছিল। হাঁটু পর্যন্ত স্পষ্ট ছিল তাহার নীচের অংশ স্বচ্ছ হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ সিনেমার কিং-কং অতিকায় মানুষ নহে, অতিকায় হনুমান। তৃতীয়তঃ কিং-কং শব্দটির উৎপত্তি-স্থল চীন দেশ এবং চীন দেশের কোনো মানুষই অতিকায় নহে, তাহারা বেঁটে। সুতরাং শিলিগুড়ি অঞ্চলের অতিকায় মানুষের পদচিহ্ন সম্বন্ধে 'আনন্দবাজারে'র সন্দেহ অমূলক।

আসল ব্যাপার কি তাহা বলিতেছি। হীরালাল যে দিন হিম সাধুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া রূপান্তরী বিদ্যার কিয়দংশ আয়ত্ত করিল, সেদিন সে ঠিক করিল, এইবার তাহার দেশে ফিরিবার সময় হইয়াছে। কারণ এইবার সে তাহার অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ প্রকাশ্যে দেখাইতে পারিবে। এইবার সে দর্শনী লাভ করিয়া কোটিপতি হইবে এবং অবশেষে একদিন সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট হইয়া মহাসুখে কালযাপন করিবে। ইহা সে একপ্রকার স্থির করিয়া ফেলিল। কিন্তু দেশের একটি সংবাদ সে জানিতে পারিল না। সে জানিতে পারিল না যে, যে-'বিশ্বদূত' একবার তাহার উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল, তাহার পলায়নের পর সেই 'বিশ্বদূত' ধীরে ধীরে তাহার সব শঠতার কথা কৌশলে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে। সে জানিল না যে, এতদিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ 'বিশ্বদূত' তাহার জুয়াচুরির কথা প্রকাশ করিয়া গ্রাহক সংখ্যা চার-পাঁচগুণ বাড়াইয়া ফেলিয়াছে। কি করিয়াই বা জানিবে? হীরালাল সংবাদ-পত্রের জগৎ দূরের কথা, এতদিন সে মানুষের জগতেরই বাহিরে পড়িয়া ছিল। এতদিন সে ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘার কয়েক হাজার ফুট নিচে হিম সাধুর আশ্রমে।

৬

হীরালাল মানুষের পৃথিবীর সংবাদ কিছুই না জানিয়া, একদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার জঙ্ঘা-প্রদেশ হইতে দেশের পথে যাত্রা করিল। মাটির পথে নহে, আকাশের-পথে। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির সূত্র অনুসারে সে নিজের দেহকে এতদূর বাড়াইয়া লইল যাহাতে সেই বিশেষ ওজনের দেহটি আকাশপথে বিনা আয়াসে ঘণ্টায় এক শত মাইল উড়িয়া আসিতে পারে। তাহার দুইখানি হাত ডানায় পরিণত হইল। তারপর হীরালাল উড়িল। গভীর রাত্রে আকাশে কেহ চাহিয়া দেখিল না, আর দেখিলেও হয়তো মনে করিত বিমান উড়িতেছে।

শিলিগুড়ির কাছাকাছি আসিয়া হীরালালের বড় ইচ্ছা হইল একবার দেশের মাটি স্পর্শ করে। বহুদিন সে মাটি স্পর্শ করিতে পারে নাই। এক

জঙ্গলের ধারে নামিয়া হীরালাল কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইল। মাটির স্পর্শ তাহার কাছে বড় মনোরম বোধ হইল। (এই স্থানের মাটিতেই সে তাহার অজ্ঞাতসারে পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল এবং এই পদচিহ্ন লইয়াই সংবাদপত্রে আলোচনা হইয়াছে।)

অবশেষে হীরালাল দেশে পৌছিল। হীরালাল ছাত্রজীবনে একদিন গৃহের প্রতি আকর্ষণ বশতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, মন দিয়া সংসার করিবে, অর্থাৎ একাগ্র মনে বাড়ি বসিয়া থাকিবে। কিন্তু সংসারের স্পর্শ পাইয়াই বুঝিয়াছিল সংসারের মায়া সম্পূর্ণ না কাটাইলে সংসার করা দুঃসাধ্য। কিন্তু আজ তাহার অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। আজ সে হীরালাল নহে, সাধু হীরালাল। আজ সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সাধু হীরালাল। আজ সে পৃথিবীর সম্রাটের পদে অ্যাপ্রেন্টিস হীরালাল, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই সম্রাট হীরালাল। সুতরাং গৃহের প্রতি তাহার আকর্ষণও নাই, বিকর্ষণও নাই—আছে শুধু নবলব্ধ ক্ষমতা ব্যক্ত করিবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা।

সে আজ শুধু তাহার স্ত্রীর উপর নহে, জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে আসিয়াছে। সে আজ লক্ষ লোকের সম্মুখে ময়ূর হইয়া নাচিবে, বিড়াল হইয়া স্ত্রীর কোলে বসিবে।

কিন্তু গৃহে পৌছিয়া এ সব কিছুই করিবার দরকার হইল না। দেখা হইবামাত্র স্ত্রী নির্বোধের মত চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "ওগো তোমাকে পুলিসে ধরবে গো—" ইত্যাদি। গ্রামসুদ্ধ লোক কান্না শুনিয়া জানিয়া গেল সাধু হীরালাল ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কথাটা পুলিসের কানে যাইতে দেরি হইল না। পুলিস হীরালালকে ধরিতে আসিল। হীরালালের হাতে আর সময় নাই। এক মিনিটে কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। একবার মনে হইল পাখী হইয়া উড়িয়া যাইবে, একবার মনে হইল কীট হইয়া মাটিতে লুকাইবে। কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইবে? পুলিস জানিবে হীরালাল অলৌকিক ক্ষমতাবশতঃ ফাঁকি দিল এবং বাঁচিয়াই রহিল—কোথাও শান্তিতে থাকা যাইবে না। সুতরাং পুলিসের আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিল, এবং পুলিস যখন পঁচিশ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িল তখন তাহাদের সম্মুখ দিয়া হীরালাল ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। পুলিস তাড়া করিল, হীরালাল ছুটিয়া গিয়া নদীতে ডুবিয়া গেল, আর উঠিল না। পুলিস চেষ্টা করিয়াও আর তাহার সন্ধান পাইল না। সকলেই জানিল হীরালাল মরিয়াছে।

কিন্তু হীরালাল কি সত্যই মরিল? না, হীরালাল মরিল না, হীরালাল

কুমীর হইয়া জলে দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার স্ত্রী জলে স্নান করিতে গেলে একদিন মাত্র সে তাহাকে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এ-কথাও তাহার স্ত্রী সকলকে বলিয়া ফেলিল। তখন আবার দেশময় হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। কিছুদিন পূর্বে দিনাজপুর জেলায় এক নদীতে কুমীর দেখা গেল, সকলে বলিল ঐ হীরালাল। একটা কুমীর মারা গেল, সকলে বলিল ঐ হীরালাল মারা গেল। এ দুইটি সংবাদই পাঠক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় পড়িয়াছেন।

আসল ব্যাপার কি, তাহা কেহ জানে না। হীরালাল মরে নাই। সে কুমীর অবস্থায় প্রায় সাত দিন জলে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিয়া পুলিসকে জব্দ করা যায়! একবার তাহার মনে হইল সন্ত্রাসবাদী হইয়া ক্রমাগত পুলিস ধরিয়া খাইবে। কিন্তু ইহা তাহার মনঃপুত হইল না। একবার ভাবিল কম্যুনিস্ট হইয়া কলওয়ালাদের ধরিয়া ধরিয়া খাইবে। ইহাতে পুলিস প্রকৃত অপরাধী ধরিতে না পাইয়া অপদস্থ হইবে। কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল সে সাধু হইয়াছে, সুতরাং যদি প্রতিশোধ লইতে হয়, মহৎ প্রতিশোধ লওয়াই ভাল। তাহার মাথায় একটা বুদ্ধিও খেলিয়া গেল, এবং নিজের বুদ্ধিতে খুশী হইয়া কুমীর অবস্থাতেও হীরালাল খানিকটা হাসিয়া লইল। হাঁ এইবার ঠিক হইয়াছে! এইবার হীরালালকে তাড়া করা দূরে থাক্, পুলিস খাতির করিয়া অন্ত পাইবে না। শুধু পুলিস নহে, স্বয়ং বড়লাট তাহাকে খাতির করিবেন। ইহাকেই বলে প্রতিশোধ।

হীরালাল জল হইতে এক লাফে স্টাড বুল হইয়া ডাঙায় উঠিয়া আসিল।

(১৯৩৫)

রূপান্তর

বিজ্ঞান এসে ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত অনেক জিনিসই আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে অলৌকিক ব'লে মনে হয়। এই রকম একটি অলৌকিক কাহিনীর কথাই বলছি।

বেশি দিনের ঘটনা নয়।

রেভারেণ্ড কিং আমাদের পাড়ায় থাকেন। একেবারে খাঁটি ইংরেজ এবং খাঁটি খ্রীষ্টান। সেবাধর্মে, অহঙ্কারহীনতায়, বিনয়ে, আদর্শ পুরুষ। তাঁকে ভাল না বাসে এমন লোক আমাদের গড়িয়াহাটা অঞ্চলে নেই।

একটি দোতলা বাড়িতে তিনি থাকেন, কিন্তু নীচের তলাটি একটি গরিব পরিবারকে অতি শস্তায় ভাড়া দিয়েছেন—তত শস্তায় কলকাতায় এ রকম একতলা পাওয়া যায় না।

তিনি বিশেষ ক'রে গরিবদের বন্ধু। তাঁর চোখে ছোটবড় ধনীদরিদ্রে ভেদ নেই, ভারতবাসী ব'লে কাউকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখেন না, সবাইকে বুকে টেনে নেন। রোগীর সেবা করেন নিজহাতে। বস্তী অঞ্চলে সবাই তাঁকে দেবতা ব'লে জানে।

প্রথম প্রথম আমরা ক'জন বন্ধু তাঁকে সন্দেহ করেছি, সেবাধর্মের আবরণে আসলে তিনি খ্রীষ্টানধর্ম প্রচার করতে চান। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সে ভুল আমাদের ভেঙেছে।

তাঁর সরল মনে কোনো কু-অভিপ্রায় থাকতে পারে না, আমরাও তাঁর কাছে আমাদের মনের কথা খোলাখুলি ভাবেই বলতাম। তিনি যে আসলে সেবাপ্রাপ্ত লোকেদের খ্রীষ্টান করতেই চান, আমাদের মনের এই সন্দেহের কথাও একদিন তাঁকে বললাম।—

আপনি আমাদের এত উপকার করছেন, গরিব রোগীকে ওষুধ দিচ্ছেন, সহায়হীনকে আর্তকে নিজহাতে সেবা করছেন—এ পর্যন্ত বেশ ভালই, এ জন্যে আমরা আপনার কাছে বিশেষভাবে ঋণী, কিন্তু শেষে যদি দেখি আমাদেরই কোনো বন্ধুকে আপনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন, তা হ'লে আপনার উপর আমাদের সবার শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাবে।

রেভারেণ্ড কিং এ কথার উত্তরে হেসে বললেন, সে ভয় আপনাদের নেই, আমি খ্রাইস্টের বাণী আমার কাজের ভিতর দিয়ে প্রচার করি—জনসেবার

ভিতর দিয়ে আমি তাঁরই সেবা করি, তার বেশি তো আমি কিছুই চাই না। আমার ধর্মে দীক্ষিত ক'রে অকারণ খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমি গৌরবের মনে করি না।

তিনি আরও বললেন, ধর্ম হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্তরের জিনিস, বাইরে একটা নাম তার থাকে বটে কিন্তু পৃথক ভাবে তার কোনো দামই নেই। কোটি কোটি খ্রীষ্টান আজ হিংসায় মত্ত, তারা খ্রীষ্টান হয়ে পৃথিবীর কি লাভ হ'ল ?

রেভারেণ্ড কিং-এর কাছে আমাদের মাথা নত হ'ল। এ রকম কথা একজন খ্রীষ্টানের মুখে এই প্রথম শুনলাম। আমরা তাঁর ভক্ত মাত্র ছিলাম, এবারে তাঁর অনুগত হয়ে পড়লাম। আমাদের মধ্যে প্রীতি এবং অন্তরঙ্গতা এত বেড়ে গেল যে, শেষ পর্যন্ত আমরা কয়েকজন বন্ধু তাঁর সঙ্গে রীতিমতো সেবার কাজ আরম্ভ করলাম।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে কাজ ক'রে আমরা পারব কেন ?

তাঁর শাদা চুলের নিচে যে শুভ বুদ্ধি এবং শাদা দাড়ির নিচে যে সহৃদয়তা ছিল, তা আমাদের প্রতিপদে লজ্জা দিতে লাগল। তাঁর ষাট বছর বয়সেও যে উদ্যম এবং কর্মপটুতা ছিল তাও আমাদের মতো যুবকদের মধ্যে কারো ছিল না।

তবু আমরা যতদূর সম্ভব তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর কাজে সাহায্য করতে লাগলাম। আমাদেরই প্রতিবেশীরা কি রকম দুঃস্থ অবস্থায় দিন কাটায় তা আমরা এতদিন দেখেও দেখি নি। অসুস্থ হ'লে তারা বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে মারা পড়ে—তা আমরা এতদিন এমন ক'রে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাই নি।

আমরা তাঁর জনসেবার রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে তাঁর কাছে কত কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। বলেছি, আপনি এদের জীবন দান করেছেন।

কিন্তু তার উত্তরে তিনি বলতেন, একজনকে দু'জনকে বাঁচিয়ে আপনাদের বিরাট ভারতবর্ষের দুঃখ ঘোচাব কি ক'রে ? আমি যে সেবা করছি, এ সেবার মধ্যে আমি সম্পূর্ণ গৌরব অনুভব করতে পারি না।

কেন ?—আমরা প্রশ্ন করি।

এদের যেমন সেবা করছি, তেমনি সেই সঙ্গে আপনাদের সবাইকে যদি এদের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে পারতাম তা হ'লেই আমার সেবা সার্থক হ'ত।

তারপর একটু থেমে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। বোধ হয় বুঝতে চেষ্টা করলেন—আমরা তাঁর কথাটির মর্ম ঠিক মতো গ্রহণ করতে পেরেছি কি না। আমাদের দিকে চেয়ে তিনি কি বুঝলেন জানি না, তবে তিনি বলতে

লাগলেন, আপনাদের দেশের লোককে আপনারা অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছেন, অথচ এ দেশের লোক তারা। আপনাদের কাছে তারা কিছুই পায় না। আমরা দূর দেশ থেকে এসে আপনাদের অপরিচিত আদিবাসীদের মধ্যে গিয়ে মিশি, তাদের সেবা করি, তাদের সঙ্গে আধুনিক জগতের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করি, তারপর যখন আপনারা দেখেন ওরা আমাদের ভালবাসতে শুরু করেছে, তখন আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে লাগেন। কিন্তু বলুন তো আমাদের দোষ কি? আপনারা কোনো দিন যাদের স্পর্শ করেন না, চেনেন না, তারা যে আপনাদের দেশের লোক, একথা বলতে আপনাদের মতো শিক্ষিত লোকের লজ্জা পাওয়া উচিত নয় কি?

লজ্জা যে পাওয়া উচিত এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না।

রেভারেণ্ড কিং শুধু সেবকই নন, তিনি মানুষ হিসাবে সব দিক দিয়েই মহৎ। তাঁর সঙ্গে কাজ ক'রে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করেছি। মানুষের সেবা করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি, এ কাজটি সহজ নয়। পদে পদে অসুবিধা আছে। যাদের সেবা করতে যাওয়া যায়, তারা সন্দেহ করে, তারাই অনেক সময় বাধা দিতে চায়। চারিদিকে সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে। উৎসাহ কমে যায়, মনে হয় কি দায় পড়েছে এ সব করবার!

কিন্তু যখনই উৎসাহ নিবে যায়, রেভারেণ্ড কিং-এর কথা মনে পড়ে। তিনি সকল সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে মাথাটি সর্বদা তুলে ধ'রে আছেন। শিশুর মতো সরল হাসি তাঁর মুখে লেগে আছে। সে হাসি তাঁর অন্তরের পরম আনন্দের প্রতিফলন। সেই ছবিটি মনে জাগে। তখন আমরা আবার উৎসাহ পাই।

একটি বিশেষ কেন্দ্রে আমরা জনসেবা আরম্ভ করেছিলাম, আমাদেরই বালিগঞ্জ অঞ্চলের এক বস্তীতে, কিন্তু আমাদের কর্মক্ষেত্র অল্পদিনের মধ্যেই বিস্তৃত হ'য়ে পড়ল।

তার কারণ জাপানী বোমা পড়তে শুরু করল কলকাতাবাসীদের মাথায়। দলে দলে লোক পালাতে লাগল শহর ছেড়ে। মানুষ ভয়ে যে কি পরিমাণ দিশাহারা হয়ে পড়ে, তার ব্যাপক ছবি দেখলাম এই প্রথম; যার যা কিছু ছিল—তাই নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু ট্রেনে চাপার পর দেখছে, সম্পত্তির বারো আনাই নেই। ঘোড়ার গাড়ি, ট্যাক্সি, রিকশা সবাই দশগুণ বেশি ভাড়া নিয়েছে, তারপর টিকিট করার ব্যাপারে যার যা সাধ্য ঘুস দিয়েছে;

ট্রেনে একটু জায়গা পাওয়ার জন্যেও প্রচুর টাকা দিতে হয়েছে, উপরন্ত কুলিরা মালপত্র নিয়ে স'রে পড়েছে। ট্রেনে ছেলেমেয়ে সবাই মিলে পদদলিত এবং নিষ্পিষ্ট হয়ে দেশে গিয়ে যেটুকু অবশিষ্ট রইল, তাও গেল সেখানে চোরের হাতে।

রেভারেণ্ড কিং একবার মাত্র বলেছিলেন, অসহায় লোকদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে এদেশের ভদ্র অভদ্র সবাই একসঙ্গে চোর হ'য়ে ওঠে—পৃথিবীতে আর কোনো দেশে এ রকম নেই।

তাঁকে এবারে অত্যন্ত বিচলিত দেখা গেল। আমাদের ক'জনের সাধ্যে যতদূর কুলোয় ঝগড়া মারামারি ক'রেও পলায়মান যাত্রীদের ট্রেনে ওঠায় সাহায্য করতে লাগলাম।

সেদিন রাত নটা আন্দাজ সময় আমরা হাওড়া থেকে ফিরছি। আমরা ডালহৌসী স্কয়ারের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি আমরা যে যেখানে পারলাম গর্তে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোমা পড়তে শুরু হ'ল। মনে হ'তে লাগল বোমা সব আমাদের কাছেই পড়ছে—মৃত্যু অনিবার্য। ভাবতে ভাবতেই আমাদের গর্তের খুব কাছেই ভীষণ এক আওয়াজ!

রেভারেণ্ড কিং আশ্রয়ে ঢোকার আগেই বিপদের কথা ভেবে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলেন। কত লোক হয়তো মরবে, অথচ সে সময় বেরিয়ে কিছু করবার উপায় নেই।

সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা পরে অল ক্লিয়ার বাজল। তখন বেরিয়েই নিজেদের কে কোথায় আছে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, সর্বনাশ হয়েছে। রেভারেণ্ড কিং অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন। এ-আর-পীর তৎপরতায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হ'ল, ডাক্তার বললেন, 'শক' পেয়েছেন, অবস্থা অনিশ্চিত।

উপায় কি? আমরা ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলাম।

ডাক্তার বললেন, দেখা যাক। বলেই চিকিৎসা শুরু করলেন।

রেভারেণ্ডের সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে বেশ কিছুদিন লাগল। হাসপাতাল থেকে তাঁকে বাড়িতে এনে আমরা দীর্ঘদিন তাঁর শুশ্রূষা ক'রে তাঁকে সবল ক'রে তুললাম এবং তিনি সবল হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাঁকে আরও দু'এক মাস বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলাম। তিনিও সহজেই রাজি হলেন এবং বললেন, কিছুদিন শুয়ে থাকতেই চাই, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে আর ইচ্ছে করছে না।

এ কথার অর্থ তখন বুঝতে পারি নি, কিন্তু পরে পেরেছি। তখন ভেবেছিলাম এত বড় একটা দৈহিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে তাঁর মনে অবসাদ

এসেছে। তাই মনে হ'ল তাঁকে নিয়ে রোজ একটু একটু বেড়ানো দরকার। তিনি এতে সহজেই রাজি হলেন।

রেভারেণ্ড কিংকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেদিন ট্রামে উঠলাম। একটা খালি সীট পেয়ে আমরা দু'জনে একসঙ্গে তাতে বসলাম। রেভারেণ্ড কিং বসলেন জানালার ধারে, আমি তাঁর পাশে। ইতিপূর্বে ট্রামের মধ্যে কখনও তাঁকে বিশেষ বসতে দেখি নি, কেননা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তিনি আসন ছেড়ে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন। সে দিন ট্রামে লোক বেশি ছিল না, শহরের লোক প্রায় খালি হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ চলতেই হঠাৎ অনুভব করলাম, রেভারেণ্ড কিং তাঁর দুটি হাঁটু জাপানী পাখার মতো ছড়িয়ে আমাকে ঠেলে রাখলেন। তাঁর পাশে আমার আসন এমন সঙ্কীর্ণ হয়ে এলো যে, তৎক্ষণাৎ সতর্ক না হ'লে আসন থেকে নিচে পড়ে যেতাম।

আমাকে তিনি এমন ঠেলে রাখলেন যে, হঠাৎ আমার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ জেগে উঠল। কেননা এমন স্বার্থপর ব্যবহার তাঁর কাছ থেকে যে কখনও আশা করা যায় না। তবে কি তাঁর চরিত্রে কোনো গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেল? আর এই কি সেই পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণ?

আমি মনোযোগের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এবং চালচলন লক্ষ্য ক'রে যেতে লাগলাম। ক'দিনের মধ্যেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের সমস্ত মত বদলে গেল। তাঁর ব্যবহারে ক্রমেই মর্মাহত হ'তে লাগলাম।

তিনি সেবাধর্মের নামও আর করেন না। ট্রামে উঠলে তাঁর মতো স্বার্থপর আর দেখা যায় না। ভিড়ের মধ্যে সীট থেকে কেউ উঠে গেলে সেই সীটের কাছের লোকের দাবী অগ্রাহ্য ক'রে তাদের ঠেলে বিদ্যুৎ গতিতে গিয়ে সেই খালি আসন দখল করেন। শুধু তাই নয়, যার পাশে বসেছেন তাকে হাঁটু দিয়ে ঠেলে রাখতে চেষ্টা করেন। তখন দু'জনে রীতিমতো ঝগড়া লেগে যায়।

ক'দিন পরে আরও একটি খবর শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। আমাদেরই সেবকদলের একজন এসে বলল, রেভারেণ্ড কিং বস্তীতে গিয়ে, সেখানকার লোকদের কাছে এতদিন যে ওষুধ এবং পথ্য দেওয়া হয়েছে, তার জন্যে নাকি কিছু কিছু টাকা আদায় করছেন। বস্তীর লোকেরা প্রায় ক্ষেপে গেছে। বলছে, আগে জানলে তারা ওষুধপত্র কিছুই নিত না।

আমাদের এক বন্ধু একদিন এসে বললেন, এ সব কি শুনছি?

কি ?

রেভারেণ্ড কিং-এর নামে নানা রকম কুৎসা রটাচ্ছে সবাই।

তুমি কি শুনেছ ?

শুনেছি যা, তা শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

এখন আর পৃথিবীতে অবিশ্বাস করবার কিছুই নেই, তুমি নির্ভয়ে বল।

বন্ধু বলতে লাগলেন, রেভারেণ্ড কিং-এর নিচের তলার ভাড়াটেদের সঙ্গে তাঁর ভয়ানক ঝগড়া চলছে। তিনি তাদের উঠে যাবার জন্যে নোটিস্ দিয়েছেন।

কেন ?

কেন বুঝলে না ? পনেরো টাকা ভাড়া পাচ্ছিলেন, কিন্তু ও বাড়ির ভাড়া এখন আশি টাকা সহজেই পাওয়া যাবে। যারা আছে তাদের কাছ থেকে তো আর বেশি ভাড়া নিতে পাচ্ছেন না, চক্ষুলজ্জাতেও আটকায়। তাই ওদের তুলে দিতে পারলে নতুন ভাড়াটে পাওয়া যাবে বেশি টাকায়।

যারা আছে তারা যদি না ওঠে ?

উনি নিজের জন্যেই নিচের তলাটা চান, এইভাবে নোটিস্ দিয়েছেন।

কিন্তু যারা আছে তারা নতুন বাড়ি না পেলে উঠে যেতে পারছে না। রেভারেণ্ড কিং তাদের নানা ভাবে অসুবিধায় ফেলেছেন সে জন্যে। উপর থেকে জঞ্জাল ফেলছেন, সব উড়ে গিয়ে লাগছে তাদের গায়ে।

বল কি ?

আমিও তো অবাক হচ্ছি এসব শুনে। আচ্ছা, এর মানে কি বলতে পার ? ভদ্রলোক হঠাৎ এমন ডিগবাজি খেলেন কেন ?

কেন, সেই কথাই তো ভাবছি।

একথা শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। রেভারেণ্ডের কাছে গিয়ে বললাম, এ সব কি শুনছি ?

তিনি বললেন, এতদিন ভবিষ্যতের কথা ভাবি নি, এখন ভাবতে হচ্ছে। ছোটলোকেরা বিনা পয়সায় সব পেয়ে পেয়ে মাথায় চড়ে বসেছে। বেটারা এতদিন ওষুধ আর ভাল ভাল পথ্য খেয়েছে বিনা পয়সায়, এখন তার কিছু দাম দিক। ভিখারীর জাত বেটারা, ওদের আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

এর উত্তরে একটি কথাও আর বলতে প্রবৃত্তি হ'ল না। তাঁর আশা একেবারে ছেড়ে দিলাম। আমাদের সেবাসঙ্ঘও ভেঙে গেল। কিন্তু মনে যে আঘাত লাগল তা থেকে মুক্তি পেলাম না।

মাসখানেকের মধ্যেই দেখি রেভারেণ্ড কিং চালের ব্যবসা শুরু করেছেন এবং চোরা বাজারের পথে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু টাকা ক'রে ফেলেছেন। চোরা বাজারের চাঁইরা রেভারেণ্ড কিং-এর নামে চমকে ওঠে; বলে, বাপ্‌! এর মতো ঘুঘু লোক আর দেখা যায় না। লোকটা এ বছরে কোটিপতি হবে।

আমার মনে কেবলই প্রশ্ন জাগতে লাগল, এর মানে কি? রেভারেণ্ড কি এতদিন ভণ্ডামি করেছেন? সেবাধর্মের ছলে নিজের ব্যবসার পথ পরিষ্কার করেছেন এতদিন—না, তাঁর হঠাৎ মাথা খারাপ হয়েছে?

যদি মাথা খারাপ হয়ে থাকে তা হ'লে আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা চলে না।

মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতদের কাছে যাতায়াত করতে লাগলাম। কেউ বললেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কেউ বললেন, বোমার 'শক্‌' পেয়ে ওর ভিতর থেকে দ্বিতীয় আর একটি ব্যক্তিত্ব জেগে উঠেছে। এবং এ রকম হওয়া যে অসম্ভব নয়, তা তাঁরা বহু নজির দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। আমার বন্ধুরা এই কথা সহজেই মেনে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু তবুও আমার মনে কিছু সন্দেহ থেকেই গেল। এমন মহৎ লোকের 'দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব' এমন ছোটলোক হয় কি ক'রে—এ প্রশ্নের উত্তর আমি পেলাম না। সবটাই একটা অলৌকিক ব্যাপার ব'লে বোধ হতে লাগল।

এমন সময় শোনা গেল, বিলেত থেকে ডক্টর স্টীন্‌ নামক এক প্রসিদ্ধ প্যাথলজিস্ট বিশেষ একটা কাজে বোম্বাইতে এসেছেন।

অবশেষে মানসিক অশান্তি দূর করার জন্যে আমাকে বোম্বাই পর্যন্তই যেতে হ'ল। এতখানি উৎসাহের জন্যে, এবং আমি 'দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব' থিওরিটি কেন মানতে পারছি না, এ জন্যে বন্ধুরা বিদ্রূপ করতে লাগল।

বোম্বাইতে গিয়ে ডক্টর স্টীনের সঙ্গে দেখা করলাম। ডক্টর স্টীন সদাশয় লোক, তাঁর সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কাহিনী শুনলেন। শুনতে শুনতে তিনি বহু প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তাঁকে বললাম। তা ছাড়া বাঙালীর চরিত্র সম্বন্ধেও তিনি অনেক তথ্য আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন।

তিনি আগাগোড়া সব শুনে হেসে বললেন, এ রকম কেস আমার একেবারে অজানা নয়। বিলেতেও এ রকম একটা ঘটনা আমি দেখেছি। 'শক'-চিকিৎসার সময় যে সিরাম ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল, সেটা বাঙালীর রক্তের সিরাম। সেই ইনজেকশনের পর থেকেই রেভারেণ্ড কিং-এর চরিত্রে বাঙালীর

বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তার প্রথম লক্ষণ আপনি বলছেন, ট্রামে ব'সে পাশের যাত্রীকে হাঁটু দিয়ে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা। তা নয়। এটা একটা প্রধান লক্ষণ হ'লেও ওর আগেই লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম লক্ষণ ফুটেছে রেভারেণ্ডের কথায়। তিনি বলেছেন, "ঘরের খেয়ে আর বনের মোষ তাড়াতে ইচ্ছে করে না।"

ভেবে দেখলাম ডক্টর স্টীনের কথাই ঠিক। এ ছাড়া একটা মহৎ লোকের পরিবর্তন আর কিছুতে হওয়া সম্ভব নয়।

রেভারেণ্ডের উপর মনে মনে যে ঘৃণা জেগেছিল, তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল, তাঁর জন্যে বড় দুঃখ হ'তে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম, এর কি কোনো প্রতিকার নেই ?

না, কোনো প্রতিকারই নেই।

সিরামের জাতিভেদে কি সবারই এই রকম হয় ?

না। লাখে একজনের হয় কিনা সন্দেহ। বিলেতেও মাত্র একটি কেসের রেকর্ড আছে, এবং কালক্রমে কাহিনীটি কৌতুকগল্পে পরিণত হয়েছে।

ডক্টর বলতে লাগলেন, একবার এক ইংরেজের দেহে রক্ত ইনজেক্ট করার দরকার হয়েছিল, সেজন্য রক্তদাতাকে তিনি উপযুক্ত ফী দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু তার দেহে রক্ত প্রবেশ করানোর পর তিনি ফী দিতে অস্বীকার করলেন, দিলেন শুধু ধন্যবাদ। কারণ রক্তদাতা ছিলেন কৃপণতায় প্রসিদ্ধ স্কটল্যাণ্ডবাসী, তাই কৃপণের রক্ত ইংরেজের দেহে গিয়ে ইংরেজকে কৃপণ ক'রে তুলল, তাঁর কাছ থেকে আর টাকা আদায় করা গেল না। রেভারেণ্ড কিংও এইভাবে বাঙালীর চরিত্র লাভ করেছেন।

বিষণ্ণ মনে বোম্বাই থেকে ফিরে এসে রেভারেণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি চালের বাজার নিয়ে কয়েকজন মক্কেলের সঙ্গে তিনি গোপন আলাপ করছেন। আমাকে দেখেই চুপ ক'রে গেলেন, কোনো কথাই বললেন না।

ফিরে এলাম। ভাবলাম, ভবিষ্যৎ শুধু রেভারেণ্ডেরই নেই, আমারও আছে।

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম, আমি অত্যন্ত নির্বোধের কাজ করেছি, অর্থাৎ আমার ভবিষ্যৎ হারাতে বসেছি। রেভারেণ্ডের মতো টাকা এবং প্রতিষ্ঠাওয়ালা লোকের সঙ্গে করছি বিবাদ! এতে আমার লাভ কি ? ছাত্রজীবনের একটা মূল্যহীন আদর্শ আমাকে কি দিতে পারে ? আমি

নির্বুদ্ধিতাবশত তাঁর মতো একজন সহায়ককে পরিত্যাগ ক'রে একা ঘরে ব'সে জ্বলেপুড়ে মরছি!

পরম অনুতপ্ত হ'য়ে বিনীতভাবে তাঁর কাছে গিয়ে একদিন আমার নিবেদন পেশ করলাম।

রেস্তোরেণ্ড কিং আমার প্রস্তাব শুনে আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, এ তো উত্তম কথা, আপনাকে আমি অংশীদার ক'রে নেব।

* * *

এর পর দু'বছর কেটে গেছে, আমি আজও তাঁর অংশীদার হতে পারি নি। তিনি এই দু'বছর ধ'রে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর ঘোরাচ্ছেন। বলছেন, এই র‍্যাশন পদ্ধতিটি উঠে গেলেই তিনি আমাকে নিয়ে নেবেন, কেননা এখন নাকি কিছুই লাভ হচ্ছে না।

(১৯৪৫)

বৈবাহিক বৈচিত্র্য

বাগবাজারের কোনও এক রাস্তায় এক বাড়ির বৈঠকখানায় বসিয়া ১৩৩৪ সালের ১লা চৈত্র বেলা দশটার সময় শশধর চক্রবর্তী সিউড়ি হইতে আগত নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠ করিলেন।

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

মহাশয়ের পত্র পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। আপনার পুত্র শ্রীমান্ জলধর আমার কন্যার মাতুলের সহযোগিতায় কলিকাতাতেই আমার কন্যাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর নাই। পত্রযোগে আপনাদের বিষয় আমি সমস্তই অবগত আছি। আপনাদের ব্যবসায়ের কথা এবং ব্যবসায়ে সততার কথা সর্বজনবিদিত। আমাদের এই মফঃসল শহরেও আপনাদের খ্যাতির সংবাদ পৌঁছিয়াছে। সুতরাং আপনারা যে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ইহাতে আমি আপনাদের প্রতি যে কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ হইয়াছি তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে অক্ষম। শ্রীমান্ জলধর এম্‌-এ পাস করিয়া ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছে ইহা তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষা বা উন্নতি ছাড়াও আমি পারিবারিক এবং বংশগত আচার-ব্যবহার এবং সংস্কৃতির উপরেই অধিক আস্থাবান। সুখের বিষয় সেদিক দিয়াও আমি নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতেছি। সুতরাং এইক্ষণে আমার কর্তব্য, মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপাদি করিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা। আমি স্থির করিয়াছি আগামী ৫ই চৈত্র রবিবার সকালে কলিকাতা পৌঁছিব এবং সোজা গিয়া আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করিব। ইতি

ভবদীয়

শ্রীসাধুচরণ মুখোপাধ্যায়

শশধর চক্রবর্তী পত্রখানা দুই বার পাঠ করিলেন এবং অন্তত চারি বার গোঁফে তা দিলেন। তারপর আর একবার চিঠিখানি সম্মুখে ধরিয়া, যেখানে লেখা ছিল "কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষা বা উন্নতি ছাড়াও আমি পারিবারিক এবং বংশগত আচার-ব্যবহার এবং সংস্কৃতির উপরেই অধিক আস্থাবান"—সেই স্থানটির উপর কিছুকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া ফাইল-জাত করিলেন।

৫ই চৈত্র বেলা অনুমান দশটার সময় সিউড়ি হইতে কলিকাতা পৌছিয়া সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় নির্দিষ্ট গলিতে কোচম্যানের সাহায্যে বাড়ির নম্বর মিলাইতে মিলাইতে চক্রবর্তী-গৃহে আসিয়া পৌছিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয় প্রাচীন ডাক্তার, সকলের কাছে কামানের গোলা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু তাহা তাঁহার কেশবিরল গোলাকৃতি মস্তকের জন্যই নহে। শহর হইতে একটু দূরে ছোট্ট পাহাড়ের মতো উঁচু জায়গায় তাঁহার বাড়ি। তাহারই এক দিকে একটি গাছ জন্মাবধি ভূমির সমান্তরাল ভাবে হেলিয়া গিয়া সেই ভাবেই বর্ধিত হইয়াছিল, শাখাপ্রশাখা অবশ্য আকাশমুখী ছিল। কিন্তু অনেক দিন হইল গাছটির উপরার্ধ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, এখন শুধু কাণ্ডটি কামানের মতো তাঁহার বাড়ির এক পাশ হইতে শহরের দিকে মুখ বাড়াইয়া আছে। এই কারণে তাঁহার বাড়ির নাম হইয়াছে কামানওয়ালা বাড়ি এবং তাঁহার নাম হইয়াছে কামানের গোলা। তাহার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কামানের আওয়াজের কিছু সাদৃশ্য আছে। কথা বলিবার সময় তিনি মাঝে মাঝে এমন অতর্কিতে গর্জন করিয়া ওঠেন যাহাতে সাধারণ রোগীর সর্বাঙ্গ এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্তের প্লীহা চমকিত হয়।

বহু আশায় বুক বাঁধিয়া এই কামানের গোলা সেদিন চক্রবর্তী গৃহে আসিয়া ফাটিয়া পড়িলেন। এরূপ চঞ্চল প্রকৃতি অল্পবয়স হইলে মানাইত, কিন্তু মুখুজ্জে-মহাশয় আটচল্লিশ বৎসর বয়সেও যেন শিশুটিই রহিয়া গিয়াছেন। এই শিশুর সারল্য শুধু হাত পায়ের চাঞ্চল্যে নয়, খাওয়া-দাওয়া বিষয়েও তিনি শিশুর মতোই লোভী। কিন্তু বিশেষ দুরবস্থার মধ্যে বর্ধিত হইলে শিশুও যেমন সংসারবিষয়ে অনেকখানি অভিজ্ঞ হইয়া ওঠে, তেমনি এই প্রৌঢ় শিশুটি কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া চক্রবর্তী-গৃহে এমন সব বিষয়ীজনোচিত ব্যবহার করিলেন যাহা তাঁহার পক্ষে সহজও নহে, কারণ তাহা প্রায় পরিপক্ব লোকের ব্যবহার।

চক্রবর্তী-গৃহে পৌছিয়া তাঁহার প্রথমে জলধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মুখুজ্জে-মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য চক্রবর্তী-মহাশয়ই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মুখুজ্জে-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া জলধর নিজের পরিচয় দিল। মুখুজ্জে-মহাশয় তাহার সৌম্য আকৃতি এবং সপ্রতিভ ব্যবহারে আনন্দে গদগদ হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং অন্য কোনো আলাপ না করিয়াই বৈঠকখানা-ঘরের চারিদিক ঘুরিয়া, ভিতরের দিকের দরজায় উঁকি মারিয়া, গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চমৎকার বাড়ি তো!"

সে গর্জনে জলধরের আপাদমস্তক কাঁপিয়া গেল। সে এজন্য প্রস্তুত ছিল না,

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া স্মিতহাস্যে বলিল, "আলো-হাওয়াটা একটু পাওয়া যায়।"

মুখুজ্জে-মহাশয় যেন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "একটু কেমন? বলি, হোয়াট ডু ইউ মীন্?—এ যে একেবারে ঝড়ের মতো হাওয়া!"

একটু আবেগেই মুখুজ্জে-মহাশয়ের ভাষা ইংরেজী-মিশ্রিত হইয়া পড়ে। তাই তিনি বলিতে লাগিলেন, "আর এ না হ'লে কি আমাদের মনে ধরে?—আমরা খোলা জায়গায় থাকি—ফর নাথিং খানিকটা আলো আর হাওয়া আমাদের চাই-ই, তবে আলোটা শীতকালে এবং হাওয়াটা গ্রীষ্মকালে।" বলিয়া তিনি এইবার গা হইতে চাদর এবং জামা খুলিয়া ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, "কিন্তু তোমার বাবার কথা তো এতক্ষণ জিজ্ঞাসাই করিনি, তিনি বাড়িতে আছেন তো?"

ভৃত্য উপস্থিত ছিল। সে চাদর ও পাঞ্জাবী যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল, "বাবু পূজো করছেন, পূজো শেষ হ'লেই চলে আসবেন, তিনি সব শুনেছেন।"

জলধর কিঞ্চিৎ বিস্ময়ে ভৃত্যের দিকে চাহিয়া বলিল, "যা, তাড়াতাড়ি চায়ের কথা ব'লে আয়।"

মুখুজ্জে-মহাশয় পূজোর কথা শুনিয়া কিছু ঘাবড়াইয়া গেলেন। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল এবং কপালের উপর তিনটি ভাজের উপরে আরও চারিটি দেখা দিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আত্মচেতন হইয়া বলিলেন, "তা চলবে না—স্নানের আগে তো কিছু খাওয়া চলবে না। বলিতে বলিতে অস্থিরভাবে উঠিয়া ঘরের মধ্যে অবস্থিত বইয়ের আলমারির কাছে গিয়া একে একে বই টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

জলধর সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "তা হ'লে ততক্ষণ স্নানের বন্দোবস্ত"—কিন্তু সে কথা তাঁহার কানে প্রবেশ করিল না। তিনি বই দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আনন্দে গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "স্ট্রেঞ্জ! এ যে দেখছি আমারই সব খোরাক!—মায় বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত!" তারপর হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই একমাত্র খাদ্য যা স্নানের আগে খাওয়া চলে" বলিয়া এক খণ্ড বঙ্কিমচন্দ্র হাতে লইয়া আসনে আসিয়া বসিলেন।

জলধর পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিল, "তা হ'লে স্নানটাই সেরে নিলে হ'ত—চা পর্যন্ত খেলেন না।—

মুখুজ্জে-মহাশয় এলোমেলো ভাবে বলিলেন, "তাড়াতাড়ি কিসের? চা অবশ্য খাওয়া দরকার—কিন্তু কি জান বাবা, সংস্কারটা তো আর ছাড়া যায়

না…কিন্তু ভিতরের তাগিদও কম নয়!—আচ্ছা বরঞ্চ স্নানের আগে এক গ্লাস জল—শাদা জল আমাকে দাও, হাত মুখ ট্রেনেই ধুয়েছি, আহ্নিকটাও বর্ধমান স্টেশনে সেরে নিয়েছি।" কথাগুলি যে একটু অসংবদ্ধ হইল তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন।

জলধর বলিল, "শুধু জল খাবেন?"

মুখুজ্জে-মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "গলাটা শুকিয়ে গেছে ব'লেই জল খাচ্ছি, নইলে ওটাও তো ঠিক চলে না, খাওয়া তো বটে!" এইবারের কথাটা দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

ভৃত্য জল আনিয়া দিল। মুখুজ্জে-মহাশয় জল লইতে গিয়া হঠাৎ হাত গুটাইয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, সাংঘাতিক ভুল হয়ে গিয়েছিল—জুতো পায়েই গেলাস ধরতে গিয়েছিলাম!" বলিয়া তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া এক গ্লাস জল উদরস্থ করিলেন। তারপর বই ছাড়িয়া দেওয়ালে-টাঙানো ছবিগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। একখানা রাজারাণীর ছবি, একখানা চক্রবর্তী মহাশয়ের এক ইংরেজ বন্ধুর ছবি, আর সব বিলিতি নিসর্গ দৃশ্য। ছবিগুলি খুব মনোযোগের সহিত দেখিয়া মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "চমৎকার সব ছবি, কিন্তু এর মধ্যে কোথাও বাবা, একখানা দেবদেবীর ছবি ঝুলিয়ে দাও না!—মনে বেশ একটা পবিত্র ভাব জাগবে।"

জলধর কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা শুনিবার পূর্বেই মুখুজ্জে-মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "না না না, ওটা আমারই ভুল—বৈঠকখানা-ঘরে দেব-দেবতার ছবি রাখা ঠিক নয়, এখানে ওই সব ছবিই ভাল।" বলিয়াই ইলেকট্রিক ল্যাম্পের বিচিত্র শেডের দিকে চাহিয়া তাহার রূপ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন। জলধর কোনোমতেই কোনো দিক দিয়া মুখুজ্জে-মহাশয়কে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

পারিবারিক আবহাওয়ার পরিচয় লইতে আসিয়া মুখুজ্জে-মহাশয় প্রথমেই চক্রবর্তী-মহাশয়ের ধর্মবিষয়ে নিষ্ঠার পরিচয় পাইলেন। সুতরাং তিনি নিজেকে চক্রবর্তী মহাশয়ের আদর্শের উপযুক্ত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

চক্রবর্তী-মহাশয়ও মুখুজ্জে মহাশয়ের পত্রে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তিনি পারিবারিক আচার-ব্যবহারের পরিচয় লইতে আসিয়াছেন, সুতরাং তিনি পুত্রের পিতা হইয়া কন্যার পিতার চোখে কোনক্রমেই যাহাতে ছোট না হন এই চিন্তা অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন; কাজেই কোথাও কোনও ত্রুটি ধরা

না পড়ে সেদিকে তিনিও যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং চক্রবর্তী এবং মুখুজ্জে মহাশয়ের মিলনে চক্রবর্তী-গৃহে যেন একটা নূতন পরিমণ্ডল সৃষ্টি হইল।

চক্রবর্তী মহাশয় কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পায়ে খড়ম এবং পরনে গরদ। প্রথম সাক্ষাতে উভয় পক্ষ হইতেই আনন্দের যে উচ্ছ্বাস বহিল তাহার অর্থ বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু তাহার শব্দ বাড়ি কাঁপাইয়া তুলিল। সে শব্দে আকৃষ্ট হইয়া পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা চারি ধারের জানালায় উঁকি মারিয়া একটা বিশেষ রকম নূতনত্বের স্বাদ গ্রহণ করিতে নিযুক্ত হইল।

ট্রেন-ভ্রমণের কথা দিয়া মুখুজ্জে মহাশয় আলাপ জমাইয়া তুলিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পর ট্রেন-প্রসঙ্গের পরিণতিস্বরূপ খাদ্যের অনাচার-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল এবং অতি দ্রুতগতিতে আলোচনা প্রাচীন ভারতে গিয়া পৌঁছিল। ঐ সঙ্গে চক্রবর্তী-মহাশয় গড়গড়া এবং মুখুজ্জে-মহাশয় চুরুট টানিতে লাগিলেন, এবং উভয়ের শাস্ত্রালাপে এবং তামাকের ধোঁয়ায় চক্রবর্তী-মহাশয়ের বৈঠকখানা-গৃহে একটা অভিনব কল্প-জগৎ রচিত হইল।

মুখুজ্জে-মহাশয় চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন, "ধরুন, চ্যবন মুনি যে"—বলিয়া পুনরায় চুরুটে মুখ গুঁজিলেন।

চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, "জাতিভেদের কথা বলছেন তো?"

মুখুজ্জে-মহাশয় উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, জাতিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন, তার অর্থ এ কালের লোকে ভুলেছে ব'লেই না—।"

চক্রবর্তী-মহাশয় আনন্দে প্রায় দিশাহারা হইয়া বলিলেন, "ধরুন না কেন, শঙ্করাচার্য যে"—বলিয়া ঘন ঘন গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "আপনি বোধ হয় স্বপাক আহারের কথা বলছেন?"

চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। শঙ্করাচার্য স্বপাক আহারকেই প্রশস্ত ব'লে গেছেন, কিন্তু দেখুন তো আমরা তা ক'জন মানি? আমরা যা করছি এটা কি স্বেচ্ছাচার নয়?"

জলধর আর পারিল না, সে বাহিরে গিয়া কিছু হাসিয়া মনটাকে সহজ করিয়া লইল।

মুখুজ্জে-মহাশয়ের মতবাদ ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর ধ্বনিতে ঘর কাঁপাইতে লাগিল। জলধর পুনঃ প্রবেশ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিল, স্নানের সময় হইয়াছে। চক্রবর্তী-মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। "কি আশ্চর্য!

অতিথির স্নানাহার ভুলে শুধু কথা বলে যাচ্ছি। ছি ছি ছি—ভারি অন্যায় হয়ে গেছে—আর নয়, আর নয়, এবারে উঠুন" বলিয়া নিজে উঠিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয়ের উঠিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তিনি বলিলেন, "নট অ্যাট অল্—কিছুমাত্র অন্যায় হয় নি, আপনি আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।"

চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, "অপরাধ নেবেন না, কিন্তু এ-সব বিষয়েরই দোষ—আরম্ভ করলে পুরনো কথা সব মনে পড়ে"— বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

মুখুজ্জে-মহাশয় তাহা দেখিয়া অস্থিরভাবে বলিলেন, "না না, স্নানাহার বরঞ্চ এখন থাক, কিন্তু এ সব কথা বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, আরম্ভ করা গেছে, শেষ করতেই হবে।"

কিন্তু শেষ করিবার পূর্বেই একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। মুখুজ্জে-মহাশয় যখন বলিতেছিলেন, আলোচনা শেষ করতেই হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁহাদের কানের পাশে এক ঝাঁক মুরগী সমস্বরে কোঁ কোঁ করিয়া উঠিল। চক্রবর্তী-মহাশয় এক লাফে উঠিয়া পড়িলেন। দেখা গেল একটা লোক বাঁকে করিয়া দুই খাঁচা মুরগী আনিয়া জানলার পাশে দাঁড়াইয়াছে। চক্রবর্তী-মহাশয় উন্মাদপ্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মুরগী। মুরগী আনতে কে বলেছে? আরে হাঁস—হাঁস—হাঁসের স্যুপ খেতে বলেছে ডাক্তার, বেটা মুরগী এনে হাজির—যেন আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে এসেছে। পালা, পালা, এখুনি পালা—ছি ছি ছি—।"

মুরগীওয়ালা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু চক্রবর্তী-মহাশয় তাহাকে কিছু বলিতে না দিয়া সোজা তাহাকে রাস্তা পর্যন্ত তাড়া করিয়া লইয়া গিয়া আরও অনেকগুলি কথা শুনাইয়া দিয়া আসিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয় এই সব দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কারণ চক্রবর্তী-মহাশয়ের এই আচরণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া তিনিও চক্রবর্তী-মহাশয়ের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "লোকটার তো স্পর্ধা কম নয়। বাড়ির উপর মুরগী নিয়ে আসে!"

চক্রবর্তী-মহাশয় মহা বিরক্তির সুরে বলিলেন, "দেখুন তো কাণ্ড! আরে যে বাড়ির কর্তা মাছ পর্যন্ত স্পর্শ করে না, সেই বাড়িতে মুরগী!—ছি ছি ছি—।"

মুখুজ্জে-মহাশয়ের উৎসাহ এইবার অসীমা পার হইয়া গেল। তিনি চক্রবর্তী মহাশয়কে আনন্দে প্রায় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে আমার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছেন—আমিও নিরামিষ, আপনিও! গ্রেট কয়েনসিডেন্স!"

চক্রবর্তী-মহাশয় বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কি আশ্চর্য !—আরে হতেই হবে, হতেই হবে। নিরামিষ না হ'লে সম্ভ্রম রাখাই দায়। যেখানেই যান, নিরামিষকে লোকে এখনও একটু মানে। মাছ খেলেন কি তার সঙ্গে পেঁয়াজ খেতে হবে, এবং মাংসের সঙ্গে রসুন।"

মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "অত্যন্ত সত্য কথা। নিরামিষ একেবারে নিরাপদ, যেখানেই যান সম্মান রাখবার পক্ষে ও একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। তবে অনেকে আবার নিরামিষ ব'লে একেবারে বিধবার খাদ্য দিয়ে বসে !"

চক্রবর্তী-মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা মিথ্যা নয়—তবে এ-বাড়িতে সে ভয় নেই।"

মুখুজ্জে-মহাশয় এ-কথায় গর্জন করিয়া হাসিলেন।

এই সময় জলধর আসিয়া স্নানের জন্য জোর তাগাদা দেওয়ায় আলোচনা ঐখানেই থামিয়া গেল। তখন তেল মাখিতে মাখিতে মুখুজ্জে-মহাশয় আলোচনাটা রাষ্ট্র-বিষয়ের দিকে টানিয়া আনিলেন এবং স্বরাজ সম্বন্ধে তিন-চারি মিনিট ঘোর আলোচনা চলিল। তাহা ছাড়া আহারের সময় আর যে যে প্রসঙ্গ বাকি ছিল সে সমস্তই উত্থাপিত হইল এবং ঠিক হইল রাত্রিকালে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে।

ফলতঃ উভয়েই উভয়ের প্রতি মতের গভীর ঐক্যহেতু এরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে দুই জনের মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই হাস্যপরিহাস আরম্ভ হইয়া গেল। চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, "বুঝলেন মুখুজ্জে-মশাই, আমার ধারণা ছিল মেয়ের বাপ সাধারণত ঘুঘু-চরিত্রের হয়, কিন্তু আপনাকে দেখে আমার ধারণা বদলে গেছে।"

মুখুজ্জে মহাশয় বলিলেন, "আর ছেলের বাপ যে কসাই হয় সেই ধারণা ছিল আমার, কিন্তু ব্যতিক্রম তো চোখের সামনেই দেখছি।"

শেষ পর্যন্ত মুখুজ্জে-মহাশয়ের কন্যা চক্রবর্তী-গৃহে আসিলে যে পরম সুখের হইবে এবং চক্রবর্তী-গৃহে মুখুজ্জে মহাশয়ের কন্যাকে পাঠাইয়া যে মুখুজ্জে-মহাশয় নিশ্চিন্ত হইবেন উভয়েই এ কথা স্বীকার করিলেন।

আহারান্তে নিদ্রার পর বিবাহ সম্বন্ধ একরূপ পাকা হইয়া গেল।

বেলা তখন পাঁচটা। মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "চক্রবর্তী-মশাই, আমি একটু বেরুতে চাই—বহুকাল পরে কলকাতা এসেছি, দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা না ক'রে যাওয়াটা ভাল দেখায় না।"

চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ স্বচ্ছন্দে—আপনি স্বচ্ছন্দে দেখা ক'রে

আসুন। আর দেখুন, ঐ সঙ্গে আমিও একটু ঘুরে আসি না? চলুন আমাদের গাড়িতে একসঙ্গেই বেরুনো যাক, চৌরঙ্গীতে আমার একটু কাজও আছে।"

"না না, তা হ'লে আর একসঙ্গে গিয়ে কাজ নেই—আপনার অসুবিধা হবে, আমি বরঞ্চ ট্রামেই যাচ্ছি।"—মুখুজ্জে-মহাশয় ব্যস্তভাবে কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

কিন্তু চক্রবর্তী-মহাশয় ছাড়িলেন না, উভয়ে একসঙ্গেই বাহির হইলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয়ের নির্দেশে গাড়ি ভবানীপুর অভিমুখে চলিল। ভাবনীপুরের একটা রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরিয়া একটা বাড়ির সম্মুখে গাড়ি থামাইতে বলিয়া মুখুজ্জে-মহাশয় সেখানে নামিলেন এবং বলিলেন, "আমি ঘণ্টা দুই পরেই ফিরছি।"

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, "দেখবেন, দেরি করবেন না যেন, আমাদের আলোচনা ঢের বাকী আছে।"

গাড়ি চলিয়া গেল। মুখুজ্জে-মহাশয় ছুটন্ত গাড়ির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, এবং গাড়ি অদৃশ্য হইবামাত্র দ্রুত পদচালনা করিয়া রসা রোডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে বাড়ির সম্মুখে গাড়ি থামিয়াছিল সে-বাড়ির সঙ্গে তাঁহার যে কোনো সম্পর্ক ছিল সেরূপ বোধ হইল না।

সেদিন সন্ধ্যা ছয়টায় চৌরঙ্গীর একটা রেস্তোরাঁয় পাশাপাশি দুইটি পর্দা-ঢাকা কুঠরিতে বসিয়া দুইজন ভদ্রলোক মনের আনন্দে রোস্ট-চিকেন এবং অন্যান্য নানারূপ মাংসের রান্না উপভোগ করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে 'বয়' 'বয়' বলিয়া হাঁকিতেছিলেন। কুঠরি দুইটির একটির নম্বর তিন, অপরটির চার। মাঝখানে মানুষ-সমান উঁচু পার্টিশন।

এই দুই ভদ্রলোক অত্যন্ত মাংসপ্রিয়, এবং গৃহে প্রায় প্রত্যহ মাংস খাইয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, পথেঘাটে যখন যেখানে সুযোগ পান সেইখানেই লোভে পড়িয়া মাংসের স্বাদ গ্রহণ করেন। গৃহের রান্নার একঘেয়ে স্বাদ হইতে দূরে থাকিয়া মাঝে মাঝে ইঁহারা এইভাবে রসনাকে তৃপ্ত করেন।

তিন নম্বর প্রথম উৎসাহে যতটা পারেন দ্রুত উদরস্থ করিয়া ধীরে ধীরে একখণ্ড অস্থি চর্বণ করিতেছিলেন, এমন সময় চার নম্বরের কণ্ঠস্বরে তাঁহার মন সচকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল এ কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত, কিন্তু কোথায়, কবে শুনিয়াছেন তাহা মনে পড়িল না। তিনি কৌতূহলবশবর্তী হইয়া মনে করিলেন ভদ্রলোককে একবার দেখা প্রয়োজন। তিনি হঠাৎ ঐখানেই আহার সমাপ্ত করিয়া 'বিল' দিবার জন্য বয়কে ডাকিলেন।

এই কণ্ঠস্বর এইবার চার নম্বরের ভদ্রলোকের কানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উতলা করিয়া তুলিল। তিনি সহসা আহার বন্ধ করিলেন। কার কণ্ঠস্বর? অতিপরিচিত অথচ কিছুতেই মনে পড়ে না।

যুগল ভদ্রলোকের যুগপৎ কৌতূহল, অথচ কৌতূহল মিটাইবার উপায় মাত্র একটি। পার্টিশনের উপর দিয়া লুকাইয়া দেখা ছাড়া উপায় নাই। দরজা দিয়া ঢোকা অসঙ্গত, অনুমান যদি ভুল হয়। সুতরাং চেয়ারে দাঁড়াইয়া একটু দেখিয়া লইলেই সন্দেহের অবসান ঘটিবে।

তিন নম্বর চেয়ারে দাঁড়াইয়া অতি সন্তর্পণে পার্টিশনের উপর মাথা বাহির করিলেন। ঠিক সেই সময় চার নম্বরও চেয়ারে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে পার্টিশনের উপর দিয়া মাথা বাহির করিলেন। দুই মাথা নাকে-নাকে ঠেকিয়া গেল। চার নম্বর ভীতিজনক শব্দ করিয়া উল্টাইয়া পড়িলেন। তিন নম্বর কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পডিলেন।

ম্যানেজার অকারণ ভয় পাইয়া উভয় ঘরেই তাড়াতাডি বিল পাঠাইয়া দিলেন। বিলের পাওনা টাকা মিটাইয়া মুখুজ্জে-মহাশয় ও চক্রবর্তী-মহাশয় দুই কুঠরি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নীরবে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চক্রবর্তী-মহাশয়ের গাড়ি একটু দূরে ছিল, তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুখুজ্জে-মহাশয় মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন এবং গাড়ির ভিতরে নীরবে তাঁহার পাশে গিয়া বসিলেন। উভয়েরই হাতে এবং মুখে তখনও মাংসের ঝোল লাগিয়া রহিয়াছে।

গাড়ি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়া ছুটিয়া চলিল। প্রায় তিন মিনিট নির্বাকভাবে চলিবার পর মুখুজ্জে-মহাশয় শুনিতে পাইলেন চক্রবর্তী-মহাশয় আপন মনেই খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতেছেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার মন হইতে এক গুরু ভার নামিয়া গেল, তিনিও খিক্ খিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন। চক্রবর্তী-মহাশয় পুনরায় গম্ভীর হইয়া গেলেন। মুখুজ্জে-মহাশয়ের মনে পুনরায় আশঙ্কা জাগিল। তিনিও গম্ভীর হইয়া গেলেন। প্রায় দুই মিনিট নীরবে চলিবার পর চক্রবর্তী-মহাশয় চাদরে মুখ ঢাকিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয়ও হুঙ্কার দিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দুই জনের মিলিত হাসিতে ড্রাইভার চঞ্চল হইয়া গাড়ি থামাইয়া ফেলিল এবং পথে নামিয়া হাসিতে লাগিল।

চক্রবর্তী-মহাশয় হাসিতে হাসিতে মুখুজ্জে মহাশয়ের ভুঁড়ি চাপড়াইতে লাগিলেন। মুখুজ্জে মহাশয় হাসিতে হাসিতে চক্রবর্তী মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিলেন।

মিনিট দুই এই ভাবে কাটিবার পর চক্রবর্তী মহাশয় গাড়ি ঘুরাইয়া গঙ্গার ধারে যাইতে আদেশ করিলেন। গাড়ি প্রায় গ্রে স্ট্রীটের কাছে আসিয়াছিল, সেখান হইতে ঘুরিয়া পুনরায় চৌরঙ্গীর দিকে আসিতে লাগিল।

গাড়ি একেবারে ফোর্টের কাছে গঙ্গার ধারে আসিয়া পৌঁছিল। গঙ্গার ধারে বসিয়া উভয়ে উভয়ের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করিলেন।

মুখুজ্জে মহাশয় বলিলেন, তা হ'লে মুরগীওয়ালার ব্যাপারটাও—

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, "সব ফাঁকি, ঐ লোকটাই প্রতিদিন আমাকে মুরগী সাপ্লাই করে।—আর আপনার স্নান না ক'রে খাওয়া?"

মুখুজ্জে মহাশয় বলিলেন, "আপনার পূজো করার কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, পাছে কোনো অপরাধ নেন। খাওয়া তো বর্ধমানেই সেরে নিয়েছিলাম।"

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, "পূজো-ফুজো সব মিথ্যা,—তবে ঝোঁকের মাথায় নিরামিষ খাই বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনি ভবানীপুর থেকে রেস্তোরাঁয় এলেন কি ক'রে?"

মুখুজ্জে মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "ভবানীপুরের ব্যাপারটাই একটা ব্লাফ—স্রেফ ফাঁকি। নিরামিষ খাওয়া মোটে সহ্য হয় না তাই আপনার হাত থেকে ছাড়া পাবার কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছিল।"

দুই জনের প্রাণখোলা আলাপে এবং হাস্যে গঙ্গার ঘাট আন্দোলিত হইয়া উঠিল। কত কথাই হইল। আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যের তুলনামূলক আলোচনা হইল, আধুনিক সমাজের কথা, আধুনিক সভ্যতার কথা, আধুনিক বিজ্ঞানের কথা বিস্তারিত আলোচিত হইল এবং অবশেষে আধুনিক যাবতীয় কিছুর নিন্দা করিতে করিতে উভয়ে উঠিয়া পড়িলেন, বলা বাহুল্য, আহারের অনাচার সম্বন্ধে ইঁহাদের পূর্বে যে মত জানা গিয়াছিল, এক ঘণ্টা আলাপের পর দুই জনে তাহাতে আরও দৃঢ়বিশ্বাসী হইলেন।

বাড়ি ফিরিয়া রাত্রে দুই জনে নিরামিষই খাইলেন। চক্রবর্তী মহাশয়ের পরামর্শ মতো এ যাত্রার অভিনয়টা অভিনয়ই রহিয়া গেল।

পরদিন বিদায় গ্রহণ। সকালেই ফিরিবার ট্রেন। যাইবার সময় চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, "উভয় পরিবারের চালচলনে যখন এতখানি মিল, তখন এ বিয়ে যে ভগবানের অভিপ্রেত সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

মুখুজ্জে-মহাশয় কামানের গোলার মতই বিদীর্ণ হইয়া তাঁহার শেষ কথাটি উচ্চারণ করিলেন, "কোনও সন্দেহ নেই—নট্ দি লীস্ট।"

(১৩৪৪)

প্ল্যান

নির্বিবাদে মাস্টারি করিতেছিলাম, কিন্তু ক্রমে উহা অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। বাল্য-জীবনের অন্তহীন উচ্চাশাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহারই কোনো একটা বিকলাঙ্গ খণ্ড গলায় ঝুলাইয়া দিনের পর দিন স্কুলে হাজিরা দেওয়া— ইহার চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি আছে?

অনেক রকম চিন্তা করিলাম। পৈতৃক টাকা কিছু ব্যাঙ্কে আছে—বেশি নহে, মাত্র পাঁচ হাজার। আমার চল্লিশ টাকা আয় হওয়া সত্ত্বেও ঐ পাঁচ হাজারে হস্তক্ষেপ করি নাই, তাহার কারণ আছে। নিজস্ব বাড়ি থাকার দরুন বাড়িভাড়া লাগে না, এবং সংসারে আমি ছাড়া উদ্বৃত্ত লোকের মধ্যে আমার একটি স্ত্রী আছেন। একটি ঝি আছে বটে, কিন্তু তাহাকে মাহিনা দিতে হয় না, সে শিশুকাল হইতে আমাদের বাড়িতে থাকিয়া বৃদ্ধা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ওই পাঁচ হাজারের কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়া যায়।

কিন্তু আর তো অল্পে সুখী হওয়া চলে না, ওই পাঁচ হাজার টাকায় যে-কোনো একটা ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে, অধ্যবসায় থাকিলে উন্নতি অনিবার্য ইহা আমি বিশ্বাস করি।

সন্ধ্যায় আমাদের একটা আড্ডা জমিত, একদিন সেখানেই কথাটি উত্থাপন করিলাম। সসঙ্কোচে বলিলাম আমি একটা ব্যবসা করতে চাই।

আড্ডায় আকাশ-পাতাল কত কি আলোচনা হইতেছিল—আমার কথা শুনিবামাত্র সকলেই সমস্বরে প্রশ্ন করিল, কিসের ব্যবসা?

সেটা এখনো ঠিক করি নি।

দীনবন্ধুবাবু বলিলেন, ব্যবসা যদি করতে চান ঘিয়ের ব্যবসা করুন, পাঁচশ টাকা ফেলতে পারলে লাল হয়ে যাবেন দুচার মাসের মধ্যে।

ভবতারণবাবু বাধা দিয়া বলিল, না হে, অত সোজা নয়।

সোজা নয় কেন?—দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন।

কারণ ঘিয়ের ব্যবসায় জোচ্চুরি না করলে কিছু হয় না, কিন্তু জোচ্চুরি করতে হ'লে অভিজ্ঞতা দরকার। মাস্টার মশাই জোচ্চুরির কি জানেন?

দীনবন্ধুবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিল, কখ্খনো নয়, জোচ্চুরি করবার দরকার নেই। মফঃসলে ঘিয়ের সের এক টাকা, কলকাতায় দুটাকা, খরচা বাদে সেরে আট আনা, মণ-পিছু বিশ টাকা। সোজা হিসাব।

ভবতারণবাবু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, সোজা হিসাব হ'লে আর কেউ তিরিশ টাকায় দশ ঘণ্টা কলম ঠেলত না।

ভবতারণবাবু বলিলেন, ব্যবসা করাও যেমন শক্ত, সে সম্বন্ধে কিছু বলাও তেমনি কঠিন। মাস্টার মশাই, আমার একটি পরামর্শ শুনুন, আপনি ঘি ভুলে যান, ব্যবসা যদি করতে হয়, মাছের ব্যবসা করুন। ভোরে উঠে শিয়ালদহ, ব্যস্। ভোরে উঠলেই টাকা। গোয়ালন্দের মাছ, কষ্ট করেছে জেলেরা, কষ্ট করেছে কুলিরা, কষ্ট পেয়েছে মাছ, আপনার কোনো কষ্ট নেই, এ বিষয়ে আমার একটি প্ল্যান আছে।

নরেনবাবু বিড়িতে একটা টান মারিয়া ড্যাম-ইওর-মাছ বলিয়া কাছে আসিয়া বসিলেন।

ভবতারণবাবু নরেনবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেন, মাছ ড্যাম কেন? মশাই মাছের কি জানেন?

দাঁতে বিড়ি চাপিয়া বিকৃতস্বরে নরেনবাবু জবাব দিলেন, মাছের আমি কি জানি? কিন্তু মশায়ের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি জানি সেটা মনে রাখবেন। আপনি মাছের যেটুকু চেনেন আমি তার চেয়ে বেশি চিনি মাছের খদ্দেরকে। মাছ এ যুগে অচল। ব্যবসা যদি করতে হয় সিনেমাই হচ্ছে সব চেয়ে সেরা। দশ হাজার টাকা ছাড়ুন, লাখ টাকা উঠে আসবে এক মাসের মধ্যে। একটা লোক তার পরিবারের জন্যে মাসে ক টাকার মাছ কেনে? বড় জোর দশ টাকা। কিন্তু একটা পরিবার মাসে সিনেমা দেখে—কি বল হে আশুতোষ—কত টাকার?

আশুতোষ ভয়ানক সিনেমা-ভক্ত, সে ভাবিয়া বলিল, মাছের চেয়ে বেশি বটে।

ভূপতিবাবু কথা আরম্ভ করিলে কেহ কথা বলিবার ফুরসুৎ পায় না কিন্তু তিনি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এইবার আর তাঁহার চুপ করিয়া থাকা পোষাইল না—

আমার একটা অদ্ভুত প্ল্যান আছে—মাছ সিনেমা ওসব বাজে একেবারে বাজে।

আড্ডায় প্রায় পনের জন লোক উপস্থিত ছিল, এইবার তাহারা সকলে এক সঙ্গে কথা কহিয়া উঠিল, বোঝা গেল সকলেরই একটি করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্ল্যান আছে। আমাকে ঘিরিয়া লইয়া সকলে সমস্বরে নিজের নিজের প্ল্যান সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে দুই দিক হইতে দুইজন

আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া চেঁচাইতে শুরু করিয়াছে, অন্যান্য সকলে হাত নাড়িয়া সম্মুখে পশ্চাতে গম্ভীর ভাবে আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছে, আমি স্পষ্ট করিয়া কিছুই শুনিতে পাইতেছি না, সকল কথা মিলিয়া মিশিয়া যেটুকু মনে আছে তাহা এই—

মাছ হচ্চে লিজার্ডস্কিন দশ হাজার ফুট তুলে চার হাজার পোল্‌ট্রি ট্যানিং শিখতে আলু পটোল চিৎপুর বাজারে লণ্ড্রিতে ভীষণ চায়ের দোকান এই দেখ না ইনশিওর‍্যান্স ইণ্ডষ্ট্রির চেয়ে শিমূল তুলো মার দিয়া কোল্ড ষ্টোরেজ ফ্রুট সিরাপ মাত্রেই ছাপাখানার ব্যাপারে ফুটবল ম্যানুফ্যাকচার অপটুডেট চিনির কলে কেমিষ্ট জোগাড় করতে মাইকামাইন বিশেষ মনোহারি দোকানে মুরগীর চাষে কলের লাঙল জুড়ে মাসিক পত্র চালানো সেণ্ট পারসেণ্ট তামাক পাতার খাবারের দোকানে ঐ ত মুস্কিল—

মিলিত চীৎকারে কান ঝালাপালা হইয়া গেল, আমিও ঐ সঙ্গে চীৎকার শুরু করিলাম, ব্যবসা করব না, করব না, আপনারা থামুন—

কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হয় না, অগত্যা আমি জোড় হাতে সকলকে নমস্কার করিয়া সেখান হইতে বিদায় লইলাম। কিন্তু তথাপি নিস্তার নাই, চারজন আমার সঙ্গে ক্রমাগত বকিতে বকিতে চলিল, আমি দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম, তাহারাও দৌড়াইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া তিনজন মধ্যপথ হইতে রণে ভঙ্গ দিল, মাত্র একজন থাকাতে অনেকটা সাহস পাইয়া দৌড়ান বন্ধ করিলাম। তখন সে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিল, আমার প্ল্যানটা—

তোমার মাথাটা—আমি ব্যবসা করব না।

সে কি হয়, ব্যবসার চেয়ে—

কি হে বিপিন!

চমকিয়া চাহিয়া দেখি আমার এক বন্ধু গাড়ি হইতে ডাকিতেছেন। গাড়ি কাছে আসিল; বন্ধু আমার ভয়ার্ত মুখ দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন। আমি বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, আমাকে দেখে যতটা মনে করছ ততটা না হ'লেও খানিকটা বিপদে পড়েছি, কিন্তু মনে হচ্ছে বাঁচা গেল। চল তোমার সঙ্গে যেদিকে হোক খানিকটা যাওয়া যাক।

আমার সঙ্গে যিনি প্ল্যান আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। গাড়িতে উঠিয়া বন্ধুকে সংক্ষেপে বিপদের কথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে সত্যি বেঁচেছিস

যে-সব ব্যবসার কথা শুনলাম ওতে তোর সর্বনাশ হ'ত, ব্যবসা সম্বন্ধে আমার একটা অদ্ভুত প্ল্যান আমি ঠিক ক'রে রেখেছি, যদি লাগে তোর কাজেই লাগুক।

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, কতদূর এসেছি?

হাওড়া স্টেশনের কাছে।

তা হ'লে থামাও আমার একটা গুরুতর কাজ আছে, এক্ষুনি নামতে হবে, প্ল্যান অন্য দিন শুনব। গাড়ি থামিবামাত্র নামিয়া গেলাম। গাড়ি অদৃশ্য হইল, আমিও ট্রামে উঠিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রে ঘুমটা ভালই হইয়াছিল, কিন্তু গোলমালে ভোরের বেলাই ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ফটক খুলিতেই দেখি পূর্ব দিনের কয়েকজন এবং আরও নূতন কয়েকজন লোক নিজেদের মধ্যে কোন্ ব্যবসা শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া তুমুল তর্ক আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আমাকে দেখিবামাত্র দুই তিন জন খপ্ করিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল।

একজন বলিল, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আমার কথা যদি । আর একজন বাধা দিয়া বলিল, তোর গ্যারান্টির মূল্য কি?

ইহার পর আর ইহাদের তর্ক অনুসরণ করিতে পারি নাই, কেন না পূর্ব দিনের মতো দশ-বারো জন সমস্বরে চীৎকার করিয়াছে।

আমি তর্কের মধ্যে ফস্ করিয়া উহাদের হাত ছাড়াইয়া ভিতরে ঢুকিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম, আমার হিতৈষিগণ চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল।

অন্যান্য দিন সাধারণত বেলা নয়টায় গঙ্গা-স্নান করি। সে দিন ভয়ে ভয়ে আটটায় স্নান করিতে গিয়াছি। জলে নামিয়া একটিমাত্র ডুব দিয়াছি, আমার পাশে কে স্নান করিতেছিল পূর্বে খেয়াল করি নাই, ডুব দিয়া উঠিতেই সেই অপরিচিত লোকটি হঠাৎ বলিল, ও আপনি! ভাল কথা, আপনি নাকি ব্যবসা করবেন? আমাকে আপনি চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি—সে যা হোক, আপনি যদি টাকা নষ্ট করতে না চান তবে ইন্শিওর‍্যান্স—

আমি ভাল সাঁতার জানিতাম। ইন্শিওর‍্যান্সের কথা শেষ হইবার আগেই ভগবান বাঁচাও" বলিয়া ডুবিয়া গেলাম। প্রায় এক মিনিট জলের ভিতর চলিয়া মাথা তুলিতেই দেখি আমার নিকট হইতে তিন হাত দূরে সেই লোকটিও মাথা তুলিল। প্রায় এক মিনিট দম বন্ধ করিবার পর তৎক্ষণাৎ আবার ডুব দেওয়া সম্ভব নহে, কাজেই নির্বোধের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সে একটু কাছে আসিয়া বলিতে লাগিল, আমাদের কম্পানির নাম ইনফ্যাণ্ট বেঙ্গল লাইফ, পলিসি কণ্ডিশানগুলো যদি—

কিন্তু যতই কষ্ট হউক, ইহার পর আমি আর মাথা তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার ডুবিয়া সেখান হইতে সরিয়া যাইতে লাগিলাম ; তারপর যেমনি মাথা তুলিয়াছি দেখি ইন্‌ফ্যাণ্ট বেঙ্গলও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। আমাকে দেখিবামাত্র সে বলিতে আরম্ভ করিল, আমাদের H. M. System—6 years' rating up—রিজার্ভের সঙ্গে লাইফ ফাণ্ডের অনুপাত—

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম, বুঝতে চাই না।

ভদ্রলোক বাধা দিয়া বলিলেন, না বুঝে কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া উচিত নয়, আপনাকে বুঝতেই হবে।

"হে মধুসূদন" বলিয়া আবার ডুবিলাম। কিন্তু দশ সেকেণ্ডের মধ্যে এক ভীষণ কাণ্ড ঘটিল। জলের ভিতর দিয়া ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতে মাথায় কিসের সঙ্গে ভয়ানক গুঁতা লাগিয়া গেল। শুশুক মনে করিয়া ভয়ে তাড়াতাড়ি মাথা তুলিতেই দেখি, শুশুক নহে, ইন্‌ফ্যাণ্ট বেঙ্গলের মাথা। মাথাটি যেন কথা বলিতে বলিতেই উঠিল,—শেষ পর্যন্ত ইনশিওর‍্যান্সে আপনাকে নামতেই হবে, এর থেকে পরিত্রাণ নেই।

কথাটা আমার অনেকটা বিশ্বাস হইল। বলিলাম, আপনার মতো অধ্যবসায় তো আমার নেই।

বলেন কি, আপনার অধ্যবসায় যা দেখছি আমি তো তার কাছে শিশু। অল্প মূলধনে যদি ব্যবসা করতে হয়—

ব্যবসার কথা শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম। পরিত্রাণ পাইবার জন্য শেষ চেষ্টা করিতে হইবে। আবার ডুবিলাম। এবারে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া অপর পারের দিকে ছুটিতে লাগিলাম, পূরা এক মিনিট তীব্র বেগে ছুটিবার পর যখন উঠিলাম তখন দেখি আহিরীটোলা-ঘাটের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। ইন্‌ফ্যাণ্ট বেঙ্গল আমার গতি অনুমান করিতে না পারিয়া উল্টা দিকে চলিয়া গিয়াছে, না হইলে নিশ্চয় লাইফ ফাণ্ড কিংবা এক্স্‌পেন্স্‌ রেশিও সম্বন্ধে কথা তুলিত।

ভীষণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। পুনরায় সাঁতার দিয়া অপর পারে যাওয়া সম্ভব নহে। তীরে উঠিয়া ভিজা কাপড়ে জেটির দিকে চলিতে লাগিলাম। অবসন্ন দেহ, ধীরে ধীরে পা ফেলিতেছি, এমন সময় কে খপ্‌ করিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, কি বিপিনদা, একেবারে দেখতেই যে পাচ্ছেন না!

ইনি আমার শ্যালক।

আমি খুশী হইবার চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না, গম্ভীর ভাবে বলিলাম, ভাই, হাটতে বড় কষ্ট হচ্চে—ওপার থেকে সাঁতার কেটে এসেছি, তোমার গায়ে একটু ভর দিয়ে চলি।

কোথায়?

ষ্টীমারের জেটিতে। সঙ্গে পয়সা নেই, একটা টিকিট কিনে দাও।

আমিও যে আপনার বাড়িতেই যাচ্ছি।

কি মনে ক'রে?

আজ এইমাত্র শুনলাম, আপনি চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করতে যাচ্ছেন। যা-তা ব্যবসায় পয়সা নষ্ট না ক'রে চাকরি করাই কি ভাল নয়?

এইবার যথার্থ খুশী হইয়া বলিলাম, ব্যবসা আমি করব না, চাকরি বেঁচে থাক্।

যদি করতেন, তা হ'লে কিসের করতেন বলুন তো?

কিছু মনে করবার সময় পাইনি ভাই, মনে করব ব'লে মনে করছিলাম।

যদি নেহাৎই ব্যবসা করতে হয় তা হ'লে আমি একটি ভাল প্ল্যান—

তুমিও প্ল্যান? দেখ, আমার প্ল্যান-ট্যান কিছু দরকার নেই।

বলেন কি। ব্যবসার গোড়ার কথাই হচ্ছে প্ল্যান, যে ব্যবসা করবেন—

আমি বিনা প্ল্যানে ব্যবসা করব।

তা হয় না, আপনি একটা অসম্ভব কথা বললে আমি শুনব কেন? কিসের ব্যবসা করবেন, কত টাকা ফেলবেন, কিনে বেচা না ম্যানুফ্যাকচার, কমিশন এজেন্সি না আমদানি রপ্তানি, কত টাকা খাটবে, কত ব্যাঙ্কে থাকবে,—ধরুন যদি দশহাজার টাকা এষ্টিমেট ক'রে থাকেন তা হ'লে প্রথমেই অন্তত পাঁচ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুত রাখা চাই, আরো বেশি রাখতে পারলে আরো ভাল হয়।

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম, ভগবান!

শ্যালক তৎক্ষণাৎ বলিল, ভগবান প্রথম অবস্থায় কিছুই করেন না, ডাকতে হয় শেষ কালে ডাকবেন।

শ্যালকের মুখে বক্তৃতার খই ফুটিতে লাগিল, আমি নিরুপায়, ষ্টীমার হইতে লাফাইবার শক্তি নাই, চুপ করিয়া রহিলাম।

চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে ক্লান্তিবশত চোখ বুজিয়া আসিয়াছে—আধ-জাগ্রত অবস্থায় এক বিভীষিকা দেখিলাম। সমস্ত শালিখার লোক বাঁধাঘাটে আমাকে ষ্টীমার হইতে নামাইয়া লইবার জন্য আসিয়া ভিড় করিয়া

দাঁড়াইয়াছে। আম ঘাটে পৌঁছিবামাত্র হাজার হাজার লোক 'আমার প্ল্যান, আমার প্ল্যান' বলিয়া চীৎকার করিয়া চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। তাহার মধ্যে আমার স্ত্রীকেও দেখা যাইতেছে, সেও তাহার এক প্ল্যান লইয়া আসিয়াছে; আমাদের বৃদ্ধা ঝি তাহার পশ্চাতে 'পেলান পেলান' করিয়া চীৎকার শুরু করিয়াছে। তাহার দাঁত নাই এবং সেই জন্যই তাহার স্বর কোনো বাধা না পাইয়া সকলের স্বরকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আমি ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিলাম। এইটুকু পর্যন্ত বেশ মনে আছে, ইহার পরের ঘটনা আর কিছু মনে পড়ে না। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখি, আমি হাঁসপাতালে শুইয়া এবং পাশে আমার স্ত্রী এবং শ্যালক বসিয়া। স্ত্রী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে এবং শ্যালক তাহাকে নানা রকম সান্ত্বনা দিতেছে।

হঠাৎ একটি শব্দ আমার কানে প্রবেশ করিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। পাশের বিছানা ঘিরিয়া যাহারা বসিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কি আলোচনা হইতেছিল এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু কথার ভাবে স্পষ্ট বোঝা গেল তাহাদের সমস্যা ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—কোনো কথার অর্থগ্রহণ করিবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। প্ল্যান কথাটি শুনিবামাত্র আবার উন্মাদ হইয়া উঠিলাম। উঠিয়া বসিলাম।

আমাকে জাগ্রত দেখিয়া শ্যালক হঠাৎ তাহাব যাবতীয় দাঁত বাহির করিয়া বলিল, বিপিন দা, আমাব প্ল্যানটা তাহ'লে এবারে বলি ?

আর থাকিতে পারিলাম না, বিছানা হইতে আচম্বিতে লাফ দিয়া উঠিয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

* * *

আজ সাত দিন হইল মামা-বাড়িতে লুকাইয়া আছি এবং আরো কিছুদিন থাকিব বলিয়া মনে করিতেছি। চাকরিটি থাকিবে না এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যবসা করিয়াই খাইতে হইবে কিন্তু সে ব্যবসা অন্য কাহারো প্ল্যানে নহে।

সেরূপ অবস্থা হইলে মৃত্যুর প্ল্যান চিন্তা করিতে হইবে।

(১৯৩৩)

আলবিবা ও ব্রজবিলাস

১

আলিবাবা দস্যুদের রত্ন-গৃহ আবিষ্কারের পর থেকে যা-যা করেছিল তা সকলেরই জানা, সুতরাং তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তৎকালীন বাদশার আদেশে আলিবাবা-আখ্যানের একটি বড় অংশের প্রচার বন্ধ থাকাতে সেই অংশটি অদ্যাবধি কেউ জানেন না। বাদশার হুকুম ছিল কড়া, কেউ সে কাহিনী প্রকাশ করলে তার প্রাণদণ্ড হ'ত, অনেকেই প্রাণ দিয়েছে এ জন্যে। তার পর থেকে ধীরে ধীরে লোকের মন থেকেও তা লুপ্ত হয়ে গেছে এবং তার বদলে প্রচারিত হয়েছে এক অসম্ভব কাহিনী যা আরব্যরজনী গ্রন্থে সবাই পড়েন।

মাত্র একটি লোক, অলকরিম তাঁর নাম, তিনি বাগদাদ থেকে পালিয়ে তুরস্কে যান এবং সেখানে গিয়ে সেই কাহিনীটি গোপনে লিখতে শুরু করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, লেখা-শেষে একটি লৌহ পেটিকায় বন্ধ করে তাঁর বংশধরদের ভবিষ্যৎ সম্পত্তি হিসাবে সেটি লুকিয়ে রাখবেন এবং কয়েক পুরুষ পরে তারা তা বিক্রি করে লাভবান হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অলকরিমের একমাত্র সন্তানের আর কোনো সন্তান না থাকাতে উক্ত লৌহ পেটিকাটি বংশানুক্রমিক ভাবে হস্তান্তরিত হওয়া আর সম্ভব হয়নি, এবং অলকরিমের পুত্র অল-কলিমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পেটিকার অস্তিত্বও লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু গত জানুয়ারি মাসে তুরস্কে ভূমিকম্পের ফলে যে বৃহৎ ফাটলটি দেখা দেয়, সেই ফাটল থেকে এত কাল পরে সেই লৌহ-পেটিকা এবং তৎসহ সেই সযত্ন-রক্ষিত কাহিনীটি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কাহিনীটি পৃথিবীর সকল ভাষাতেই প্রচারিত হবে, কিন্তু আমি প্রাচীন আরব্য ভাষায় পণ্ডিত, এবং বাংলা দেশের সঙ্গে কাহিনীটির সম্পর্ক আছে, সে জন্যে আমিই প্রথম প্রচারের ভার পেয়েছি।

কাহিনীটি এই—

আলিবাবা মাত্র তিনটি গাধার সাহায্যে দস্যুদের গুপ্ত গুহা থেকে ধনরত্ন বয়ে আনছে। তার ঘর ভরে উঠছে বহুমূল্য হীরা-জহরতে। ওজন করে করে মাটিতে পুঁতছে ফতিমা। এক দিন যায়, দু'দিন যায়, কিন্তু তৃতীয় দিনে বাধা উপস্থিত হল। সে এক অভাবিত কাণ্ড। তিনটি গাধা বেঁকে দাঁড়াল, তারা বোঝা পিঠে নিয়ে আর নড়ে না, আলিবাবা তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও তাদের এক পা সরাতে পারল না। তার সোনার স্বপ্ন

যে ভেঙে যায়! কি সর্বনাশ! চার দিকে মণি-মুক্তার পাহাড়, লাল নীল সবুজ আলোর বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে চারি দিকে, চোখ ঝলসে যায় তার দ্যুতিতে, কিন্তু সেই দিন সেই আলো আলিবাবার চোখে নিষ্প্রভ হয়ে এলো, তার মাথা ঘুরে উঠল, সে হতাশ ভাবে সেই মণি-গুহার মাঝখানে পড়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল। আর সময় নেই, একটু পরেই দস্যুরা ফিরে আসবে, এসে যদি দেখতে পায়, তাদের ভাণ্ডারে সিঁদ কেটে আর এক দস্যু প্রবেশ করেছে, তাহলে আর রক্ষা নেই। আলিবাবা উন্মাদের মতো দাঁড়িয়ে উঠে আবার ঠেলতে লাগল গাধাদের, কিন্তু আগের মতোই এবারেও কোনো ফল হল না। আলিবাবা করুণ চোখে চেয়ে রইল তাদের দিকে। এমন সময় আলিবাবাকে স্তম্ভিত করে একটি গাধা মানুষের ভাষায় বলে উঠল, বোঝা বইব, যদি বোঝার অর্ধেক আমাদের দাও।

আলিবাবা নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না, তার মনে হচ্ছিল সে যেন আরব্য উপন্যাসের এক নায়ক, সে যেন এই রূপকথার মায়ারাজ্যের কোনো মানুষ, আর গাধাগুলো সব রূপকথার গাধা। এ কি ভৌতিক কা । এ কি কঠিন সমস্যা!

গাধাটি আবার বলে উঠল, অর্ধেক ভাগ না দিলে শুধু যে আমরাই বইব না তা নয়, বাইরের কোনো গাধাকেও বইতে দেব না; ভুলে যেয়ো না, আমাদের বোঝা বওয়ার উপরেই তোমার ভাগ্য নির্ভর করছে।

কিন্তু এ প্রস্তাবে আলিবাবা রাজি হয় কি করে? তার লোভ দুর্দাম হয়ে উঠেছে। তিনটি মাত্র গাধাতেই তার দুঃখের সীমা ছিল না, হাজার গাধা দরকার ছিল, কিন্তু লোকে সন্দেহ করবে ভয়ে সংখ্যা বাড়াতে পারে নি। এর উপর আবার অর্ধেক ভাগ দিতে হবে? আলিবাবা উত্তেজিত ভাবে ব'লে উঠল—না না না ব'লে ঝড়ের মতো বেগে বেরিয়ে গেল গুহা থেকে গাধারাও বোঝা ফেলে তাকে অনুসরণ করল।

আলিবাবার মনে ভয় জেগেছে, সন্দেহ জেগেছে—এ কার মন্ত্রপূত গাধা—কোন্ অপদেবতার খেলা—না এ ডাকাত দলের কোনো ফাঁদ! সে বুঝতে পারলে, আর যাই হোক, তার ভাগ্যপথে এইখানেই কাঁটা পড়ল।...কিন্তু সে যা পেয়েছে তাও যদি ভূতের খেলা হয়?...

তার হঠাৎ মনে পড়ল অলকেমির কথা। অলকেমি বৈজ্ঞানিক, তাঁর কাছে গেলে হয়তো এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। হয়তো রহস্য ভেদ একমাত্র তাঁর হাতেই হতে পারবে।

কিন্তু আলিবাবাকে নিরাশ হতে হ'ল। সে গিয়ে দেখতে পেল, অলকেমি শিসেকে সোনা বানাবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় উন্মাদ। এই উন্মাদ যদি টের পান যে, আলিবাবা বিনা পরিশ্রমে সোনা বানাবার কৌশল আবিষ্কার করেছে, তা হ'লে হয়তো তিনিই আলিবাবার অংশীদার হতে চাইবেন।

মরুভূমির পথে চলা কি দুঃসাধ্য কাজ! যখন সে অলকেমির কাছে ছুটে এসেছিল, তখন তার মনে ছিল উৎসাহের আগুন, তাই পথের দুঃখকে সে দুঃখ মনে করেনি, কিন্তু এখন? এখন সে ফিরে চলেছে হতাশ হয়ে, তার মনের আগুন নিবে গেছে, তাই এখন সে আগুন অনুভব করছে পায়ের নিচে। দিগন্ত-বিস্তৃত মরু-বালুকা পাহাড়ের মতো তরঙ্গায়িত হয়ে একের পর এক মাথা তুলে আছে, চলতে চলতে পথ আর শেষ হয় না। এমন সময় সে দেখতে পেল, তারই মতো আর এক হতভাগ্য চলেছে সেই তপ্ত পথে একা পায়ে হেঁটে। মুখ তার আকাশে তোলা, দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী, আকাশের প্রচণ্ড অগ্নিগোলক তার চোখে-মুখে অগ্নিবর্ষণ করছে, কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

আলিবাবা আরও এগিয়ে দেখতে পেল, মুখে তার এক তামাকের পাইপ। এ রকম অদ্ভুত মানুষ দেখে তার কৌতূহল দুর্নিবার হয়ে উঠল, জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে?

—আমি? আমি এক জন বাঙালী বৈজ্ঞানিক, নাম ব্রজবিলাস।

—বৈজ্ঞানিক? আপনি কি অলকেমির শিষ্য?

—না। আমি ডক্টর থর্নডাইকের শিষ্য। আগে অবশ্য আমার গুরু ছিলেন শার্লক হোম্‌স, কিন্তু থর্নডাইকের বিশুদ্ধ ল্যাবরেটরি মেথড আমার খুব পছন্দ।

—তিনি কে?

—তিনি ডিটেকটিভ, আমার গুরু।

—ডিটেকটিভ কাকে বলে?

—খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যিনি রহস্যভেদের কাজ করেন, তাঁকে ডিটেকটিভ বলে।

আলিবাবা যেন হাতে স্বর্গ পেল এই কথা শুনে। বলল, আমি একটি মহা রহস্যে পড়ে মারা যেতে বসেছি, যদি একবার মেহেরবানি করেন আমার প্রতি।

—এখন আমার সময় নেই, দেখছ না, আমি অন্য একটি রহস্যভেদে নিযুক্ত আছি? আপাতত আমি উজবেকিস্তানের ধুলো সংগ্রহ ক'রে ফিরছি।

—ধুলো কেন?

—মাইক্রোস্কোপে দেখব ব'লে। কয়েক জন অপরাধী তেহেরানের জেল ভেঙে পালিয়েছে। সেখানে তাদের ফেলে-যাওয়া জামা ঝেড়ে যে ধূলো পেয়েছি, তার মধ্যে এক জাতীয় সিল্কের আঁশ পাওয়া গেছে, এই সিল্ক এক মাত্র উজবেকিস্তানে পাওয়া যায়। তাই মিলিয়ে দেখব ঐ লোকগুলো উজবেক কি না। অথচ জেলে তারা পরিচয় দিয়েছিল ফিলিস্টাইন ব'লে।

তা হ'লে উজবেকিস্তানের সিল্ক না এনে ধূলো আনলেন কেন?

আগেই বলেছি ল্যাবরেটরি মেথড আমার পছন্দ। "ইন্‌ডাকশন বাই সিম্পল এনিউমারেশন" রীতিকে আমি অবৈজ্ঞানিক মনে করি। স্থূল চোখে দেখা জিনিসে আমি ভরসা করি না। আমার পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং খাঁটি বৈজ্ঞানিক।

আলিবাবা এ-সব শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। ব্রজবিলাসের প্রতি তার শ্রদ্ধা জেগে উঠল। সে কাতরভাবে বলল, দোহাই আপনার, আপনি আমার রহস্যটি আগে ভেদ করুন, আমি আপনাকে প্রচুর হীরে-জহরৎ দেব।

হীরে-জহরতের কথায় ব্রজবিলাস চমকিত হয়ে বলল, কি রহস্য তোমার?

আমার তিনটি গাধা হঠাৎ আমার কাজ করতে অস্বীকার করছে, আর সব চেয়ে মজার কথা এই যে, তারা মানুষের ভাষায় কথা বলছে, তারা বলছে, মজুরি না বাড়ালে তারা কাজ করবে না।

ব্রজবিলাস লাফিয়ে উঠল এই অদ্ভুত কথা শুনে। বলল, সত্যি বলছ?—তা হ'লে রাজি আছি তোমার রহস্যভেদ করতে।

২

বাগদাদের কাছেই ব্রজবিলাস তার ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। ঠিক হ'ল, সে ঘাঁটিতে গিয়ে তার সহকারী শম্ভুকে কয়েকটা জরুরী নির্দেশ দিয়ে আলিবাবাকে অনুসরণ করবে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। টাইগ্রিস নদীর ধার দিয়ে, খেজুর-বীথির মাঝখান দিয়ে চলেছিল দু'জন, এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। অতর্কিতে অজ্ঞাত স্থান থেকে একটি অতি ধারালো ফলাকাযুক্ত তীর বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে ব্রজবিলাসের পিঠে লাগল এবং বুকের ঠিক মাঝখানটা ভেদ করে বেরিয়ে সম্মুখস্থ একটি খেজুর গাছে গিয়ে বিঁধল। আলিবাবা ভয়ে লাফিয়ে উঠল। ব্রজবিলাস হেসে বলল, ভয় পেয়ো না, শত্রুপক্ষ অনুসরণ করছে, তার মানে আমাকে তারা ভয় করছে।

আলিবাবা কিছুতেই ভেবে পেল না, ব্রজবিলাস এত বড় আঘাতেও চঞ্চল হচ্ছে না কেন। তার মুখে আর কথা নেই, দুজনেই চলছে চুপচাপ। এমন সময় হঠাৎ তিন চার জন ভীষণ আকৃতির লোক তাদের দিকে ছুটে এসে ব্রজবিলাসের গলাটি তরবারির আঘাতে একেবারে কেটে ফেলল এবং মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্রজবিলাসের মুণ্ডটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

স্তম্ভিত আলিবাবা ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। এতখানি আশার পর হঠাৎ এই নৈরাশ্যে তার হাত-পা অসাড় হয়ে এলো, মনে হ'ল সে-ও মাটিতে পড়ে যাবে।

এমন সময় ব্রজবিলাসের ভূলুণ্ঠিত ছিন্নমুণ্ড মৃদু হেসে ব'লে উঠল, এ ভালই হ'ল, ভেবে দেখলাম এতে আমার কাজের সুবিধাই হবে।

আলিবাবার সমস্ত দেহ ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠল। এ কি তবে সবই ভৌতিক খেলা? গাধা, ব্রজবিলাস, আলিবাবা—কিছুই সত্য নয়—সব মায়া, সব ভোজবাজী? কোন্ যাদুকরের হাতে পড়ল সে?

ব্রজবিলাসের মুণ্ড বলল, ভয় পেয়ো না, তোমার কাজ আমি ঠিক ক'রে দেব।

আলিবাবা কম্পিত কণ্ঠে বলল, কিন্তু আপনি তো মারা গেছেন।

মুণ্ড বলল, আদৌ না। বিশ্বসৃষ্টির বিধানে প্রাণিজগতে একমাত্র অ্যামিবা ও ডিটেকটিভ এই বিশেষ সুবিধাটি ভোগ করে থাকে।

আলিবাবা কিছুই বুঝতে পারল না। সে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখল, ব্রজবিলাসের একখানা হাত আপন মুণ্ডটি মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যথাস্থানে লাগিয়ে দিল। তার পর হাসতে হাসতে বলল, এখন সব বুঝিয়ে বলাব সময় নেই, শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে, ডিটেকটিভ সম্প্রদায় কোনো আততায়ীর হাতে মরে না, এটা আমাদের স্পেশাল প্রিভিলেজ। হয়তো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবেই এটি আমরা বিধাতার কাছ থেকে পেয়ে থাকব।

কথাটা আলিবাবার বোধ হয় বিশ্বাস হল, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, কেননা এ রকম অদ্ভুত ঘটনা তার কল্পনারও অতীত ছিল। সে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করল, মুণ্ডটি মাটিতে পড়ে গেলে আপনি বলেছিলেন, ওতে আপনার সুবিধা হল, তার মানে কি?

ব্রজবিলাস বলল, মানে এই যে, যেখানে শুধু দৈহিক শ্রম, বুদ্ধির দরকার নেই, সেখানে অকারণ মাথাটিকে বহন করি, আবার যেখানে শুধু চিন্তা দরকার সেখানে অকারণ মাথাটির সঙ্গে হাত-পাগুলোকে আটকে রাখি। এই বিষম

অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে গেলাম। এখন থেকে আমি যখন ভেদচিন্তায়—অর্থাৎ রহস্যভেদ-চিন্তায় ডুবে থকেব, তখন আমার দেহটিকে পাঠাব নানা তথ্য-সংগ্রহের কাজে।

—চিন্তা ও কাজ একসঙ্গে দরকার হলে ?

—মাথাটি সঙ্গে নিয়ে যাব।

৩

ব্রজবিলাস আলিবাবার রহস্যভেদের কাজ শুরু করেছে। অর্থাৎ সে গাধাগুলোর যথারীতি মাপ নিয়ে তাদের খুর থেকে পাম্পের সাহায্যে সামান্য কিছু ধুলো সংগ্রহ ক'রে মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলেছে পরীক্ষার জন্য।

গাধাগুলোর মাপ-জোক নিয়ে এবং গায়ে দু-একটা গুঁতো মেরে যেটুকু বোঝা গেছে তা এই যে ওরা অত্যন্ত শান্ত। তাতে প্রমাণ হয়, ওরা মনিবের হাতে ভাল ব্যবহার পায়। কিন্তু একটু বেশি শান্ত ব'লে, সন্দেহ হয়, গাধাগুলো মতলবাজ, এবং গাধার যতটা বুদ্ধি থাকা দরকার তার চেয়ে ওদের বুদ্ধি কিছু বেশি আছে। আরব, সীরিয়া এবং ঈজিপ্ট, এই তিন দেশের গাধাই ভদ্র, কিন্তু আলিবাবার গাধা অতিভদ্র।—কিন্তু কেন ?··· এই প্রশ্নের জবাব পেলেই সব রহস্য ভেদ হবে।

ব্রজবিলাস চিন্তা করে চলেছে। ইতিমধ্যে শম্ভু স্লাইডগুলো নম্বর ক'রে মাইক্রোস্কোপের নীচে সাজিয়ে রেখেছে—ব্রজবিলাস সেইখানেই এসে বসল। কিন্তু এক বেলা ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে সে যা পেল তাতে রহস্য তার কাছে আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। গাধার খুরের ধুলো বিশ্লেষণ ক'রে পাওয়া যাচ্ছে চালের গুঁড়ো, সিল্কের আঁশ এবং গাঁজ-পাতার টুকরো। এ তিনটি জিনিসই বাংলা দেশে পাওয়া যায় এবং উজবেকিস্তানেও পাওয়া যায়। তবে কি এগুলো বাংলা দেশের গাধা ?

ব্রজবিলাস আবার পরীক্ষা শুরু করল, এবং পরীক্ষার পর পরীক্ষা করতে করতে অবশেষে তার মুখে হাসি ফুটল, কারণ এখন যে সিল্কের আঁশ দেখা যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে উজবেকিস্তানের।

কিন্তু এ হাসি বিজয় লাভের হাসি নয়।···কারণ লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে। ···উজবেকিস্তানের পলাতক আসামী ! উজবেকিস্তানের গাধা !···তবে কি এর মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে ? তবে কি আসামীরা এই গাধায় চড়ে

তেহেরানে এসেছিল ?…হয় তো তাই। ব্রজবিলাস ভাবতে লাগল। কিন্তু কিছু পরেই বুঝতে পারল এ ঘটনা সত্য হলেও আসামীদের সন্ধান-সূত্র এর মধ্যে নেই। কিন্তু তবু নিশ্চিত হওয়া দরকার। সে আলিবাবাকে জিজ্ঞাসা করল তার গাধাগুলো কত দিনের, এবং জানতে পারল, সেগুলো তার বাচ্ছা-কাল থেকে পালিত গাধা।

—তুমি হলফ করে বলতে পার এ কথা ?

আলিবাবা হলফ ক'রে বলার আগে গাধা তিনটিকে ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে লাগলো। ব্রজবিলাসের প্রশ্নে তার মনে সন্দেহ জেগে থাকবে, কিংবা সত্যই সে দেখতে পেল যেন এ গাধাগুলো তার পরিচিত গাধাগুলোর চেয়ে কিছু অন্য রকম। কিন্তু পার্থক্যটা যে কোথায় তা সে ঠিক বুঝতে পারল না।

ব্রজবিলাস খুশী হয়ে বলল, বাস্, ওতেই হবে।

কিছুক্ষণ পরে ব্রজবিলাস আলিবাবাকে বলল, আমার শুধু মুণ্ডটা আর একবার গাধার কাছে নিয়ে যাও, আমি আর একটু দেখব। দেখার বিশেষ কিছুই ছিল না, কেননা যন্ত্রের দেখা ভিন্ন তার কাছে অন্য দেখার কোনো অর্থ নেই। তবু সে গাধাদের চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। এমন সময় সে হঠাৎ লক্ষ্য করল, তিনটি গাধার ছয়টি চোখ যেন হাসছে। সে হাসি সাধারণ হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি। ব্রজবিলাস মনে মনে বলল, এই চ্যালেঞ্জের উত্তরে সে দেবে।

৪

ব্রজবিলাস তিন দিন ধরে কেবল ভাবছে। মুখে পাইপ, কিন্তু তার ধোঁয়া মুখের ভিতরে দিয়ে গিয়ে কণ্ঠপথে বেরিয়ে যাচ্ছে, কারণ চিন্তা করছে শুধু তার মাথাটি। দেহটিকে সে আজ ক'দিন হল পাঠিয়েছে তেহেরানে কতকগুলো তথ্য সংগ্রহের কাজে। চিন্তা করছে সে অবিরাম, কারণ কোনো বাধা নেই, খাবার চিন্তা নেই, খাচ্ছে তেহেরানে বসে তার দেহটি—তরল খাদ্য গলার নালি দিয়ে পেটে নেমে যাচ্ছে। তারই আনীত খবরে জানা গেল, পলাতক আসামীরা পূর্বে গাধার ব্যবসা করত।

ঊর্ধ্ব-ব্রজবিলাস নিম্ন-ব্রজবিলাসকে বলল—তুমি পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক, দরকার হলে ডাকব, তবে দিন পাঁচেকের আগে বোধ হয় আর দরকার হবে না তোমাকে।

ব্রজবিলাসের বিচ্ছিন্ন শির নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চিন্তা করে ছিন্ন চিন্তাসূত্রগুলিকে একত্র মেলাবার চেষ্টা করে চলছে। (১) উজবেকিস্তানের গাধা! (২) উজবেকিস্তানের পলাতক আসামীর গাধার ব্যবসা। (৩) আলিবাবার গাধার মুখে মানবীয় ভাষা! (৪) মানবীয় বিদ্রূপের হাসি!

সব যেন মিলতে মিলতে মিলছে না, কোথায় যেন খেই হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মেলাতেই হবে, কারণ, তাহ'লে দুই পৃথক রহস্য একই খরচে ভেদ হয়ে যাবে। যত চিন্তা করে, ততই তার মনে হয়, ঘোর অন্ধকারে একই পথে সে চলছে দু'টি দরজা পার হয়ে।

সাত দিন কেটে গেল, কিন্তু কোথায় দরজা? অবশেষে অষ্টম দিনও যখন প্রায় কাটে, তখন তার চোখে পড়ল এক জোড়া মোজা। বহু দিন আগে পা থেকে মোজা-জোড়া খুলে রেখেছিল, সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে। একটি সত্য তার মনে জেগে উঠল। মোজা-জোড়া খোলার সময় উল্টে গিয়েছিল, ঐ ভাবেই পড়ে আছে। তার মনে হল, সে-ও বোধ হয়, সব উল্টো ক'রে ভাবছে, সোজা ক'রে ভিতরের দিকটা বাইরে টেনে আনলেই হয়তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

কিন্তু কি আশ্চর্য কাণ্ড। সত্য সত্যই তাই ঘটে গেল? হঠাৎ সব রহস্য জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল, যেন একটি বিদ্যুত আঘাতে,—হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন বিদ্যুতের আঘাতে যেমন জল হয়! ব্রজবিলাসের ছিন্ন শির থেকে চিন্তার গুরুভার নেমে যাওয়াতে অত্যন্ত লঘু ভাবে মুণ্ডটি টেবিলের উপর আনন্দে লাফাতে লাগল।

শম্ভু—শম্ভু—

শম্ভু ছুটে এলো ঝড়ের মতো, দেহটিও ছুটে এসে মুণ্ডটি হাতে তুলে নিল। ব্রজবিলাস চঞ্চল ভাবে শম্ভুকে বলল, অবিলম্বে একখানা ছুরি চাই, ছুরি নিয়ে এখুনি চল আমার সঙ্গে আলিবাবার বাড়ি। আমি নিজেই গাধা, তাই এত দিন উল্টো পথে চলেছিলাম—হায় রে, এতগুলো দিন আমার বৃথা নষ্ট হয়েছে!

আলিবাবার বাড়িতে পৌঁছে ব্রজবিলাস চীৎকার ক'রে বলল, কোথায় গাধা?

গিয়ে দেখল, গাধাগুলো তারই পূর্ব-নির্দেশ অনুযায়ী খুব শক্ত ক'রে বাঁধা আছে। সে সেখান থেকে আর সবাইকে সরিয়ে দিয়ে ছুরি বের করল এবং ছুরি দিয়ে উন্মাদের মতো পর পর তিনটি গাধার পেট—গলা থেকে পিছনের পা পর্যন্ত চিরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে তিনটি লোক বেরিয়ে এলো—

তিনটি নাম-করা কমিউনিস্ট। এরাই তেহেরানের জেল ভেঙে পালিয়েছিল। হাতে তাদের এক গাদা করে ইস্তাহার।

বিশ্বসুদ্ধ লোক অবাক হয়ে গেল ব্রজবিলাসের আশ্চর্য ক্ষমতায়। দুনিয়ার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে তাকে একটি বিবৃতি দিতে হল, কিন্তু বুদ্ধি করে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে দিল। বলল, সমাধান অত্যন্ত সহজ! গাধা মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে স্ট্রাইক করেছিল, ঐখানেই আমার সন্দেহ জাগে। ওরা নিজেদের স্বভাব গোপন রাখতে পারে না দু'দিনের বেশি।

ব্রজবিলাসের কৃতিত্ব-কথা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র, শুধু আলিবাবার কোন্ বিশেষ কাজটি করতে গাধারা অস্বীকার করেছিল সেটি ব্রজবিলাসও জানে না, পৃথিবীর লোকেও জানতে পারল না।

(১৯৪৯)

কাউকে ব'লো না

কিছুদিন পূর্বে একখানা কাগজে একটি গল্প লিখেছিলাম। তাতে একটি মন্তব্য করেছিলাম এই যে, ভূত গল্প লিখতে পারে না। সেই গল্প পড়ে এক মহিলা তার প্রতিবাদে জানিয়েছিলেন,—ওটি আপনার ভুল, কারণ ভূত সবই পারে।

কথাটা তখন অবশ্য হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ আমাকেই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। কারণ আমি এখন আর জীবিত নেই। তবে ভয় নেই, ভূত কি ক'রে গল্প লেখে তা প্রমাণ করতে যাচ্ছি না, কি ক'রে ভূত হয়েছি সেটাই আমার বলবার বিষয়।

স্বাস্থ্য আমার বাল্যকাল থেকেই খারাপ। বহুকাল ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি—বহুকাল মানে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে। কত ওষুধ যে খেয়েছি! আগেকার দিনে কুইনিন যে ম্যালেরিয়ার ওষুধ তা জানা সত্ত্বেও কুইনিন কতদিন কি পরিমাণ খেতে হবে, কোনো ডাক্তারের কাছে তার ঠিকমতো নির্দেশ পাওয়া যায় নি। সেজন্য বার বার জ্বরে ভুগেছি এবং ক্রমে তার আনুষঙ্গিক অনেক রকম উপসর্গ এসে জুটেছে। বিচিত্র রকম ওষুধ আমি খেয়েছি—পেটেণ্ট ওষুধ, কবিরাজী ওষুধ, হোমিওপ্যাথি। তারপর অনেকদিন কলকাতা-বাসের ফলেই হোক বা বহুদিনের ওষুধের যোগফলেই হোক, ম্যালেরিয়াতে আর ভুগি নি, কিন্তু পাকস্থলীটি স্থায়ীভাবে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি ঠাণ্ডা লাগা নামক ব্যাধিটি আমাকে এমন কঠিনভাবে চেপে ধরল যে, এটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক ব'লে বোধ হ'ল। লুচি মাংস ঘি পোলাও প্রভৃতির পরিবর্তে বার্লি বা সাদাসিদে ভাত মাছের ঝোল খেয়ে বাঁচা যায়, কিন্তু মাসে একবার ক'রে সর্দি-জ্বরের আক্রমণ হ'লে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে পড়তে হয়। হয়েছিলামও তাই। চাকরি ক'রে খেতাম, তাই অসুখ বহন ক'রেই কাজ করতে হত। শেষে এমন হল যে কোনো দিকই আর রক্ষা করতে পারি না। ফলে যা অনেক আগে করা উচিত ছিল তাই শেষ অবস্থায় করলাম। অর্থাৎ দীর্ঘ দিনের জন্য বিনা বেতনে ছুটি নিয়ে হাওয়া পরিবর্তনে গেলাম।

গেলাম ভাল জায়গাতেই। এবং এটাই যে বাঁচবার একমাত্র উপায় এ বিষয়েও সন্দেহ ছিল না। বহুদিন এক জায়গায় থাকলে কতকগুলো অসুখ স্থায়ী হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কোনো ওষুধের সাধ্য নেই যে সে সব অসুখ সারায়। সর্দি তার মধ্যে একটি। যে-কোনো তুচ্ছ উপলক্ষে সর্দির আক্রমণ চলতে থাকে।

স্থানত্যাগ না করলে ভাল হবার কোনো আশা থাকে না এবং করলে ভাল হবার নিশ্চিত আশা থাকে।

যে জায়গায় গেলাম তার নামটি নানা কারণে গোপন রাখতে হল। এবং সেখানে যাঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল, তাঁদেরও নাম গোপন রেখে এই কাহিনী বলছি। কারণ তাঁরা এখনও জীবিত আছেন। আমি চাই না যে তাঁদের কোনো অনিষ্ট হোক। তাঁরা প্রত্যেকে ভাল মানুষ, তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কোনো হিংসাও নেই, তাঁদের ঘাড় মটকাবারও আমার কোনো মতলব নেই।

বাঙালী-অধ্যুষিত পশ্চিমদেশের ছোট শহর, স্বাস্থ্যের পক্ষে মনোরম স্থান। সেখানে আমি নবাগত। সেইজন্য প্রাথমিক একাকিত্ব কষ্টদায়ক হ'লেও তিনচার দিনের মধ্যেই অনুভব করতে পারলাম যে আমার স্বাস্থ্য উন্নতির পথে নিশ্চিত যাত্রা করেছে। স্বাস্থ্য আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য একই আছে, কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে অভিনব সঞ্জীবতার হাওয়া বইতে শুরু করল। কিন্তু সে যে কি তা বুঝিয়ে বলা যায় না।

তিনচার দিন পরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তিনি কাছাকাছি থাকেন, বেশ সদাশয় লোক, প্রবীণ এবং বিজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন ধরে কত আলাপ হ'ল। আমার অসুখের সমস্ত ইতিহাস তাঁকে শোনালাম। তিনি বললেন, "খুব ভাল করেছেন এখানে এসে। অতি চমৎকার জায়গা এটি। তিনমাসে আপনি নতুন মানুষ হয়ে ফিরে যেতে পারবেন। তবে একটি উপদেশ আপনাকে দিচ্ছি"—বলেই খুব গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে প্রায় কানের কাছে মুখ এনে একটি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন।

আমি তো শুনে অবাক। এটি কি ক'রে সম্ভব—ভাবতে লাগলাম। কিন্তু তাঁকে তখন কিছু বলতে পারলাম না।

মহেন্দ্রবাবু তাঁর নাম, তিনি চলে গেলে, তাঁর কথাটা বিবেচনা করে দেখতে লাগলাম। তিনি বলেছেন, "আপনার অসুখের কথা আমি যা শুনলাম তাতে আপনার ক্ষতি হবে না, কিন্তু আর কাউকে বলবেন না।"

এ কথার অর্থ কি? তবে কি আমার অসুখের ইতিহাস শুনে তিনি বিরক্ত হয়েছেন? তিনি কি ভেবেছেন আমি শুধু নিজের কথাই বলতে ভালবাসি? অর্থাৎ আমি আত্মসর্বস্ব? আত্মকেন্দ্রিক? আত্মপ্রেমিক?

কিন্তু তা তো নয়। আমি এখানে নবাগত, অসুস্থ অবস্থায় এসেছি, যিনিই আসবেন আলাপ করতে তিনি নিজেই হয়তো আমার অসুখের কথা তুলবেন। তা ভিন্ন আলাপ চলবেই বা আর কি নিয়ে? আমার ব্যাধির ইতিহাস ভয়ানক

ইণ্টারেষ্টিং, অপরের পক্ষে শিক্ষাপ্রদও বটে। তা ছাড়া এখানে আমার জমিদারি নেই যে জমি সংক্রান্ত আলাপ করব। স্বাস্থ্যলাভের জন্য এসেছি, আলাপটাও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব বৃথা হল মহেন্দ্রবাবুর উপদেশ।

কিন্তু হায়, যদি ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি এতটুকুও থাকত!

এর পর যাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল তিনি রামবাবু। তিনি আমার সব কথা আগাগোড়া মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন, "কুইনাইনের ক্রিয়া। সমস্ত ব্যাধি আপনার ঐ কুইনাইন আটকে রেখেছে। জানেন না কি সাংঘাতিক চীজ ঐ কুইনাইন।"

"বলেন কি!"

"হাঁ, ঠিকই বলছি।"

আমি অসুখে ভুগে ভুগে অসুখ এবং ওষুধ সম্পর্কে মোটামুটি একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলাম। আমাব অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সেজন্য আমাকে রুগী না বলে হাফ ডাক্তার ব'লে ডাকত। সুতরাং কুইনিন আমার সকল ব্যাধির মূলে—এ কথাটায় শুধু ভদ্রতার খাতিরেই সায় দিয়ে গেলাম, মন থেকে নয়।

রামবাবু বললেন, "ভয় নেই।" বলে চলে গেলেন।

পরদিন সকালেই দেখি তিনি এক ঝাঁকা গাছগাছড়া এনে হাজির। বললেন, "উনুন কোথায়?" তারপর চাকরের সাহায্যে ঘণ্টাদুই পরিশ্রমের পর তিনি আমাকে এক বাটি 'সুধা' খাইয়ে দিলেন। বললেন, "এ এক অদ্ভুত পাঁচন, এর এমন জোরালো শক্তি যে চব্বিশ ঘণ্টার আগে দ্বিতীয় মাত্রা খাওয়া নিষেধ। এর মধ্যে যদি বুকে কান পাতেন, তা হ'লে শুনতে পাবেন আপনার দেহের বিশ বছরের জমা কুইনাইন বাপ্ বাপ্ ক'রে চীৎকার করছে। আমি আবার কালই আসব।"—

অভিভাবকের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেই তিনি বিদায় নিলেন। বিষাক্তস্বাদে ভরে রইল আমার মুখ।

অতঃপর আলাপ হ'ল শ্যামবাবুর সঙ্গে। তিনি এসে অসুখের কথা সব শুনলেন এবং বললেম, "মানুষের দুঃখ ভোগ কপালে লেখা থাকে। ভোগান্ত ঘটে ঠিক সময়টি এলে। তার আগে কেউ কিছু করতে পারে না। দেখুন না কেন, আপনি যে এতকাল ভুগলেন, কারো সাধ্য ছিল আপনাকে সারানো? ছিল না। এই যে আপনি এতকাল পরে হঠাৎ এখানে এলেন, এর কোনো কারণ

আপনি অনুমান করতে পারেন? পারেন না। এর কারণ হচ্ছে আপনার ভোগান্তের ঠিক সময়টি এসে গেছে। দৈব যোগাযোগ। হেঁয়ালি মনে হচ্ছে? হবেই তো। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চাইবেন না। পারবেন না। আজ সন্ধ্যায় বুঝিয়ে দেব।"

সেইদিন সন্ধ্যায় তিনি এসেই ইষ্টনাম জপ করতে করতে আমার কোমরে এক মাদুলি বেঁধে দিলেন। বললেন, "মাত্র এক মাস। বাস্। ইচ্ছে করলে দিন পনেরো পরেও বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। রেলগাড়ি ফেলে পায়ে হেঁটে যেতে ইচ্ছে হবে। লাফাতে ইচ্ছে হবে। দৌড়ঝাঁপ করতে ইচ্ছে হবে। কুলকুণ্ডলিনী ক্ষেপে উঠবে। বেশি কিছু বলতে চাই না। এক মাস পরে এসে আপনাকে মুক্ত ক'রে দেব। তবে সাবধান, মাদুলি বেশিক্ষণ জলে ডুবিয়ে রাখবেন না।"

শ্যামবাবু বিদায় নিলেন।

আমার তৃতীয় বন্ধু হরিবাবু। সান্ধ্যভ্রমণের সময় পথে তাঁর সঙ্গে আলাপ। তিনি খপ ক'রে আমার হাত ধ'রে নাড়ী পরীক্ষা ক'রে বললেন, "কফ প্রবল। আপনি ভুল চিকিৎসায় এতদিন কষ্ট পেয়েছেন। প্রতিকার অতি পুরনো, কিন্তু প্রয়োগ নতুন। অর্থাৎ গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখতে হবে দৈনিক বারো ঘণ্টা। আর কিছুই করতে হবে না। ভাবছেন এ তো সাধারণ ব্যাপার, সবাই জানে। আমি গোড়াতেই সে কথা বলেছি। কিন্তু বারো ঘণ্টা দৈনিক পা ডুবিয়েছেন কখনো? এটি আমার আবিষ্কার।"

আমি বললাম, "আমার কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে যে।" বলার সঙ্গে সঙ্গে হরিবাবু বললেন, "সে কথা কি আর আমি ভাবি নি? একা থাকেন চাকরের আশ্রয়ে। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।"

তিনি নিজের চাকর পাঠিয়ে ব্যবস্থা ক'রে দিলেন পরদিনই। চাকরটি বিশালকায়। কথা কম বলে। সে নিজে চারটি মাটির হাঁড়ি এনে নিজ হাতে আমার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করল।

চতুর্থ বন্ধু যদুবাবু। তিনি বাড়িতে এসে আলাপ করলেন। আমার কথা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে ছোট্ট শহরটিতে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এঁরা আসছেন।

যদুবাবু বললেন, "জলই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ঠিক ওভাবে নয়।" হাঁড়িতে নিমজ্জিত আমার দুখানা পায়ের দিকে চেয়ে তিনি কথাটি বললেন।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম তাঁর দিকে।

যদুবাবু বললেন, "পেটটি ঠাণ্ডাজলে ডুবিয়ে রাখতে হবে প্রত্যহ একবেলা।"

বললাম, "এঁরা যে এই সব ব্যবস্থা আগেই করেছেন!"

যদুবাবু বললেন, "ক্ষতি হবে না। আমি টব পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ব্যবস্থা হ'ল, আমি টবে কোমর ও পেট ডুবিয়ে বসে থাকব, পা থাকবে গরম জলে। এই অবস্থায় রামবাবু এসে পাঁচন খাওয়াবেন। মাদুলি নিয়ে মুশকিল হ'ল। বেশিক্ষণ জলে রাখা নিষেধ। ওটাকে মাথায় বেঁধে নিলাম।

তিনদিন এইভাবে কাটাবার পর আমার প্রথম সন্দেহ হ'ল কাজটা ঠিক করছি কি? সন্দেহ ক্রমে প্রবল হ'তে প্রবলতর হ'তে লাগল। রাম, শ্যাম, যদু, হরি হয়েছে, এর পর মধু আসবেন,—তার পর……না, আর ভাবা যায় না। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙেছিল, দুশ্চিন্তায় আর ঘুম হ'ল না। ভাবলাম সমস্তটা দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে হয়তো এঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। মহেন্দ্রবাবু বাইরে গেছেন, নইলে তাঁর কাছে গিয়েও সদুপদেশ নেওয়া যেত। তাঁর সাবধান-বাণীর মর্ম এইবারে আমার মর্মে প্রবেশ করল।

আমি সত্যিই সেদিন সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে গেলাম, এবং দৈহিক কষ্ট অগ্রাহ্য ক'রেও বেশ একটু দূরে ছোট্ট পাহাড়ের কোলে একটা গাছের নিচে গিয়ে সটান শুয়ে পড়লাম। হেঁটে যতটা ক্লান্তি হয়েছিল, মৃদু শীতল বাতাসে তা মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। ভাবলাম, ঘণ্টাদুই এইখানে পড়ে থেকে উঠে যাব এবং সুযোগ পেলেই আবার চ'লে আসব। শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল, এইভাবে যদি শহরের প্রত্যেকটি লোক আমার চিকিৎসা শুরু করে, তা হ'লে আমি যে উদ্দেশ্যে এসেছিলাম তা আর সিদ্ধ হবে না। অসুখের কথা অন্যকে বললেই সে তৎক্ষণাৎ অব্যর্থ ওষুধের কথা বলে বটে, কিন্তু তা যে এমন হাতে-কলমে কেউ করবে তা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল।

ভাবতে ভাবতে ক্লান্তিবশত একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জেগে উঠে দেখলাম, ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেছে। কিন্তু সামনে চেয়ে দেখি দূরে মনুষ্যমূর্তি। চিনতে দেরি হ'ল না, বিশালকায় সেই চাকরটা। একটু সরে ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিলাম। ভিতর থেকে আমি সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম, সে এদিক ওদিক চেয়ে অন্য পথ ধ'রে চ'লে গেল। তখন আমি ধীরে-ধীরে বেরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। বেশ কৌতুক বোধ করছিলাম এই রকম লুকোচুরি খেলে। কিন্তু হঠাৎ পিছনে চেয়ে দেখি বহু লোক আমাকে অনুসরণ করছে। দূরে থাকায় সবাইকে চিনতে পারলাম না, কিন্তু অনুমান

করলাম ওই দলে রাম শ্যাম যদু হরি ইত্যাদি তো আছেনই, তা ছাড়া আরো অনেকে আছেন।

কোথা থেকে পায়ে জোর ফিরে এলো, আমি ছুটতে লাগলাম, ছুটতে ছুটতে পিছনে চেয়ে দেখি তাঁরাও ছুটছেন।

আমি তখন মরীয়া। একবার বাড়ি পৌঁছতে পারলে দরজায় খিল আঁটব, তাতে যত অভদ্রতা হয় হোক।

দু মাইল পথ ছুটে আসা সুস্থ মানুষের পক্ষেও কষ্টকর, কিন্তু আমি তখন আসন্ন বিপদে কাণ্ডজ্ঞানহীন। তাই বাড়ির সীমানায় পৌঁছেই প্রায় চেতনাহীন অবস্থায় ভূমিতে লুটিয়ে পড়লাম, ওঠবার ক্ষমতাও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না।

হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো যেন। একটু একটু অনুভব করছিলাম, আমাকে কে ধ'রে জলের টবের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছে, পা দুখানা গরম জলের হাঁড়ির মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে, এবং মুখের মধ্যে পাঁচন ঢালছে।

সেই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও মনে হ'ল যেন ক্ষীণ কণ্ঠে কে কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করছেন, "আপনি কি অসুখের কথা সবাইকে বলেছিলেন ?"

স্বপ্নঘোরেই বুঝতে পারছিলাম, ইনি মহেন্দ্রবাবু, বোধ হয় বাইরে থেকে ফিরে এসেছেন। আমি ঠোঁট নেড়ে মহা অপরাধীর মতো বলতে চেষ্টা করলাম, ব—লে—ছি—লা—ম।

এর পরেই আমি সম্পূর্ণ চেতনাহীন। এবং কিছুক্ষণ পরেই সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি উক্ত টবের মধ্যেই দেহ রেখেছি।

এই কাহিনী লিখছি এর কদিন পরেই।

(১৯৫২)

বুমেরাং

১

একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের—ছোটবেলা থেকেই।

আমার নিজের কথাই বলছি।

মেয়েরা যাকে শুচিবাই বলে, আমার মধ্যে সেই একই বাই বা বাতিক বা বায়ু ক্রিয়া করছে কি না বলতে পারি না। তবে পথে-ঘাটে পা ফেলতে ভয় হয়, মন যে তাতে অশুচি হয়ে ওঠে এতে আর সন্দেহ নেই। শহরটাও হয়েছে ঠিক তেমনি নোংরা।

সরকারী বড় কাজ করতাম ইংরেজের আমলে। সাহেবি পালিশ এবং পরিচ্ছন্নতাবোধ সেজন্য আরও বেড়ে থাকবে।

পথে-ঘাটে দম আটকানো দুর্গন্ধ আর নোংরা জঞ্জাল। গাড়িতে বন্ধ হয়ে চলা ভিন্ন উপায় ছিল না। নাগরিকতাবোধের অভাবে শহুরে লোকদের দু'চোক্ষে দেখতে পারতাম না। শহুরে শিক্ষা নেই অথচ শহরে থাকবে। বোধও নেই, লজ্জাও নেই। সমস্ত লজ্জা যেন আমার।

এই সব লোকদের নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি একেবারে স্বভাবসিদ্ধ, যেন সহজাত সংস্কার। ঘর বার তাদের একাকার। দুর্গন্ধ পচা জঞ্জাল পথে পথে, ওরই মধ্যে অগুণতি নোংরা উলঙ্গ ছেলে খেলা করে, ঘেয়ো রুগ্ন কুকুরদের সমশ্রেণী হয়ে।

মাঝে মাঝে ভেবেছি পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকব, সে অনেক ভাল। প্রকৃতির আপন ধূলোমাটি অনেক স্বাস্থ্যকর।

এক এক দিন দুর্গন্ধের জ্বালা সয়ে ঘরে ফিরে মনে হয়েছে রিটায়ার ক'রে ইউরোপে গিয়ে থাকব। মাঝে মাঝে গোপনে এমন ইচ্ছাও হয়েছে ইংরেজরা আবার আসুক, এসে দলে দলে সকল পাড়ায় বাস করুক, শহর ছেয়ে ফেলুক।

কিন্তু এসব শূন্য কল্পনা, যাকে ওরা বলে মুনশাইন। বাস্তব ক্ষেত্রে একখানা মাঝারি গাড়ি পালন করি কোনোমতে, অবস্থা ঠিক প্রিন্সের মতো নয়। অসুবিধা হচ্ছে ঐখানে। বাস্তবে সাব-ডেপুটি, কল্পনায় আগা খাঁ।

সাহেব পাড়াতেই এলাম শেষটায়। দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে, আমিও রিটায়ার করেছি। কাজেই দেখার অবসর থাকলেও সাহেব বড় কম দেখি। কদাচিৎ দু'একটা সাহেব মেম, যেন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দোকানের পুডিং মারা পালিশ

ফিরছিলাম ঘণ্টাখানেক পরে। বন্ধুর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি। দীর্ঘ মেয়াদী অসুখ, অনিশ্চিত গতি, কতদিন চলবে কে জানে।

ফেরবার সময় ভিখারীর কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া ভেবেছিলাম এতক্ষণ সে নিশ্চয় ওখানে নেই। কিন্তু আমার অনুমান সত্য নয়। সে ওখানে একই ভাবে বসে তার কাজ করছে। এখনো সেইভাবেই খাবারের একটি কণার সন্ধানে জঞ্জাল উল্টে পাল্টে দেখছে। তার অস্তিত্ব আমাকে আচমকা আঘাত করল।

এবারে কর্তব্য স্থির ক'রে ফেললাম। তার কাছে যেতে আর কোন বাধা ছিল না। কাছে গিয়ে পকেট থেকে দুটি টাকা বের ক'রে সামনে ছুঁড়ে দিলাম। আমার হিসাব মতো দিনপনেরো খরচ ক'রে খেতে পারবে সে এই টাকায়। তার পক্ষে দৈনিক দু'আনা—তার স্বপ্নেরও অগোচর।

টাকা দুটি তার কাছে প'ড়ে ঝনঝন ক'রে উঠল। অপ্রত্যাশিত শব্দে সে সেদিকে চেয়ে আমার দিকে চোখ ফেরাল।—সে চোখে কৃতজ্ঞতার কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

কয়েক সেকেণ্ড আমার আত্মতৃপ্ত মুখের দিকে চেয়ে দু'টি টাকা হাতে তুলে নিল এবং পর মুহূর্তেই তা আমার দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দিল—ঠিক আমি যেমন তার দিকে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। তারপর সে নিজের কাজে মন দিল, যেন কিছুই হয়নি।

ইতিমধ্যে চারদিক থেকে কতকগুলো নোংরা উলঙ্গ ছেলে কোথা থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই টাকার উপর, তারপর কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল তা, তা ভাববার সময় বা মন ছিল না আমার।

আমি নির্বোধ নই, লোকচরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও কিঞ্চিৎ আছে বলে মনে করেছিলাম, কিন্তু আধুনিক কালকে আমি বুঝি না। অনেক ব্যাপারে এই আধুনিক কালের হাতে ধাক্কা খেয়েছি, আধুনিক ভিখারীর কাছে এই প্রথম।

মাথাটা নিচু হয়ে গেল আপনা থেকেই, কিন্তু চুপচাপ পরাজয় স্বীকার ক'রে নেওয়া বড় কঠিন, সত্যিই কঠিন,—বিশেষ করে একপাল হাঁ-করা লোকের সামনে।

মনে হিংসা জাগল কিছু। তেজের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে তাকে বললাম—"এর মানে কি? তোমাকে দয়া করতে গেলাম, আর তুমি এত বড় নবাব যে সে দয়া নিলে না।"

করুণভাবে আমার দিকে চেয়ে সে বলল, "ভিক্ষে তো আমি চাইনি বাবু।"

"চাওনি। হ্যাঁ, ঠিক কথা, চাওনি। কিন্তু দিলাম যখন, তখন না নেওয়ার কি মানে থাকতে পারে? আত্মসম্মান বুঝি?"

ব্যাপার দেখে ভিড় আরও বাড়ল। হাঁ-করা লোকগুলোর হাঁ-আরও বিস্তৃত হ'ল, তারাও আমার পক্ষ নিয়ে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী রসিকতা করতে লাগল। আমি আজ এই ইতরদের সগোত্র একথা ভেবে মন খুশি হল না।

ভিখারী খুব দুর্বল কণ্ঠেই কথার উত্তর দিল—বলল, "আত্মসম্মান নয় বাবু, ধর্ম। দুটো টাকা দিয়ে আমার ধর্মে হাত দেন কোন্ বিবেচনায়? আপনি আমার লোকসান ঘটাবেন কেন—আপনি যান—নিজের কাজে যান।"

ভিখারী নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় তার কাজে মন দিল।

মাথা নিচু ক'রে গাড়িতে এসে উঠলাম, সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপছিল, ভয় হল—দুর্ঘটনা না ঘটাই। নোংরা হাতের খোঁচা, নিজেকে ধিক্কার দেওয়া ভিন্ন উপায় কি? কি দরকার ছিল?—আমি যা দিলাম, তাই দিয়েই আমাকে মারল?...

২

বন্ধুর বাড়িতে যাবার পথটা বদলে ফেলেছি, অনেকটা ঘোরা পথে যাচ্ছি এখন। হরলাল যমের দুয়ার পর্যন্ত গিয়েছিল, এখন ফিরছে, কিন্তু ভয় সম্পূর্ণ কাটেনি, সুস্থ হতে অনেক দিন লাগবে। এখন আর প্রতিদিন যাই না সেখানে, মাঝে মাঝে যাই এবং বাড়ি থেকেই প্রতিদিন খোঁজ-খবর নিই।

ভিখারীর খোঁচার ঘা অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, মনটাও প্রসন্ন আছে।

এর দিন পনেরো পরের ঘটনা। বন্ধুকে উৎসাহজনক সাহচর্য দান ক'রে সেদিন দোতলা থেকে নিচে নেমে ফটকের কাছে এসেছি, এমন সময় দেখি সেই ভিখারীটা ধীর পদে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে প্রায় আমার সামনে দিয়েই। এমন দুর্বল যে মনে হয় এখুনি পড়ে যাব। হঠাৎ সুবুদ্ধির উদয় হল, চকিতে মনে হল, ওর কি দোষ। ওর কি অভিমান থাকতে নেই। অভিমান শুধু আমারই থাকবে যেহেতু আমি ভদ্রলোক, আমি ভিক্ষা করি না?

আসলে মনের মধ্যে একটা পরাজয়ের গ্লানি তখনও বহন করছি, নিজের কাছে স্বীকার করি আর নাই করি। যেখানে ঝগড়া ক'রে জেতা যায় না, সেখানে ভাল·লোক সেজেও জয়লাভ করতে ইচ্ছা হয়, নইলে সুখ পাওয়া যায় না। মন থেকেই এটা চায়, এটা মনেরই ধর্ম।

তাই তখনই মন তার ভোল বদলে ফেলল, একটা ভিখারীকে প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া ক'রে আজীবন ছোট হয়ে থেকে লাভ কি। বিদ্যুৎগতিতে এই চিন্তাগুলো মনের ভিতর খেলে গেল, আমি ভিখারীটাকে ডাকলাম।

আশ্চর্য হলাম, ডাকে সাড়া দিল সে, ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো গেটের ভিতর।—বললাম, "বস।"

অবিলম্বে বসে পড়ল, এত দুর্বল, না বসে উপায়ও ছিল না।

বসেও হাঁপাতে লাগল। বুঝলাম এবারে সে পরাজয় স্বীকার করতেই এসেছে।

বললাম, "কিছু খেতে দিই, কেমন ? নইলে চলতে পারবে না।"

"না বাবু, এক গেলাস জল দিন, আর কিছু না।"

এখনও তেজ। আবার সেই ধর্মের ব্যাপারই নাকি ? ভিখারীর ধর্ম ! বুঝলাম কিছু সময় লাগবে। প্রথমে মচকাবে, তার পর ভাঙবে।

কিছু আর বললাম না, ভিতরে গিয়ে বন্ধুর ভৃত্যকে জল এবং তার সঙ্গে তার পথ্য থেকে কিছু গ্লুকোস মিশিয়ে আনতে নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলাম। আমাকে যে ও চিনতে পারেনি এইটে ভেবে আরাম বোধ করছিলাম।

এমন সময় সেই প্রচার ভ্যান কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে চিৎকার ক'রে উঠল—"পচা, বাসী খাবার খাবেন না"—ইত্যাদি। যেন চৌকিদার অসতর্ক গৃহস্থকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বেড়াচ্ছে।

ভিখারী ক্ষীণ কণ্ঠে আমাকে বলল—"ওরা সব পাগল, ওদের কথা শুনলেই হাসি পায় আমার।"

ভিখারীর হাসি পায় বৈজ্ঞানিক রীতির স্বাস্থ্যতত্ত্ব শুনে। পাবেই তো, কিন্তু সে কথাটি বলতে ওর আটকাল না ? লোকটি দাম্ভিক, বেশ একটু বেশি মাত্রায়ই দাম্ভিক। কিন্তু কেন ?

বিরক্তভাবেই বললাম, "এই অজ্ঞ অশিক্ষিত দেশে এর দরকার আছে বৈ কি। বাসী পচা খাবার খাওয়া যে কত অন্যায় তা ক'জন জানে এদেশে ? যেটুকু খায় তাও বৈজ্ঞানিক রীতিতে বাছাই ক'রে ব্যালান্সড্ ডায়েট—মানে—সোজা কথায় কি বলি ?—মানে দেহ পুষ্টির জন্য যা যা দরকার তা হিসেব ক'রে খায় না।"

দুর্গন্ধ জামাপরা নোংরা একটা ভিখারীকে আমি এসব বলছি নিতান্ত অমায়িকভাবে—কেননা ওকে পরাজিত করা দরকার যেমনভাবেই হোক। কিন্তু ওর দুর্বলতম জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছিনা এখনও, তীর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হচ্ছে বারবার।

এমন সময় ভৃত্য জল নিয়ে এলো। ভিখারী ঢক ঢক ক'রে খেয়ে ফেলল এক গেলাস গ্লুকোসের জল। তারপরেই বিনা ধন্যবাদে বলল, "এবারে উঠি।" বলতে বলতে অকৃতজ্ঞ ভিখারীটা উঠেই পড়ল। আমি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলাম।

কিন্তু ওর উঠে পড়েও যাওয়া হ'ল না। হঠাৎ ঐ দুর্বল শরীরে উঠে মাথা ঘুরে গেছে। মনের ঔদ্ধত্য কি দেহ সব সময়ে মেনে নিতে পারে? আমার কিন্তু বেশ একটু উৎসাহ জাগল আবার। এসব লক্ষণ ওর পরাজয়েরই কি ইঙ্গিত নয়?

ও বসে পড়ল এক পা এগোতেই। আমি ভৃত্যকে ইসারা করলাম ঐ জল আরও আনতে। আরও দিলাম তাকে গ্লুকোসের জল। খেল আরও। এবারে আর উঠতে চাইল না। আমি বললাম, "ভাল ক'রে না জিরিয়ে উঠো না।"

"ভুল করেছিলাম, বাবু। হাঁ, একটু বসতেই হবে, মিনিট দশেক বসলেই ঠিক হয়ে যাবে। গ্লুকোস দিয়ে ভালই করেছেন, জোর ঠিক পাব।"

এবারে আমার মাথা ঘোরার পালা। মাথা সত্যিই ঘুরে উঠল আমার। চার দিকে সব বন্‌বন্‌ ক'রে ঘুরতে লাগল চোখের সামনে। স্তম্ভিতভাবে, অর্থহীনভাবে, চেয়ে রইলাম ভিখারীর দিকে। গ্লুকোসের নাম ও জানল কি ক'রে?

ভিখারী তার ছদ্মবেশ যেন একটানে খুলে ফেলল আমার সামনে। সে আমাকে বলল, "আপনার অবাক হবারই কথা। কিন্তু সে কথা যাক। গ্লুকোসে কিছুক্ষণ জোর পাব ঠিকই, কিন্তু আপনি যে ব্যালান্সড ডায়েটের কথা বলছিলেন, যাতে কার্বো-হাইড্রেট, প্রোটীন, ফ্যাট, ভাইটামিন সব ঠিক ঠিক মাত্রায় আছে, সে ডায়েট পাব কোথায়?"

আমি বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, "তুমি—আপনি—জানেন এ সব?"

"জানি•বই কি। অবাক হচ্ছেন? আর শুধু আমি জানি? ঐ যে যারা পচা ফল কিনে খায়, পচা বাসি খাবার খায়, সেই এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক জানে না? তারাও জানে।"

আমি শরাহতের মতো চেয়ারে এলিয়ে পড়লাম, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ শুনছি শুধু—আর মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে গ্লুকোসের এত শক্তি।

ভিখারী সোজা হয়ে বসল। সে তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। থামল না, বলে চলল—"জানে, সবাই জানে। আপনি আমি যেমন জানি, তারাও

ঠিক তেমনি জানে, হয়তো বিজ্ঞানের ভাষাটা জানে না। কিন্তু কেন খায় তারা এসব পচা বাসী খাদ্য, ভেবে দেখেছেন কখনো?"

আমি সম্পূর্ণ যন্ত্রের মতো, কিছু না ভেবে বললাম, "না।"

জলের গেলাসটা ওর হাতে ধরা ছিল, উত্তেজনায় হাত কাঁপছিল, সে তাড়াতাড়ি আর এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে বলতে লাগল—"আপনি মনে করেন, এই যে দেশের লোকেরা সবাই অখাদ্য গিলছে, তা কি অখাদ্য না জেনে গিলছে? পচাখাদ্য খাচ্ছে সে কি ব্যালান্সড্ ডায়েট ফেলে দিয়ে? আপনারা সবাই দেশের লোককে হাইজীন শেখাতে চান। দেখুন, অজ্ঞতাকে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু বোকার মতো কথা বললে ক্ষমা করা শক্ত।"

আমার মুখ থেকে শুধু অস্পষ্ট স্বরে তোতলার মতো একটি শব্দ বেরুচ্ছে—"আপনি—আপনি"—

"আমি? আমি শুধু অনেস্ট থাকার চেষ্টা করেছিলাম। চাকরি করেছি এককালে, হাইজীন শেখানোরই চাকরি, মশাই। তারপর বয়স হ'ল, অবসর নিতে হ'ল, তারপর আর পেটের ভাত জোটাতে পারিনি। হাইজীন প্রচারের মহিমা উপলব্ধি করেছি অবশ্য। কিন্তু কি হবে শুনে এসব। শোনবার মতো নয় এসব কথা। শুধু একটি নীতি ঠিক রেখেছি, ভিক্ষা করিনি, চুরি করিনি, শুধু অনেস্ট থাকার চেষ্টা করেছি। বোকা এবং অনেস্ট বলতে পারেন। বুদ্ধিমান হতে পারতাম, ভিক্ষা অথবা চুরি করলে। করিনি, তাই তার একমাত্র বিকল্প রেফিউজ বিন থেকে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাওয়া, তাই খাচ্ছি।"

প্রথম ধাক্কায় চিন্তা অসাড় হয়ে পড়েছিল, সেটা কাটতে এতক্ষণ লাগল। না, গ্লুকোসের শক্তি এ নয়। আমি বার বার ভুল করেছি, আর নয়। দাঁড়িয়ে উঠে ভিখারীর হাত ধ'রে বললাম, "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি কে, আমি জানি না, যদি কিছু মনে না করেন, আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে চলুন—সেখানে আপনি থাকবেন আমাদেরই একজনের মতো, যত্নের ত্রুটি হবে না, বড় ভাইয়ের সম্মান দেব আপনাকে।"

আমার বহুদিনের জমাট বাঁধা হৃদয় যেন গ'লে গিয়েছিল সে সময়, তাই ভাষায় মাত্রাজ্ঞান ছিল না।

ভিখারী একটুখানি চিন্তা ক'রে বলল, "অনুগ্রহের অন্ন? সে আর হয় না, ভাই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমার স্বাধীনতা থেকে আমাকে আর জেলে পুরবেন না। অনেক দুঃখ সয়ে এই খাওয়া অভ্যাস করেছি। আমারই

সমতলে নেমে এসে যারা আমারই সঙ্গে আমার মতোই খায়, আমার সেই ভাইদের ছেড়ে উপরে উঠলে শান্তি পাব না মনে মনে। তারাও অনেস্ট।… আপনার দয়া আমার মনে থাকবে—"

ভিখারী ধীর পায়ে চলে গেল, আর ফিরেও তাকাল না। কিন্তু আর তাকে ভিখারী বলছি কেন।

তাকে প্রথমে মচকাব এবং পরে ভাঙব এই ছিল আশা। হ'ল না।

আমিই প্রথম মচ্‌কেছি।

তারপর সম্পূর্ণ ভেঙেছি।

কারণ বাড়ি ফিরে গিয়ে ভেবে আবিষ্কার করলাম—এবারেও, আমি ওকে যা দিতে গিয়েছিলাম, তাই ছুঁড়েই আমাকে মেরেছে।

(১৯৫৩)

দান-প্রতিদান

১

ছেলেটি জলে পড়তেই একটা সোরগোল উঠল, সবাই তীরে দাঁড়িয়ে হৈ হৈ এবং হায় হায় করতে লাগল।

আমি মাধব চক্রবর্তী দৈনন্দিন সান্ধ্যভ্রমণ করতাম হেদুয়ার পুকুর বেষ্টনীতে। তখন ছাত্র ছিলাম, পড়া শোনার মনোযোগ ছিল বেশি, খেলা ইত্যাদি দেখে নষ্ট করবার মতো সময় পেতাম না, প্রবৃত্তিও হ'ত না। আমার পক্ষে সে জন্যে বাসস্থানের নিকটস্থ হেদুয়া পুকুরে সন্ধ্যাবেলা তিনটি বা চারটি চক্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যরক্ষা করা ভিন্ন গতি ছিল না।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন কলকাতার পথঘাট অথবা হেদুয়া গোলদীঘি অপেক্ষাকৃত জনবিরল ছিল। বেড়াতে আসত অনেকেই, কিন্তু তাদের সংখ্যা গোনা যেত।

পরে আমার অনেকবার মনে হয়েছে—সেদিন দৈবাৎ যদি ঐ দুর্ঘটনার কাছে আমি উপস্থিত না থাকতাম, তা হ'লে ছেলেটির জীবন রক্ষা হ'ত কি না সন্দেহ। তার পিতা হরেন্দ্রকুমারের সঙ্গেও যে একটা সম্পর্ক গ'ড়ে উঠত না, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

জলে ঝাঁপিয়ে পড়া আমার পক্ষে সহজ ছিল। বাল্যকালে পদ্মা নদীতে সাঁতার শিখেছি, এবং ঘণ্টাখানেক সাঁতার না কেটে কোনো দিনই স্নানপর্ব শেষ করিনি।

ছেলেটির বয়স বারো তেরো হবে। সঙ্গে ভৃত্য ছিল। হঠাৎ কি ক'রে জলে প'ড়ে গেল, তা দেখি নি। যখন চীৎকার-রতদের ভিড় ঠেলে তাকে উদ্ধার ক'রে উপরে তুললাম, তখন সে প্রায় জ্ঞানহারা। আমি নিজেই তার প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করলাম, এবং একটুক্ষণ পরেই বোঝা গেল সুস্থ হয়ে উঠতে আর দেরি হবে না। ইতিমধ্যে সম্ভবত ভৃত্যের মুখ থেকে খবর পেয়ে ছেলের বাড়ির লোকেরা হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এলেন এবং ছেলের পিতা ছেলেকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে গেলেন একখানা ঘোড়াগাড়ি ডেকে। বাড়ি থেকে নিজের গাড়ি আনতে দেরি হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল, সে কথা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায়। ছেলের মাতা আমাকে নিয়ে

পড়লেন। আমি যে কি উপকার তাঁদের করেছি ইত্যাদি। অবশেষে আমার নাম ও ঠিকানা নিয়ে চ'লে গেলেন।

আমি যথারীতি মেসে গিয়ে ভিজে জামা কাপড় ছেড়ে পড়তে বসলাম। আমার দিক থেকে কোনো মহৎ কাজ করেছি ব'লে মনে কোনো চাঞ্চল্য জাগে নি। আরও কারণ, সামনে বি. এ. পরীক্ষা। আমি স্থির মনেই ত্রিশ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের মেসে দোতলায় ব'সে ট্রামের ঘর্ঘর শব্দের সঙ্গে পড়ার শব্দ মিলিয়ে দিলাম।

পরদিন ছিল রবিবার। সকালেই ছেলের পিতা এসে হাজির। বললেন —তোমাকে একবার, মাধব, আসতেই হবে আমাদের বাড়িতে, আমার স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধ। তিনি নিচে অপেক্ষা করছেন।

পড়াটি বেশ জ'মে উঠেছিল, এমন সময় বাধা। নিচে মহিলা অপেক্ষা করছেন, উঠতেই হ'ল। এসে দেখি গাড়িতে তিনি এবং একটি ছোট ছেলে ব'সে আছে। মুখ সবারই খুশিতে উজ্জ্বল। শুধু ড্রাইভারের পাশে উপবিষ্ট কুকুরটির দৃষ্টিতে কিছু সন্দেহ।

আমি আগেই ভেবে নিয়েছিলাম, উপকার যখন একটু করেছি তার প্রতিদানে রীতিসঙ্গত কিছু লোকাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব না। অর্থাৎ কিছু খেতে হবে এবং গদগদ কৃতজ্ঞতার ধারাবর্ষণ মাথা পেতে নিতে হবে। অতএব আপত্তি জানানো বৃথা।

বাড়িখানা রাজকীয়, বৈঠকখানায় আসবাবপত্র দামী এবং রুচিসঙ্গত। আমার অনুমান মিথ্যা হ'ল না, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চলল সর্বক্ষণ এবং সকালেই যে খাবার আয়োজন হ'ল তাতে সেদিনের মতো আর না খেলেও চলবে এ রকম বোধ হ'ল। কিন্তু এর পরেই এমন একটি প্রস্তাব এলো হরেন্দ্রকুমারের কাছ থেকে যাতে আমি সত্যই বিব্রত বোধ না ক'রে পারলাম না। তিনি আমাকে স্তম্ভিত ক'রে বললেন, "তোমাকে এই মহৎ কাজের জন্যে কিছু পারিতোষিক নিতে হবে·কিন্তু।"

আমার সকল সত্তা এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ ক'রে উঠল। আমি সদ্য এথিক্সের বইখানায় যে অধ্যায়টা পড়ছিলাম, তাতে উদ্দেশ্যহীন, স্বার্থহীন, আনন্দই আমাদের সৎকাজে প্রেরণা দেয় কি না এই আলোচনাটি ছিল। কথাটি ভাল লেগেছিল। তাই আমি কিছু চিন্তা না ক'রেই বললাম, "পারিতোষিকের লোভে আমি এ কাজ করি নি, সামান্য কর্তব্য হিসাবেই করেছি, কিংবা সে সময় কিছুই না ভেবে শুধু অভ্যাসবশত করেছি।"

হরেন্দ্রকুমার একটু হেসে বললেন, "ও নিয়ে নানা তর্ক আছে। একদিকে ইগোয়িষ্টিক হেডোনিজম্—অন্য দিকে ইউনিভার্সালিষ্টিক হেডোনিজম্। কিন্তু এ সবের বাইরেও আর একটা জিনিস আছে, অর্থাৎ কাজের মূলে যাই থাক, ব্যক্তি বা সমাজের কাছ থেকে তার কিছু দাম পাওয়া উচিত, এই কথাটিই আমি মনে করিয়ে দিতে চাই।"

আমার বয়স কম এবং গোঁড়া আদর্শবাদ মাথায়, তাই দাম পাওয়ার কথা শুনে স্বভাবতই নিজেকে বড্ড ছোট মনে হতে লাগল। অথচ মুখের উপর কোনো প্রতিবাদও করতে পারছি না। তা ছাড়া এ বিষয়ে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণাও ছিল না।

হরেন্দ্রকুমার বলতে লাগলেন, "জান, সংসারে প্রেমও নিঃস্বার্থ নয়। তারও দাম দিতে হয়। তোমাদের কবির কথায় পাবে এর উত্তর। দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে যখন তার প্রণয়িনীর মালাখানি চেয়েছিল তখন সে ভাবতে বসল, দিই যদি তো কি দাম দেবে। দাম অবশ্য রাখাল ছেলে দিয়েছিল, কিন্তু মালা পেয়েছিল কি না সে কথা এখানে অবান্তর।" ব'লে তিনি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, "যাই হোক, হাসির কথা নয়, তুমি বেন্থামের লেখা পড়েছ? Defence of Usury? সেও এক মজার নীতি।"—

হরেন্দ্রকুমারের স্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, "ও ছেলেমানুষ, ওর সঙ্গে ওসব কঠিন বিষয়ের আলোচনা করার দরকার কি? তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমাকে, বাবা, তর্ক শুনতে হবে না, তর্ক করতেও হবে না। উনি একটু কিছু দিয়ে নিজে খুশি হ'তে চান। তুমি যেমন একজনের জীবন বাঁচিয়ে খুশি হয়েছ, উনিও তেমনি তোমাকে কিছু উপহার দিয়ে খুশি হবেন, এতে আর আপত্তি করো না, বাবা। আমরা সবাই এতে খুশি হব।"

এই স্নেহ সম্ভাষণে আমার মনটি হঠাৎ খুব নরম হয়ে এলো, সবারই মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এবং মনে হল কুকুরটিও ল্যাজ নাড়ছে একটু একটু।

২

একটি ছেলেকে জল থেকে উদ্ধার করার জন্যে মনে একটা পবিত্র ভাব ছিল অবশ্যই, নইলে তার জন্য মূল্য গ্রহণ ক'রে মনটা এত খারাপ হয়ে গেল কেন? যে মূল্য পেয়েছিলাম তা দিয়ে তখনকার দিনে একটি জমিদারি কেনা যেত, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের মধ্যে একটি খোঁচা অনুভব করতে লাগলাম সর্বদাই।

পাঁচশ টাকার চেক! আমার পক্ষে তখন স্বপ্নের ব্যাপার। কিন্তু মনের কোথাও কি দুর্বলতা ছিল? নইলে সে সময় ওখানা না নিয়ে উঠে এলে কি ক্ষতি হত?

কিন্তু এখন আর ভেবে কি হবে? কারণ ইতিমধ্যে কে যেন এই খবরটি কাগজে বের করে দিয়েছে—"যুবকের সাহস ও কৃতজ্ঞ পিতাব বদান্যতা।" এই নামে খবরটি প্রকাশিত হবামাত্র সামান্য ঘটনাটি অত্যন্ত বড় হয়ে উঠল সবার কাছে। আমার যা ক্ষতি হল তা আব বলবার নয়। পড়াশোনা চুলোয় গেল, একপাল বন্ধু এসে ধরল খাওয়াতে হবে। দেশ থেকে পিতা চলে এলেন ব্যাপার কি জানতে। আরও আত্মীয়স্বজন দুএকজন যাঁরা কাছাকাছি ছিলেন তাঁরাও আমাকে অভিনন্দন জানাতে এলেন। তাঁদেরই মধ্যস্থতায় কোনো বিশ্বস্ত লোকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে চেক জমা দেওয়া হল। ঐ টাকার প্রায় সবটাই আমি দান ক'রে দেব এটি মনে মনে আমি প্রায় স্থির ক'রে ফেলেছিলাম। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে আমার পরীক্ষা প্রস্তুতির উপর যে আক্রমণ শুরু হল তা থেকে বাঁচবার কোনো উপায় আমি ভেবে পেলাম না।

কিন্তু উপায় একটি হল নিতান্তই ভাগ্যবশত। কদিন পরেই একখানা খামের মধ্যে চেকখানা ফিরে এলো ব্যাঙ্ক থেকে—লেখা আছে "রেফার টু ড্রয়ার।"

(১৯৫২)

সত্যই কি প্রয়োজন ?

ফ্ল্যাটে অল্পদিন এসেছি, প্রতিবেশীদের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয় নি ভাল ক'রে। বাধাও আছে কিছু। আমি আবার সহজে কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি না, অসামাজিক দুর্নামটি আমার অনেক দিনের গা সহা!

জানি এ সম্পর্কে অনেক কথা উঠতে পারে। আজকের দিনে এমন আত্মকেন্দ্রিক হওয়া পাপ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কথাটাই আধুনিক কালে খুব সম্মানজনক গুণ নয়। কিন্তু এ সব তর্কের কথা। তর্ক করব না।

তবে একবারে চুপ করে যাওয়াও হয়তো খুব ভাল দেখাবে না, তাই একটিমাত্র কথা বলব।

কথা না বললেই কি পরিচয় হয় না? ফ্ল্যাটে যাঁরা বাস করেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে উপরের বাসিন্দারা কখনো কয়লা ভাঙে, পাশের বাসিন্দারা কখন দেয়ালে পেরেক ঠোকে, নীচের বাসিন্দারা কখন উনুনে ধোঁয়া দেয়, তাদের এই সব ধ্বনিগত একটা পরিচয় আপনা থেকেই পাওয়া যায়, কার সংসার কি রকম চলছে তারও একটা মোটামুটি চেহারা এসবের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠে। এর বেশি আর দরকার কি? অন্তত আমাব কাছে এটাই যথেষ্ট মনে হয়।

দেখে খুশি হলাম যে আমার বিপরীত ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ভদ্রলোকটিও প্রায় আমারই মতো। কয়েকদিন সিঁড়িপথে দেখা হতেই আমি এটি বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। বেশ শ্রদ্ধেয় চেহারা, চুলে পাক ধরেছে, স্বাস্থ্য নিটোল, সাহেবি রং, নাকের ডগা এবং গাল দুটি লাল টক টক করছে, বাঙালীর মধ্যে এ রকম বড় একটা দেখা যায় না।

শিবরামবাবু একা থাকেন, মনে হয় কোনো আত্মীয়বাড়ি বা হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তিনি সংযতবাক এটি আমার কাছে খুবই আরামপ্রদ বোধ হ'ল।

দোতালায় আমার দরজার বাইরে শীতকালে একটুখানি রোদ আসত, সেটি তাঁরও দরজার বাইরে! কিন্তু সে রোদে কাগজ নিয়ে আমিই শুধু বসতাম একা। খবরের কাগজ সম্পর্কে তাঁর কোনো কৌতূহল আমি দেখিনি। ঠিক ভারতীয় অভ্যাসের বিপরীত। কাগজ খুললেই অনাহূত পাঠক ঘাড়ের উপর দিয়ে পড়তে শুরু করে, বড্ড অস্বস্তি লাগে আমার, মনে হয় যেন আমার সঙ্গে আমার থালা থেকে অপরিচিত লোক ভাত খেয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু শিবরামবাবুর চরিত্রের একটি দিক একদিন উদ্ঘাটিত হল একটি ঘটনায়। কাগজের হকার নিচের গলিতে হাঁকছিল—রেলগাড়ি উল্টেছে—বহুত আদমি মারা গেছে—

ঠিক এই মুহূর্তে শিবরামবাবু বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, এসেই আমার হাতে কাগজ দেখে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, রেলদুর্ঘটনা ? কোথায় ?

বললাম দুর্ঘটনার কথা। পঞ্জাব মেল লাইন থেকে পড়ে গেছে।

কথাটা শুনে শিবরামবাবুর চোখমুখ কঠিন হয়ে উঠল। তিনি হাত দুখানা পিছনে ফিরিয়ে মাথাটি নিচু ক'রে একবার ঘরে একবার বাইরে পাইচারী করতে লাগলেন এবং আবার হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কত লোক মারা গেছে ?

আমি কাগজ দেখে হতাহতের সংখ্যা বলতে না বলতেই দেখি তিনি সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছেন নিচে। তারপর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি, তাঁর কোনো আত্মীয় সে গাড়িতে ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করারও আর প্রবৃত্তি হয়নি পরে, কেন না ও নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার সময় ছিল না, ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা।

কিন্তু সেদিন আবার শিবরামবাবুর সঙ্গে দেখা। এক টেলিগ্রাম পিওন নিচে জগদীশ সরকারের নাম হাঁকছিল চীৎকার ক'রে। জগদীশ সরকার তেতলার বাসিন্দা। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ির মেয়েরা টেলিগ্রামখানি নিয়ে তার অর্থ বুঝতে এলো নিচে আমারই কাছে। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম জগবন্ধু নামক কেউ তার পাঠিয়েছে—লিখেছে "পিতার অবস্থা সঙ্কটজনক।"

এমন সময় দেখি শিবরামবাবুর দরজা একটু ফাঁক হয়েছে এবং তার মাথা দেখা যাচ্ছে। মেয়েরা বিমর্ষভাবে চলে গেলে তিনি এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কার অবস্থা সঙ্কটজনক ? বললাম সব। শুনে তাঁর চোখ দুটি ছলছল ক'রে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজায় তালা বন্ধ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—ঠিক কদিন আগে যেমন গিয়েছিলেন।

একটু বিস্ময় লাগল এই ভেবে যে ইতিমধ্যে আমাদের পরস্পরের এই বারান্দাটুকুর উপর আরও অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, কত হৈ হল্লা, কত বাইরের লোকের আসর জমানো, কিন্তু শিবরামবাবুকে কখনো দেখা যায় নি, সেগুলির কেন্দ্রীয় আকর্ষণ অবশ্য নিঃসঙ্গ আমি নই, আমার জনপ্রিয় পুত্র। শিবরামবাবুকে দেখা গেল মাত্র দুটি দিন, এবং দুটি দিনই দুঃসংবাদের আকর্ষণে। এবং দুটি দিনই তিনি অস্থিরভাবে বেরিয়ে গেলেন। স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি দুঃখ সহ্য

করতে পারেন না, তা সে দুঃখ যারই হোক। তাঁর এই ব্যবহার থেকে তাঁর নির্জনবাসের মর্মকথাটিও যেন উপলব্ধি করা গেল।

কিন্তু তবু বাইরে পালিয়ে যাওয়া কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর মিলল না মনে মনে। মাত্র দুটি দিনের ঘটনা থেকে কার্যকারণ সম্বন্ধনির্ণয়ও ঠিক হয় না। একটা কৌতূহল জাগল মনে।

আরও একটা টেলিগ্রাম এলো পরদিন—একই প্রেরক এবং একই নামে। সেটিও আমাকেই ব্যাখ্যা করতে হল, কেননা উদ্দিষ্ট জগদীশ সরকার প্রথম টেলিগ্রাম পেয়েই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

টেলিগ্রামে লেখা ছিল "পিতা শান্তভাবে পরলোক গমন করছেন।"

পড়তে না পড়তে একদিকে যেমন হঠাৎ মেয়েদের কান্নার রোল উঠল, অন্যদিকে তেমনি দরজার আড়াল থেকে চকিতে বেরিয়ে এলো শিবরামবাবুর বেদনাবিদ্ধ মাথাটি। তিনি শঙ্কিত ভাবে বললেন—অ্যাঁ! মারা গেছেন ভদ্রলোক ? আহাহা, কি সাংঘাতিক খবর—এত বড় আঘাত, আহাহা!

বলতে বলতে এবারে কালবিলম্ব না ক'রে ছুটে বেরিয়ে গেলেন, যাবার সময় দরজা বন্ধ করতেও ভুল হয়ে গেল।

আমার কৌতূহল আর বাধা মানল না। দুঃখের খবর আর শিবরাম-বাবুর বহির্গমন, এর মধ্যে নির্ঘাৎ কার্যকারণ যোগ আছে—সন্দেহ রইল না আর।

কিন্তু সেটি কি ? এই প্রশ্নটি হঠাৎ এমন বড় হয়ে দেখা দিল যে আমি নীতিজ্ঞান হারিয়ে তাঁর খোলা দরজার ফাঁকে মাথা গলিয়ে দিলাম। অতঃপর কৌতূহল আমার পা-দুখানা চালিয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। কিন্তু সুবিধা হল না কিছু। ভদ্রলোক পড়াশোনা করেন খুব বোঝা গেল। টেবিলে একখানি বই খোলা পড়ে ছিল—বেন্থামের 'পানিশমেণ্টস্ অ্যাণ্ড রিয়র্ডস'। সম্মুখস্থ দেয়ালে একটি ইংরেজী নীতিবাক্য ঝুলছে—

BEFORE DOING IT ASK YOURSELF :
IS IT REALLY NECESSARY ?

প্রথম দিনের অভিযানে এর বেশি আর কিছু পাওয়া গেল না, অথচ ভবিষ্যতেও যে আর কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনা কম। অনধিকার প্রবেশের চেতনাতে অস্বস্তি বোধ করছিলাম, নিজেকে ছোট মনে হতে লাগল খুবই, তাই দ্রুত বেরিয়ে এলাম। ঘরে ফিরেও মনটা দমে রইল। তবে এই অনধিকার প্রবেশ থেকে একটি শিক্ষাও পেয়েছি—ঐ নীতিবাক্যটির শিক্ষা।

ওটি যেন আমারই জন্তে লেখা ছিল। আমার কৌতূহলের জবাব ওটা।—"করিবার পূর্বে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিও ইহা কি সত্যই প্রয়োজনীয় ?"

কিন্তু আমি সেই দিনই রাত্রে এ প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। একটা সূক্ষ্ম রশ্মিরেখা ক্রমশঃ অনিবার্যরূপে বিস্তার লাভ ক'রে মনকে আলোকিত ক'রে তুলেছে। সেটি এই যে "সত্যই প্রয়োজনীয় কি না" ভাবতে গেলে দেখা যায় আমরা অনেক জিনিসই অকারণ করি, ঐ প্রশ্ন মিলিয়ে কাজ করতে গেলে শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী হওয়া ভিন্ন গতি থাকে না, অথচ সন্ন্যাসী হওয়া তো আর মুখের কথা নয়। তাই প্রয়োজন সৃষ্টি ক'রে নিতে হয় মনে মনে। যা প্রাণ চায়, সেটাই ভয়ানক দরকার, ভেবে না নিলে যা প্রাণ চায় তা করা যায় না।

কিন্তু তত্ত্বকথা থাক। সে দিন গভীর রাত্রে শিবরামবাবু কোনো রকমে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌছতে পেরেছিলেন। পা এতই টলছিল যে রিকশ থেকে নেমে দু পাও এগোতে পারেন নি, সশব্দে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। রাত্রির শান্তি বিঘ্নিত হওয়াতে ঘটনাটি আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারল না। অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে আমরাই কজন ওঁকে ধরাধরি ক'রে ঘরে পৌছে দিলাম নাকে রুমাল বেঁধে।

শ্রদ্ধা হঠাৎ ঘা খেল। হয়তো সেই জন্মেই ভীষণ ঘৃণা হল শিবরামবাবুর উপর। একবার এমনও মনে হল—সত্যই কি প্রয়োজন ছিল তাঁকে সিঁড়ির গোড়া থেকে উপরে তোলার ? তিনি তো মদ খাওয়ার "প্রয়োজন" সৃষ্টি ক'রে বিবেককে ভোলাচ্ছেন এই ভাবে, আমার বিবেককে ভোলাই কি দিয়ে ?

(১৯৫০)

বাটখারা

ময়দানের বুকে সন্ধ্যা নেমে এলো। রাজপথের পাশের দোকানগুলিতে আলো জ্বলেছে অনেক আগেই, সে আলো ক্রমশ উজ্জলতর হচ্ছে। যেন কৃষ্ণ রাত্রির আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থের সভা সাজাচ্ছে ময়দানব, ময়দান প্রান্তে।

বিশ্রামরত জনতা এক এক দলে ভাগ হয়ে অলসভাবে দূরে দূরে বসে আছে। এক একটা বৃক্ষগুচ্ছ ঘনতর অন্ধকার বুকে নিয়ে সমস্ত পরিমণ্ডলকে রহস্যময় ক'রে তুলেছে। যে দিকে তাকানো যায় সব রোমান্টিক মনে হয়, এই রূঢ় বাস্তবতার দিনে যা চিন্তা করাও পাপ। এ গল্পটিও তাই এ যুগের শেষ রোমান্টিক গল্প।

অরুণ আর মাধবী একখানি বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে। দূরে চৌরঙ্গীর কড়া আলোর দিকে চাইতে তাদের ভাল লাগছিল না। সব ভাল্‌গার মনে হচ্ছিল। যে নদীর পাড় এখনই ভেঙে পড়তে পারে তার কিনারায় বসে কিছুই ভাল লাগে না।

দু'জনে নীরবে বসে আছে। দু'জনের মাঝখানে শুধু একটি র‍্যাশন থলে, তার মধ্যে আড়াই সেরের একটি বাটখারা। অরুণ এটি সঙ্গে এনেছে কেন তা সেই জানে।

কিন্তু কেন দু'জন সক্ষম ব্যক্তি দৃঢ় মাটির নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে ফাটলধরা পাড়ে এসে বসেছে? কি তাদের দুঃখ? র‍্যাশনের চাল কমিয়ে দেওয়ার দুঃখ? আসামের ভূমিকম্প? বিহারের বন্যা?

না। এ সব বহির্জগতের ছোঁয়াচ থেকে ওরা কিছুকাল মুক্ত আছে। ওদের বর্তমান সমস্যার কথা বলতে গেলে এক বছর আগের স্টীমার পার্টির কথা তুলতে হয়। স্টীমার থেকে জলে-পড়া মাধবীর প্রাণ বাঁচিয়েছিল অরুণ সেই এক বছর আগে। কিন্তু যে রাগ দুর্ঘটনা দিয়ে শুরু, তার শেষও একটি বড় দুর্ঘটনা। বহু নজীর আছে।

এমনই ঘটে। যে অরুণ জলে-পড়া মেয়েকে বাঁচিয়ে হয়েছিল হীরো এবং সামাজিক মূল্যে আজও যে হীরে, সে আজ এই মুহূর্তে কয়লা হয়ে যেতে পারে এমন সঙ্কট দেখা দিয়েছে। থেকে থেকে তার মনের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে। থেকে থেকে তার চোখ দুটি ভয়ার্ত হয়ে উঠছে, আর বারবার সে তার পাশের র‍্যাশন থলেটা হিস্টিরিয়া রুগীর মতো শক্ত ক'রে চেপে ধরছে। যেন কত বড় একটা আশ্রয়।

দৃষ্টি কিন্তু তার আকাশের দিকে। হায় রে অবুঝ মন। এখনো সে অসম্ভব কল্পনায় ডুবতে পারছে। মাধবীর নীরবতার অর্থ না বুঝেও তার কল্পনা ছুটে চলেছে বল্গাহীন। এখনও সে আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে, সে যেন একটি দেশী হাউই, স্ফুলিঙ্গের আকাশ-ছোঁয়া সুদীর্ঘ পতাকা উড়িয়ে ঊর্ধ্বে ছুটে চলেছে। যেন সে বিজ্ঞানীদের পরিকল্পিত চন্দ্রলোকগামী রকেট, যে শক্তি তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, সে তার অন্তরবাসী মাধবী। কল্পনা করছে, আর তার মাথা ঝিম ঝিম ক'রে উঠছে।

একটি বছর ধরে অরুণ পুরুষের চিরদিনের রূপসৃষ্টির ধারা অনুসরণ ক'রে মাধবী নামক অতি সাধারণ একটি মেয়ের উপর রঙের পর রঙ চাপিয়ে তাকে এমন এক অনির্বচনীয় শোভায় দাঁড় করিয়েছে যে, তার চোখে সে ভিন্ন আর কিছু সুন্দর নেই, কখনো ছিল না, কখনো হবেও না। প্রথমে সে তার মূর্তির উপর (১) বেগুনি চাপিয়েছে, তারপর (২) নীল, তারপর (৩) সবুজ, তারপর (৪) হলুদ, তারপর (৫) জরদা, তারপর (৬) লাল। তারপর রূপালি, তারপর সোনালি। তারপর তাকে পরিয়েছে সূক্ষ্ম রামধনু রঙা মসলিন, তারপর তাকেও বেষ্টন করেছে তার আরও সূক্ষ্ম স্বপ্ন আবরণ। আর শুধু স্বপ্ন নয়, বাজার থেকেও অনেক আবরণ কিনতে হয়েছে।—বেনারসী, জর্জেট, ঢাকাই। এই তো সেদিনও সে নিজের জুতো কিনতে গিয়ে সেই টাকায় কিনল একটি ভ্যানিটি ব্যাগ।

এই মাধবীকে আজ শেষ কথাটি বলতে হবে—বিবাহে রাজি আছে কি না। এই প্রথম প্রশ্ন এবং এই শেষ প্রশ্ন। এর আগে এ প্রশ্ন ওঠে নি, শুধু জমি তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু অরুণের এমন ভ্রান্তি ঘটল কেন? আগে তো তার মুখেই শোনা গেছে, প্রেম যখন মানুষকে উন্মাদ করে তখনই বুঝতে হবে প্রেমের ধ্বংসও আসন্ন হয়ে এসেছে। তখন তাকে বিবাহ নামক সমাধিক্ষেত্রের দিকে ছুটতে হয়। সে তখন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে। সমাধি রচিত হয় বিবাহ বাসরে। এই সমাধিক্ষেত্রে ধরাপৃষ্ঠ আকীর্ণ হয়ে আছে। প্রেম ও বিবাহ তাই জীবন ও মৃত্যু। অরুণই এতদিন বলেছে প্রেম ও বিবাহ ভাল নয়, বিবাহ এবং প্রেম ভাল, কারণ শেষেরটিতে বিবাহ মারা পড়ে, প্রেম বেঁচে থাকে। কিন্তু আজ তার বুদ্ধি আচ্ছন্ন। সে আজ একটি বাজে প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় বোকার মতো আকাশের দিকে চেয়ে আছে। তার শেষ আশ্রয় র‍্যাশনের থলে আর আড়াই সেরের বাটখারা।

তার পাশে মাধবীও চিন্তাহীন নয়। অরুণের দৃষ্টি আকাশের একটি ক্ষীণ নক্ষত্রের দিকে কিন্তু মাধবীর দৃষ্টি নিচের দিকে সাত নম্বরের একটি বিশেষ

জিনিসের প্রতি। মেয়েদের কল্পনাশক্তি কম এ কথাটির সমর্থনস্বরূপ নয়, তার প্রতিবাদ স্বরূপই। অরুণের মন হাইড্রোজেনের মতো উর্ধ্বগামী, মাধবীর মন পারদের মতো নিম্নগামী, কিন্তু কল্পনাশূন্য নয়।

সে ঐ সাত নম্বরের জিনিসটি থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না, কারণ সেও তার মধ্যে দিয়ে একটি জগৎকে দেখছে, যদিও সে জগৎ রঙীন জগৎ থেকে কিছু স্বতন্ত্র। সে জগৎ ছিন্ন জগৎ। জোড়াতালি দেওয়া। যেন গিবন রচিত বিখ্যাত ইতিকথা, যেন তাতে একটি সাম্রাজ্যের ঘুণ ধরার কথা সবিস্তারে লেখা আছে।

কিছুই না, সাত নম্বরের একপাটি জুতো। অরুণের যে পা-খানি তার হাঁটুর উপর দিয়ে মাধবীর দিকে এগিয়ে এসেছে সেই পায়ে আছে সেই জুতো। তার চামড়া ভাঁজে ভাঁজে ফেটে গেছে, মৃদু আলোতেও তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সোলের পাশ থেকে একখণ্ড তালি উপরের দিকে সেলাই করা। জুতোধারীর দারিদ্র্যের ইতিহাস তার প্রতিটি সেলাইয়ে গাঁথা। ফাটা চামড়ার ফাঁকে ফাঁকে যে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে সেই অন্ধকারে একটি কর্মহীন বেকার জীবনের বেদনাময় ইঙ্গিত। এই জুতো যে পা বহন করছে এবং সেই পা যে মানুষটাকে বহন করছে তার দাম কতটুকু?···সমস্ত পূর্বরাগ ভেদ ক'রে মাধবীর মনে এই প্রশ্নটি হঠাৎ কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সমস্ত প্রেম দলিত ক'রে ঐ ফাটা জুতো তার কল্পিত বিবাহিত জীবনের শিরে আঘাত হানতে থাকবে দিনের পর দিন। ভাবতেও মাধবী শিউরে উঠল। কেন এতদিন সে তার মুখের দিকেই চেয়েছে, জুতোর দিকে চায় নি? কেন মালা গাঁথার আগে শুধু ফুলের দিকেই তাকিয়েছে, সুতোর দিকে তাকায় নি?—মাধবীর চোখ দুটি দুঃখে ঘৃণায় অশ্রুসিক্ত হয়ে এলো। সে মনটাকে তাড়াতাড়ি কঠিন ক'রে অরুণের শেষ প্রশ্নের উত্তরে শেষ উত্তর জানিয়ে দিল—"না"। সে সময়ে তার মুখের দিকে চাইলে মনে হত যেন স্বর্গের কোনো দেবী কথাটি উচ্চারণ করছে।

সঙ্গে সঙ্গে অরুণের সমস্ত দেহে এবং বিশেষ ক'রে ঘাড়ে ধনুষ্টঙ্কারের যে সব লক্ষণ দেখা গিয়েছিল তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সে সময় যে শক্তিতে সে তার থলেটি চেপে ধরল তা মানবশক্তি ছেড়ে অশ্বশক্তির সীমানায় পৌঁছেছিল। সে প্রস্তরীভূত ঘাড়ে উর্ধ্বমুখী অবস্থাতেই থলেটি তুলে নিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে গিয়ে একখানা রিকশর উপর চেপে বসল এবং বলল, "জোর চালাও, চাঁদপাল ঘাট।"—

রিকশয় চলতে চলতে তার মনের মধ্যে যে প্রলয়লীলা চলতে লাগল তার চেহারাটা এইরকম—

প্রথমতঃ, মাধবীকে ঘিরে সে যে স্বপ্নজাল রচনা করেছিল তা ছিঁড়ে গেল।

তারপর রামধনু-রঙা সূক্ষ্ম মসলিনের আবরণটাও ছিঁড়ে গেল।

বেরিয়ে পড়ল সোনালি রঙ, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সেটাও ফিকে হয়ে রূপালি রং দেখা দিল, তারপর লাল গেল, তারপর জরদা, তারপর হলুদ, তারপর নীল, তারপর বেগুনি—স্পেকট্রামের কাঁচখানাই যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল পাষাণ পথের উপর। রিকশ ছুটে চলেছে হাল্কা যাত্রীকে বহন ক'রে। অরুণের শাদা চোখে ফুটে উঠল শাদা মাধবী, অতি সাধারণ, কুশ্রী, কুরূপা একটি মেয়ে! একটি নিশ্বাসে যৌন-সৌন্দর্য এমনি ক'রেই মিলিয়ে যায় এক ধাক্কায়। নির্বোধ পুরুষ তবু ওরই নাম দেয় প্রেম।

অরুণ দ্রুত রিকশওয়ালাকে বিদায় ক'রে গঙ্গার ধারে এগিয়ে গেল এবং বাটখারাসুদ্ধ থলেটি গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে জুতো খুলে ফেলল পা থেকে। তারপর আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ দেবে, এমন সময় তার মনে হল, "কার জন্যে ?"

পর মুহূর্তেই দেখা গেল থলেটি গলা থেকে খুলে 'রিকশ—রিকশ' করতে করতে সে ছুটে চলেছে অদৃশ্য রিকশকে অনুসরণ ক'রে। জুতোর কথা ভাববার আর তার সময় ছিল না।

এদিকে ময়দানে একা মাধবী কিছুক্ষণ চিন্তামূঢ় অবস্থায় কাটাবার পর তার খেয়াল হল কি ঘটেছে এবং ঘটতে যাচ্ছে। বুঝতে বাকী রইল না অরুণ গঙ্গার দিকে গেল কেন। নির্বোধটা নিশ্চয় আত্মহত্যা করতে চায়।

মাধবীও একখানা রিকশয় উঠে চলল গঙ্গার দিকে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই তার চোখে পড়ল সেই পরিচিত জীর্ণ জুতো জোড়া। তার সুস্থ মস্তিষ্কও এ দৃশ্যে সাময়িকভাবে যেন ঝিম ঝিম ক'রে উঠল। বসে পড়ল সে ঐ খানেই। সাঁতার জানত সে। একবার তার মনে হল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরুদণ্ডহীন বাঙালী উদ্ধারের কাজে লাগলে কেমন হয়? কল্পনাটা মন্দ লাগছিল না, কিন্তু তখনি তার মনে আর একটি প্রশ্ন জাগল, "লাভ কি ?"

জীর্ণ জুতো জোড়ার উপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল শুধু। নিজের ভবিষ্যৎটা চকিতে একবার দেখে নিল মাধবী। উৎকৃষ্ট জুতোর খোঁজেই ঘুরে বেড়াতে হবে এর পর থেকে, কিন্তু কত দিন কে জানে ?

(১৯৫০)

একটি অর্থনৈতিক গল্প

ভবানন্দ, মুকুন্দ আর জনার্দন।

ওরা তিনজনেই ছিল আমার সহপাঠী নিকট বন্ধু। আমরা ইণ্টারমীডিয়েট পর্যন্ত একসঙ্গেই ছিলাম, কিন্তু তারপর আমি প্রাণী-বিজ্ঞান এবং ওরা ইতিহাস ও অর্থনীতির দিকে ঝোঁকাতে আমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল, ওরা শেষ পর্যন্ত হল কলেজের প্রোফেসর, আর আমি আমার পৈতৃক সঞ্চয় আর নিজস্ব বিদ্যার সাহায্যে আমার বাড়ির বহিরঙ্গনের এক নির্জন কোণে কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম।

কিন্তু এ আমাদের নিতান্তই বাইরের পরিচয়, এতে আমাদের বন্ধুত্ব কিছুমাত্র নষ্ট হয় নি, কারণ ঐ তিন জনের চরিত্রে এমন এক মহা আকর্ষণীয় গুণ ছিল যা আমাকে মুগ্ধ করত, হয়তো ওদের প্রতি আমার যে সহৃদয় ঔদার্য ছিল তাতে আমিও ওদের মুগ্ধ ক'রে থাকব।

ওরা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব চরিত্রের, ওদের চিন্তায় এবং কাজে একটা কৌতুককর মৌলিকত্ব ছিল যাতে ওদের চারপাশের আবহাওয়া হাসিতে হল্লাতে নাচে গানে সব সময় উজ্জ্বল হয়ে থাকত। এমন কি প্রোফেসর হবার পরেও যখন সামান্য বেতনে ওদের চলা দুঃসাধ্য হল তখন বিনা দ্বিধায় মুখে রং মেখে ঘুঙুর-পায়ে সন্ধ্যাবেলা পথে পথে নেচে গেয়ে পেটেণ্ট ওষুধ বিক্রি করতে শুরু করল, এবং দিনের ও রাতের উপার্জন মিলিয়ে সচ্ছলতার সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ সরসতা বজায় রেখে চলল।

এর মধ্যে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং ঝঞ্ঝাট দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেল, কত দাঙ্গা, কত মৃত্যু, তবু ওদের উচ্ছলতা কিছুমাত্র দমল না, বরঞ্চ নব স্বাধীনতার দমকা হাওয়ায় ওদের প্রাণধর্ম আরও খানিকটা মাথা তুলে সবার উপর দিয়ে দুলতে লাগল। শুধু দোলা নয়—সে মাথায় সর্বত্র গুঁতো মেরে বেড়ানোর প্রবৃত্তিটিও বেশ ভালই জেগেছিল, আর তার প্রমাণও পেলাম আমারই গবেষণা-ঘরে।

দমকা হাওয়ার মতোই এসে ঢুকল একদিন ওরা তিনজন—হল্লা করতে করতে। মুকুন্দ হাসতে হাসতে আমাকে দুই ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "কীটের সঙ্গে তুইও কীট হয়ে পড়েছিস, একবার বাইরে যা—বাইরে যা—দেখ্ কি আনন্দোৎসব চলছে সেখানে।" ভবানন্দ হঠাৎ চিৎকার ক'রে বলে উঠল,

"এ কি! আজকের দিনে তুই এতগুলো প্রজাপতিকে বন্দী ক'রে রেখেছিস"— বলতে বলতেই আমার প্রজাপতির বাক্স খুলে সবগুলোকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। কিন্তু তারা হাওয়াতেই যেটুকু উড়ল, তার বেশি নয়, কারণ সেগুলো সবই বহুদিনের মরা প্রজাপতি। জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে ছিল কতকগুলো মাকড়সা, তবে তারা বন্দী ছিল না, তাদেরই জালে স্বাধীনভাবে বসে ছিল, কিন্তু জনার্দনের তা পছন্দ হল না, সে সেই জাল ছিঁড়ে দিল অকারণ।

আমি বললাম, "আঃ! তোরা করছিস কি, এলি অনেক দিন পরে, স্থির হয়ে বোস্—"

ভবানন্দ চীৎকার ক'রে বলল, "স্থির হয়ে বসব কি রে? কি সব ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে তোর যে হৃদয়ঙ্গমই হচ্ছে না।"

"কি এমন ঘটে যাচ্ছে?"

ভবানন্দ লাফিয়ে উঠে বলল, "স্বাধীনতা!—সবার চেহারা বদলে যাবে—যা কিছু পুরনো সব নতুন হয়ে যাবে—যা কিছু—"

মুকুন্দ আমার একখানা হাত খপ্ ক'রে ধ'রে উন্মাদের মতো আমার দিকে চেয়ে বলল, "শুধু চেহারা বদলাবে না, নামও বদলাবে! তোমার ঐ হুগলী নদী আর হুগলী নদী থাকবে না—ঢাকুরিয়ার হ্রদ আর ঢাকুরিয়া হ্রদ থাকবে না—বঙ্গোপসাগরও নতুন নাম পাবে।"

আমি বললাম, "কি রকম?"

মুকুন্দ বলল, "হুগলী নদীর নাম হবে মধুমতী—কারণ সেখানে জলের বদলে বয়ে যাবে মধু—আর মধু। ঢাকুরিয়া হ্রদের নাম হবে দুগ্ধ-সরোবর। কত দুধ চাই?"

বলতে বলতে তিন অধ্যাপক দাঁতের মাজনের গান গেয়ে নাচতে শুরু করল, আমি সভয়ে আমার মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রটি আলমারীতে বন্ধ করলাম। ওরা বিজ্ঞান-ঘরে উল্লাসের যে ঘূর্ণি হাওয়া বইয়ে দিল, সাময়িকভাবে আমিও ওদের স্ফূর্তিতে যোগ না দিয়ে পারলাম না। তার পর যাবার সময় আমাকে টানতে টানতে পথে বের ক'রে বলল, "আর ঘরে ফিরিস না এখন।"

ভিতরে ভিতরে সামান্য একটু আশা বা বিশ্বাসের দানা থাকলে ওরা এই ভাবেই তাকে কেন্দ্র ক'রে অনেক কিছু ফাঁপিয়ে বলতে পারে, সুতরাং দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওদের মনে যে কিছু আশা ছিল এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। ওদের কথা শুনে তাই আমারও মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে রইল।

কিন্তু ক্রমে দিন যায়, দেখি লোকের মুখ শুকনো, তাতে নিরাশার ছায়া। বাজারে নাকি চাল দুর্লভ, কাপড় পাওয়া যায় না, খবর পাই; ক্রমে চিনি,

কয়লা, নুন, অদৃশ্য হচ্ছে। সরষের তেল নেই, ঘি নেই, দুধ নেই, মাছ নেই, মাংস নেই।

আর সবচেয়ে শোচনীয়, কিছুকাল ভবানন্দ, মুকুন্দ এবং জনার্দনেরও দেখা নেই। এই শেষের ঘটনাটিই আমার কিছু উদ্বেগের কারণ হয়ে রইল। ওরা কেমন আছে এখন কে জানে! কি ক'রে যে ওদের চলছে কল্পনা করতে পারি না। কলেজের বেতনে চলা অসম্ভব, হয় তো ফেরিওয়ালার কাজে বেশি মন দিয়েছে, কিংবা অন্য এমন কোনো কাজ, যাতে আর দেখা করার সময় পাচ্ছে না।

মানুষের জগৎ হতে দূরে থেকে আমার ভালই হয়েছে এ কথা চিন্তা করি মাঝে মাঝে। আমার কীটপতঙ্গের জগতে কোনো রূপান্তর নেই, তাই আমার দিন কাটে ভাল। সম্প্রতি মৎস্যভুক মাকড়সা নিয়ে একটা গবেষণায় মেতে আছি। জলাধার থেকে মাছ টেনে তুলে কি কৌশলে সেটাকে খাওয়ার ব্যবস্থা করছে। কৌশলগুলো দিনের পর দিন লক্ষ্য করছি আর নোট বইয়ে টুকে টুকে রাখছি। বিষয়টি এমনই আমাকে ডুবিয়ে রেখেছে যে, আমার কাছে আর সব মিথ্যা হয়ে গেছে। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক, শুধু আমি থাকি আর থাক এই গবেষণাগারটি। আমাকে ঘিরে মধুর হাওয়া বয়ে যায়, আমার এখানে যে ফুলের গাছগুলি আছে তার উপর রোদ এসে খেলা করে, জলাধারটি ঝলমল ক'রে ওঠে, মাছেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, পাখীরা গান গায়, সব মিলিয়ে আমার এই নির্জন অঙ্গনটি এক অপার্থিব আনন্দ-রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু যখন মনে পড়ে (এবং বর্তমানে মাঝে মাঝেই মনে পড়ছে) যে আমার ব্যাঙ্কের হিসাবে জমার দিকটি বেশ খালি হয়ে এসেছে, তখন মনটা দমে যায়, তখন বুঝতে পারি এক দিন (এবং সে দিনের বেশি দেরি নেই) আমার এ রাজ্যটির আর অস্তিত্ব রাখা সম্ভব হবে না, এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েই মিলতে হবে, জানি না নাচতেও হবে কি না। সুতরাং দেশের অবস্থা একটু তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার এ বিষয়ে মানসিক উদ্বেগ ক্রমশই অদম্য হয়ে উঠছে। এমন সময় আমার মনে আশা জাগিয়ে ভবানন্দ, মুকুন্দ এবং জনার্দন এসে পড়ল একদিন ধূমকেতুর মতো। আমিই এবারে আনন্দে নেচে উঠলাম এবং প্রশ্নের পর প্রশ্নে ওদের অস্থির ক'রে তুললাম।

কিন্তু ওদের খবর ভাল নয়। যা শুনলাম তা এই যে, ছদ্মবেশ ধরা পড়াতে কলেজের চাকরি গেছে তিনজনেরই। কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন, "কলেজে থাকতে হলে সান্ধ্য ব্যবসা ছাড়তে হবে, আর যদি ব্যবসা রাখতে চাও তা হ'লে কলেজ ছাড়!" ওরা তিন জন অনেক পরামর্শ ক'রে কলেজ ছেড়ে দেওয়াই ঠিক

করেছে, কেননা মুখে রং মেখে নেচে গেয়ে ফেরি করায় উপার্জন অনেক বেশি। তা ছাড়া ছদ্মবেশী ফেরিওয়ালা হওয়াতে প্রোফেসর হিসাবে কলেজে যে পরিমাণ সম্মানের হানি হয়েছে, ক্রেতারা ঘুঙুর-পায়ে রং-মাখা ফেরিওয়ালামাত্রকেই কোনো না কোনো কলেজের ছদ্মবেশী প্রোফেসর মনে ক'রে সেই পরিমাণ খাতির করছে। ফলে সন্ধ্যাবেলার এই নৃত্যরত ব্যবসায়ীমাত্রেরই খুব সুবিধা হয়ে গেছে।

মুকুন্দ বলল, "তা ছাড়া ফেরিওয়ালার একটা ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু কলেজের প্রোফেসরের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বিশেষ ক'রে বাংলা বিভাগের পর কলেজে ছাত্রের সংখ্যা আর প্রোফেসরের সংখ্যা দুই-ই বেড়ে গেছে এবং বোধ হয় প্রোফেসরের সংখ্যাই বেশি হয়েছে আর তার ফলে আগে যেখানে একই প্রোফেসর মজুরদের মতো দু' শিফ্‌ট তিন শিফ্‌ট ক'রে কাজ চালিয়ে 'এক্সট্রা' পেত, এখন আর সে সুযোগ ততটা নেই। প্রোফেসরদের মধ্যে যারা চতুর তারা সবাই খবরের কাগজে ঢুকে গেছে, আর যারা আমাদের মতো বেপরোয়া তাদের দিন চলছে না।"

আমি বললাম, "কিন্তু দেশের এ অবস্থায় ফেরি করার ভবিষ্যৎই বা কোথায়? ফেরিওয়ালার সংখ্যাও তো অনেক বেশি হয়েছে শুনেছি।"

এই প্রশ্নে ওদের তিন জনেরই মুখ থেকে নিরাশার অন্ধকার দূর হয়ে দপ ক'রে আশার আলো জ্বলে উঠল।

ভবানন্দ বলল, "দেশের অবস্থা তো ফিরছে অল্প দিনের মধ্যেই, কাজ শুরু হয়ে গেছে, যুগান্তকারী সব পরিকল্পনা, ভয়টা কিসের?"

মুকুন্দ বলল, "এক দামোদর বাঁধ তৈরি হলেই আমাদের সব অভাব ঘুচে যাবে।"

জনার্দন বলল, "কিন্তু তারও আগে আমাদের দুধের অভাব একেবারে মিটে যাচ্ছে, দেখ নি খবরের কাগজে পশ্চিমা গোরুর ছবি?"

আমি কাগজ কদাচিৎ পড়ি, তাই জানতাম না।

জনার্দন বলতে লাগল, "শুধু তাই নয়, ফসল বাড়াও আন্দোলন আছে এর সঙ্গে। সব যদি মিলিয়ে দেখ, তা হ'লে বুঝতে পারবে আমাদের মুখের রং অল্পদিনেই ধুয়ে ফেলতে হবে, তখন আর ফেরিওয়ালা সেজে নাচব না, আনন্দে নাচব।"

লক্ষ্য ক'রে দেখলাম তিন জনেরই পা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার পর হঠাৎ দেখি মুকুন্দ এক লাফে উঠে গিয়ে আমার ফুলের গাছগুলো উপড়ে তুলে

ফেলছে আর চিৎকার ক'রে বলছে, "এখানে বেগুন লঙ্কা সিম যা হয় লাগাও, ফুল আর চলবে না।"

জনার্দন টেবিল থেকে একটি কাচের লম্বা-গলা পাত্র তুলে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি বাধা দেবার আগেই কাজটি শেষ হয়ে গেল, বলল, "এ সব আর কি কাজে লাগবে? আনন্দ কর, আনন্দ কর।"

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, যাবার সময় লক্ষ্য করলাম, ওদের চোখের চারদিকে একটা কালো চক্র দেখা দিয়েছে।

বেশ বোঝা গেল ভিতরে ভিতরে ওদের মনের মধ্যে নৈরাশ্য স্থায়ী বাসা বেঁধেছে, বাইরে যে আশার কথা শোনাতে চেয়েছিল তা ওদের হয়তো অন্তরের কথা নয়, তাই গাছ উপড়ে এবং কাচের পাত্র ভেঙে যে আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তার সঙ্গে ওদের মনের সুর মিলল না। কয়েক মাস আগে হলে ওদের এই ভাঙাচোরার কাজে হয়তো আমিও যোগ দিতাম, কিন্তু আজ পারলাম না ব'লেই আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। আমার মনে একটি প্রশ্ন ভেসে উঠল, অদম্য আশার সৌধ যদি এমন ক'রে ভেঙে পড়তে পারে, তা হ'লে আমিই কি সংসার থেকে পালিয়ে একা বেঁচে যাব?

এর পর মাসখানেক কেটে গেছে।

সন্ধ্যার দিকে কাছাকাছি ম্যাডক্স স্কোয়ারের এক কোণে মাঝে মাঝে চুপচাপ গিয়ে বসে থাকা আমার অভ্যাস। আমি যে কোণটিতে প্রায় বসি, সেদিন দেখি তিনটি কঙ্কালসার ব্যক্তি সেখানে বসে হাই তুলছে। একটু কাছে আসতেই চিনতে পারলাম তাদের এবং চিনে চমকে উঠলাম। আলাপের ভাষা খুঁজে পেলাম না, পুরনো কথাই তুললাম—জিজ্ঞাসা করলাম, "দামোদর বাঁধের খবর কি?"

ভবানন্দ বলল, "দামোদর বাঁধ বোধ করি এ জীবনে আর দেখা যাবে না।"

"দুগ্ধ পরিকল্পনা?"

"ফোটোগ্রাফটি রেখেছি সঙ্গে, আর কিছু জানি না।"

"ফসল বাড়াও আন্দোলন?"

"আর এক পুরুষ পরে জিজ্ঞাসা করিস।"

তারপর শুষ্ক হাসি হেসে বলল, "কিছু টাকা ধার দিতে পারিস—অবশ্য শোধ দেওয়া সম্পর্কে একটু সন্দেহ রেখেও?"

বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলাম ওদের।

ইতিমধ্যে আমার একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি নিজের

কাজে মেতে থাকি সে জন্য বাইরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কম, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের ঘরের প্রতিও আমি যে এমন উদাসীনতা প্রকাশ ক'রে এসেছি তা এত দিন খেয়াল করিনি। এক দিকের একাগ্রতা ভেঙে যাওয়াতে এতদিনে অন্য দিকেও দৃষ্টিপাতের সুযোগ এলো। হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী শ্রীমতী অমলা ভয়ঙ্কর রকম রোগা হয়ে পড়েছে। আমাদের বিবাহ হয়েছে পাঁচ বছর। স্বাস্থ্যবতী শিক্ষিতা স্ত্রী, ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে বি এ পাস করেছে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে সে সর্বদা তার বিদ্যার পরিচয় ঢেকে রাখারই চেষ্টা ক'রে এসেছে, কারণ সামান্য শিক্ষা পেয়ে মেয়েরা সাধারণতঃ যে পুরুষোচিত উগ্রতা এবং রুক্ষতায় নারীধর্ম হারিয়ে ফেলে, অমলা ছিল তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র। সে ছাত্রীজীবনে নীরবে দেশসেবা করেছে, কারণ তার দেশপ্রেম ছিল উগ্র রকমের আন্তরিক। আমি তাকে পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছি, তারই হাতে সংসারের সকল ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আমার কাজ ক'রে চলেছি। কিন্তু তার স্বাস্থ্য হঠাৎ এমন ভেঙে পড়ল কেন? সংসার খরচে কার্পণ্য করার কথা নয়, অসুখের কথাও কখনও শুনি নি।

মাস তিনেক আগে একদিন সে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল ইকনমিক্সের তত্ত্ব। বলেছিল বিদেশ থেকে যে খাদ্য বা যা-কিছু আমদানি করতে হচ্ছে, তা যদি কিছু দিন একই ভাবে চলে তা হ'লে এ দেশ ভয়ংকর গরিব হয়ে যাবে, সেজন্য প্রত্যেকেরই উচিত প্রাণপণে দেশের প্রয়োজন দেশের মধ্যেই মেটাবার চেষ্টা করা। নইলে যন্ত্রপাতি কেনবার টাকা থাকবে না, আর যন্ত্রপাতি যথেষ্ট কিনতে না পারলে দেশের কোনো পরিকল্পনাই সফল হবে না।

কিন্তু আমি তখন গবেষণার এমন এক পর্যায়ে উপনীত যে, অর্থনীতির তত্ত্বে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারি নি।

আজ হঠাৎ মনে হল এ কি সেই অভিমানের ফল?

আমি নিজের অপরাধ উপলব্ধি ক'রে কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠলাম, আর তার ফলে যা জানা গেল তাতে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জানতে পারলাম অমলা প্রথমতঃ বাজারের ইনফ্লেশন কমানোর সাহায্য হবে ব'লে সংসারের খরচ যথাসাধ্য কমিয়ে দিয়েছে। টাকা বাজারে বেশি ছাড়লে জিনিসের দাম কখনো কমতে পারে না, তাই আমার খাদ্যমান যথাসম্ভব বজায় রেখে নিজের এবং অন্যান্য সবার বরাদ্দ একেবারে কমিয়ে ফেলেছে। তা ছাড়া যে বিদেশী গুঁড়ো দুধ আমাদের উভয়ের বরাদ্দ ছিল তা থেকে তার নিজের অংশটি একেবারেই বাদ দিয়েছে। এই গুরুতর অন্যায়টি সে কেন করল ক্ষোভে

দুঃখে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে সংক্ষেপে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল, "ডলার বাঁচাচ্ছি।"

আমার গবেষণা চুলোয় গেল, আমি প্রায় ক্ষেপে গেলাম। এর পর থেকে আমি আর পুরো বিজ্ঞান-গবেষক নই, পুরোপুরি পুরুষ হয়ে উঠলাম এবং নিজ হাতে সংসারের ভার নিয়ে এই গুরু অন্যায়ের প্রতিকারে মন দিলাম। আমার সংসর্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছাত্রীই রয়ে গেছে, গৃহিণী হতে পারে নি—সে দোষ সম্পূর্ণ আমারই।

দৈনন্দিন সংসার চালানোও একটা বিদ্যা এবং এর মধ্যেও একটি বিজ্ঞান আছে, আনন্দও আছে। এতদিন আমার জগৎটা ছিল নিতান্তই কীটপতঙ্গের জগৎ, এখন দেখি মানুষের জগৎও সুন্দর।

একদিন মুকুন্দ আমার মরা প্রজাপতি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে মস্ত বড় একটা ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল। আমার মনে হতে লাগল আমারই বন্দী মৃত মনটাকে সে বাইরের আলো-হাওয়ায় নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল। তার পর ওরা যতবার এসেছে ততবারই আমার গবেষণাগারের আবহাওয়াকে লণ্ডভণ্ড ক'রে দিতে চেয়েছে। আজ এসে যদি ওরা সব লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যায় তা হ'লেও হয়তো আর দুঃখ হবে না। কিন্তু ওদের যে অবস্থা সেদিন দেখেছি—আর কি কখনো ওরা আসবে? জীবন-যুদ্ধের প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছে আর কোন্ আশা নিয়ে এখনও বেঁচে থাকবে?

কিন্তু ওরা বেঁচে ছিল, এবং ভাল ভাবেই ছিল তার প্রমাণ পেলাম মাস দুই পরে।

এক দিন ওদের সম্বন্ধেই ভাবছিলাম, এমন সময় চিন্তার অন্ধকার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে তিন বন্ধু যেন একটা উগ্র আলোয় জ্বলতে জ্বলতে এসে হাজির হল। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম তাদের দিকে চেয়ে। দেখলাম তাদের চেহারায় অনেক উন্নতি হয়েছে, চোখের চারদিকের সেই কালো চক্র আর নেই, তার বদলে কালো-চশমা—ছদ্মবেশ ধরতে যা ব্যবহার করত। হাড়ে মাংস লেগেছে, চালচলন ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণ অভিনব, চেহারা উজ্জ্বল, পরনে জাতীয় পোশাক, এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর, তারা হিন্দিতে কথা বলছে। দেখেশুনে কৌতুক বোধ করলাম, আনন্দও হল খুব। মনে হল রাজধানী থেকে কোনো বড় চাকরি বা কোনো বড় দাঁও মেরে থাকবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কোনো পরিকল্পনা কি তা হ'লে ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে?—দেশোন্নতির কোনো বৈপ্লবিক পরিকল্পনা?"

ওরা তিন জন একসঙ্গে হেসে উঠল। ভবানন্দ বলল, "কি পরিকল্পনা ?"

"যেমন দামোদর"—

"দামোদরের বানে ভেসে গেছে।"

"তা হ'লে 'ফসল বাড়াও' ?"

"ফসল বাড়তে দেরি হবে।"

"দুগ্ধ পরিকল্পনা ?"

মুকুন্দ বলল, "কোনোটাই দরকার হল না। সম্পূর্ণ নূতন এক পরিকল্পনা আর সবগুলোকে মেরে দিয়েছে।"

আমি সবিস্ময়ে বললাম, "কি রকম ? পরিকল্পনা হতে না হতেই তার ফল ভোগ করছ না কি ?"

জনার্দন বলল, "ঠিক ধরেছ। এ পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিরাট, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এর দ্রুত সাফল্য—যা একমাত্র এই পরিকল্পনাতেই সম্ভব।"

"তোমরা কি এর মধ্যে আছ ?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

ভবানন্দ বলল, "আছি, এবং আমরা প্রত্যেকে মোটা বেতনে এই গুরু দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি। হাজার হাজার আপিস বসছে দেশের সব জায়গায়, হাজার হাজার লোক নিযুক্ত হচ্ছে—বক্তা, গায়ক, চিত্রকর সবাই। একেবারে 'মাস কণ্ট্যাক্ট' !"

আমি উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি কাজ করতে হচ্ছে তাদের ?"

ভবানন্দ বলল, "জনতার মাঝখানে গিয়ে, যাদের এতকাল ঘৃণা করেছ, অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছ, একেবারে তাদের মধ্যে গিয়ে, তাদেরই একজন হয়ে, একেবারে তোমার গজদন্তমিনার থেকে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসে শুধু একটি কথা বলা, একটিমাত্র বৈপ্লবিক কথা, একটি মাত্র বীজমন্ত্র উচ্চারণ করা, শুধু বলা—'কম খাও'।"

বলেই পকেটে হাত দিয়ে চট ক'রে ঋণের টাকাটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "এবারে আসি ভাই, বড্ড জরুরি সব কাজ পড়ে আছে।"

আমি শুধু বিমূঢ় স্তম্ভিত ভাবে ওদের বিলীয়মান মূর্তিগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম।

(১৯৪৯)

নারাণদার অনশন

নারাণদার ইতিহাস কোনো কাগজে ছাপা হয় নি, তাঁর নামও দেশের লোকে কেউ জানে না, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর মতো দেশপ্রেমিক এবং মহৎ লোক এ সংসারে খুব কমই আছে।

আমি তাঁকে অল্পদিনের জন্য জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু তবু সেই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অন্তরের যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তা প্রকাশ না করা পর্যন্ত আমার শান্তি হবে না।

আদর্শের খাতিরে আত্মবিসর্জন করতেও যিনি পশ্চাৎপদ নন, তিনিই আমাদের দেশের আদর্শ পুরুষ। নারাণদার মধ্যে দেখেছি সেই চরিত্র দৃঢ়তা, সেই অমানুষিক শক্তি, যার গুণে তিনি জীবন পণ করতে পেরেছেন আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে। অথচ দুঃখের বিষয় তাঁর নাম পর্যন্ত আমাদের দেশের কেউ জানে না। আমি আজ তাঁর সেই নাম জনসমাজে প্রচার করবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ ক'রে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

নারাণদা ছিলেন আমাদের গ্রামের যুবকদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি। খেলাধূলোর সকল রকম ব্যবস্থা, জঙ্গল সাফ করা, কচুরিপানা ধ্বংসের কাজ থেকে শুরু ক'রে মৃতদেহ শ্মশানে বয়ে নিয়ে যাওয়া—কোনোটাতেই তাঁকে না ডাকলে চলত না। তাঁর এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যাতে সবাই তাকে সম্ভ্রম করত অন্তর থেকেই। তাকে কেউ যেমন না ডেকে থাকতে পারত না, তেমনি তার ডাকেও কেউ না এসে থাকতে পারত না। ঘনকৃষ্ণ দীর্ঘ দেহ, হাতে পায়ে প্রচুর শক্তি, হৃদয় উদার। বাল্যকালে সাঁতার কাটায়, গাছে ওঠায়, ফুটবল খেলায়, দৌড় প্রতিযোগিতায় নারাণদা ছিলেন সবার চেয়ে পটু। সে জন্যে তিনি সঙ্গীদের পরম বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এইভাবে সবার প্রশংসা এবং আনুগত্য সহজেই লাভ ক'রে নেতৃত্ব করবার একটা স্বাভাবিক অধিকার তাঁর জন্মেছিল। নিজের কৃতিত্ব বিষয়ে নিরঙ্কুশ নিঃসন্দেহতা তাঁকে কিছু গর্বিত এবং অভিমানী ক'রে তুলেছিল, কিন্তু তাতে কারো কোনো লোকসানের কারণ ঘটে নি। তিনি ক্রমে একটু খোশামোদ-প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তাতেও কারো কোনো ক্ষতি হয় নি। খোশামোদ করলে তাঁকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করানো যেত, না করলে সে এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটত।

আমি বরাবর থাকতাম বিদেশে। তাঁর সম্পর্কে এর অধিকাংশ খবরই আমি

গ্রামের লোকদের কাছে পরে শুনেছি, আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় অতি অল্প দিনের। বিদেশ থেকে দুচার বছর কখনোসখনো অতি অল্প সময়ের জন্য দেশে যেতাম। দেশে গিয়ে সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতে পারতাম না, কারণ আমি কলকাতা শহরে থাকি ব'লে সবাই আমাকে খুব চালিয়াৎ কিংবা অহঙ্কারী মনে করত, কিংবা একটু বেশি রকম সম্ভ্রম ক'রে দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলত। আমার ভাষাই বোধ হয় প্রাণ খুলে মেশবার পক্ষে তাদের ছিল প্রধান বাধা। তারা শুধু ঐ জন্যই হয় তো আমাকে বিদেশী লোক মনে করত।

কিন্তু তবু একবার তারা আমারই শরণাপন্ন হল।

১৯৪৩ সাল। গ্রীষ্মের বন্ধে বহুদিন পরে দেশে গিয়েছিলাম। গ্রামের ফুটবল টীম এবার নানা জায়গায় ম্যাচ খেলবে, সেজন্য তারা তাদের টীমকে বিশেষভাবে শক্তিশালী করতে চায়। কয়েকজন আমার কাছে এসে প্রস্তাব করল, আচ্ছা, কলকাতা থেকে দুএকজন নামকরা খেলোয়াড় আনা যায় না?

আমি বললাম, কেন যাবে না? তবে তাদের যত্ন এবং আরামের জন্য যথেষ্ট খরচ করা চাই, নইলে আনা যাবে না।

খরচ করতে সবাই রাজি হল। কিন্তু তারা এ বিষয়ে একটি প্রকাণ্ড ভুল করল। এই প্রস্তাবটি তারা নারাণদাকে না জানিয়ে নিজেদের খেয়ালে করায় নারাণদা মর্মাহত হলেন। কিন্তু তিনি চুপ ক'রে রইলেন, কিছুই বললেন না। ওরা যে ইচ্ছে ক'রে এই অন্যায়টি করেছে তা নয়, নারাণদাকে বাদ দিয়ে সামান্য প্রস্তাবমাত্র করায় যে কোনো বিপদ ঘটতে পারে তা তারা ভাবেনি। নারাণদা চুপ ক'রে থাকাতে তারা আরও নিশ্চিন্ত হল।

কিন্তু ফল হল অতি মারাত্মক। খেলোয়াড় আনা হল, কিন্তু নারাণদা খেলার কোনো অনুষ্ঠানেই যোগ দিতে রাজি হলেন না। উপরন্তু তিনি বললেন, বাইরের কোনো খেলোয়াড় যদি তাদের টীমে খেলে তা হ'লে তিনি কাউকে ক্ষমা করবেন না।

কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব? সমস্ত জেলা জুড়ে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, কলকাতার দুজন বিখ্যাত খেলোয়াড় এসে যোগ দিয়েছে কপিলপুরের টীমে। তাদের শুধু দেখতেই সকাল সন্ধ্যা লোক আসছে দলে দলে। প্রথমে শত শত লোক, ক্রমশঃ হাজার হাজার বৃদ্ধ যুবক বালক স্ত্রীপুরুষ এসে ভেঙে পড়তে লাগল সেই গ্রামে—কলকাতার খেলোয়াড় কেমন তাই দেখতে। এখন তো কিছুতেই তাদের বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

নারাণদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি মুখে আর প্রতিবাদ না জানিয়ে হঠাৎ একেবারে অনশনব্রত শুরু ক'রে দিলেন।

ঘটনাটির গুরুত্ব প্রথমে কেউ ততটা উপলব্ধি করতে পারেনি, সবাই ভাবল, নারাণদা অভিমান করেছেন, পরে বুঝিয়ে সুজিয়ে সব ঠিক করা যাবে। আপাতত এ ছাড়া আর উপায় ছিল না—তিন চারটে জেলার লোক উদ্গ্রীব হয়ে আছে কপিলপুর টীমের খেলা দেখবার জন্য।

অতএব খেলা হল, গ্রামের নামও হল, লোকের কৌতূহল নিবৃত্ত হল, কিন্তু নারাণদা ব্রত ভঙ্গ করলেন না। তিনি প্রকাশ করলেন, বাইরের খেলোয়াড় এনে গ্রামের যে অসম্মান করা হয়েছে তার প্রতিবাদকল্পে তিনি আমরণ অনশন চালাবেন।

খেলার সকল উত্তেজনা যখন শেষ হয়ে গেল, তখন সবাই বুঝতে পারল নারাণদার সমস্যা অতি মারাত্মক।

একদিকে আরাকানে মিত্রপক্ষের মংড পরিত্যাগ, বাংলাদেশ বিপজ্জনক এলাকা ঘোষিত, মাথার উপর মিত্রপক্ষের স্পিট-ফায়ার এবং বি-২৯, অন্যদিকে নারাণদার অনশন।

দলে দলে লোক গিয়ে তাঁর পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে লাগল, কিন্তু তিনি অটল, অবিচলিত।

এক দিন এক দিন ক'রে দশ দিন কেটে গেছে, নারাণদা শুধু সোডা জল খেয়ে শয্যাসংলগ্ন হয়ে আছেন, কথা বলবার ক্ষমতা নেই অবস্থা এমনই শোচনীয়। গ্রামের মধ্যে এই উপলক্ষে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হল তা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। শেষে সমস্ত জেলায়। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিল সবাই একে একে তাঁকে বোঝাতে লাগল নানাভাবে, কিন্তু কোনো ফলই হল না। বাইরের লোক যারা শুনল তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল, নারাণদাকে তারা কেউ চেনে না।

গ্রামের প্রবীণ লোকেরা বললেন, তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য মূল্যবান জীবন কি এভাবে নষ্ট করা উচিত? নবীনেরা আবার এসে বলল, আমাদের এবারের মতো ক্ষমা ক'রে আমাদের সংশোধনের সুযোগ দাও নারাণদা, তুমিই যে আমাদের সব।

নারাণদা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাদের দিকে, তারপর মৃদুভাবে মাথা নেড়ে জানালেন, হবে না।

ডাক্তার এসে কিছু বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা করলেন কিন্তু ব্যর্থ হল তাঁর চেষ্টা।

একটা আদর্শের জন্য এ রকম মহৎ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে আমি আর নিজের চোখে দেখি নি, কিন্তু কি ক'রে তাঁকে বাঁচানো যায় সে প্রশ্ন আমাকে একটু বেশি রকম চঞ্চল ক'রে তুলল—আমার মনে হল যেন এর জন্য আমিই সব চেয়ে বেশি দায়ী, কারণ আমিই কলকাতা থেকে খেলোয়াড়দের এনেছিলাম।

উপায় চিন্তা করতে লাগলাম। এদিকে যুদ্ধের দরুন দেশের অবস্থা দ্রুত শোচনীয় হয়ে উঠছে। একদিকে চলছে বিশ্বযুদ্ধ, অন্যদিকে চলছে সাধারণ মানুষের জীবন যুদ্ধ। এর মধ্যেই কর্তব্য স্থির করতে হবে, নারাণদাকে বাঁচাতে হবে। অনশনের বিংশতি দিন অতিবাহিত হতে চলল, আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না।

এমন সময় শোনা গেল কপিলপুরের কাছাকাছি মহকুমা শহরে সুবিখ্যাত দেশকর্মী সর্বদলসমন্বয়কারী শ্রীযুক্ত বিশ্বপ্রেম শর্মা এসেছেন দেশের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে।

আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। গিয়ে সব বুঝিয়ে বললাম। তিনিও উপলব্ধি করলেন এই মহৎ প্রাণকে তিনি ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমি তাঁকে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে এলাম কপিলপুর গ্রামে।

আশ্চর্য ক্ষমতা এই বিশ্বপ্রেম শর্মার! তিনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা-বলে নারাণদাকে সম্মোহিত করতে লাগলেন। তাঁকে বললেন, দেশের দুর্দিনে তোমার মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তির জরুরি প্রয়োজন আছে। গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে, জেলার সীমা ছাড়িয়ে, তোমার কর্মক্ষেত্র পড়ে আছে সমস্ত ভারতবর্ষে। অল্প পরিসরের মধ্যে তুমি নিজেকে জানতে পার নি, দাঁড়াও এসে সমস্ত ভারতবর্ষের পটভূমিকায়, দেখ নিজের বিরাট রূপ অনুভব কর তোমার প্রচণ্ড শক্তি, বিস্তার কর তোমার দৃষ্টি আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী। ওঠ, জাগ, খাও—বন্দেমাতরম্, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আল্লা হো আকবর।

মন্ত্রের কাজ হল এ কথায়। নারাণদা শীর্ণ দুর্বল হাতখানা তুলে দেশকে নমস্কার জানালেন

ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরীক্ষা ক'রে বললেন, একটু একটু ক'রে এখন থেকে তরল খাদ্য খাইয়ে যেতে হবে, ভাত খেতে মাস খানেক লাগবে।

একটু একটু ক'রে নারাণদার দুর্বলতা কাটতে লাগল। আমিও কলকাতা ফিরে এলাম নিশ্চিন্ত মনে। ইতিমধ্যে আমার কলেজও খুলে গেছে। ভাবলাম

মাসখানেক পরে গিয়ে অন্ন গ্রহণের পর তাঁর সুস্থ অবস্থাটা একবার গিয়ে দেখে আসব।

কিন্তু কলকাতা ফিরে দুচার দিনের মধ্যে এমন এক ভয়াবহ ব্যাপার দেখতে হবে তা ভাবতেই পারিনি। দুর্ভিক্ষ লেগেছে দেশে। পঞ্চাশের মন্বন্তর। স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার নেই যে সে রকম নিষ্ঠুর মর্মান্তিক দৃশ্য এই দুর্ভাগা দেশেও কখনো ঘটেনি। ১৬ অগস্টের দাঙ্গায় যে এত বড় হত্যালীলার অনুষ্ঠান ঘটে গেল, তার চেয়ে সেই দুর্ভিক্ষ-দৃশ্য শতগুণে বেশি মর্মান্তিক। গ্রামের হাজার হাজার পরিবার শহরের পাষাণে এসে মাথা ঠুকছে একটু ফেন খেতে পাবার আশায়। খেতে পায়নি, মরেছে ধীরে ধীরে—একটু একটু ক'রে। নীরবে।

এ সব দেখেশুনে মনের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। এই বিরাট ব্যাপক অসহায় মৃত্যুদৃশ্যের কাছে নারাণদা তুচ্ছ হয়ে গেলেন। তবু দেশে যেতে হল অন্তত একদিনের জন্য নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কেননা কর্তব্যের তাগিদ ছিল।

গ্রামে পা দিয়ে দেখি চার দিক ছম ছম করছে। মানুষ নেই। পথে নিশ্চিন্ত মনে শেয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রামের মানুষ কোথায় গেছে বুঝতে দেরি হল না। অনেক্ষণ পরে একটি শীর্ণ লোকের সঙ্গে দেখা। তার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম নারাণদার খবর। সে বলল, তাঁর তো সৎকার হয়ে গেছে।

স্তম্ভিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কি? তার কাছে যা জানতে পারলাম, তা এই—

আজই সকালে তিনি সরু চালের ভাত খাবেন এই রকম কথা ছিল। কিন্তু গত তিন দিন ধ'রে চেষ্টা ক'রেও কোথায়ও সরু চাল সংগ্রহ করা যায় নি। চালই নেই কারো ঘরে। 'দুএক মুষ্টি যার ঘরে আছে সে তা ছাড়তে রাজি নয়। একেই বলে অদৃষ্ট, লোকটি বলতে লাগল, এত চেষ্টা ক'রে ভাত খাওয়ানোয় রাজি করা গেল, কিন্তু অন্ন গ্রহণের দিন দেশে হাহাকার পড়ে গেছে, কারো ঘরে অন্ন নেই। নারাণদা দেশের এই দুরবস্থার কথা শুনে 'শক' পেয়ে মারা গেছেন—আমরা অতি কষ্টে তাঁর সৎকার করেছি আজ সকালেই।

শুনে একটি কথাও আর উচ্চারণ করতে পারলাম না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্টেশনেই ফিরে এলাম।

(১৯৪৬)

ক্যা হুয়া

পাড়াগাঁয়ে গিয়েছিলাম একদিন। শহর থেকে দূরে, রেল-স্টেশন থেকে আরও দূরে সেই গ্রাম। জঙ্গলে ভরা। দু-চার ঘর মানুষ যারা আছে, তারা কোনো রকমে বেঁচে আছে মাত্র। তাদের এক-একটা বাড়ি যেন এক-একটা ঝোপ। সন্ধ্যাবেলা বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, সে গাঁয়ে মানুষ কেউ থাকে না—যেন সব মিলিয়ে মস্ত বড একটা বন।

এমন পাডাগাঁ কে না দেখেছে? এখন তো পাড়াগাঁ মানেই বন। সব পল্লীগ্রামেরই নাম বনগ্রাম!

কিন্তু আমি সেই গাঁয়ে গিয়ে এমন এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখেছি, যা না দেখলেই হয়তো ভাল হত! বিশেষ একটা কাজে সেখানে একটা বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম। বাড়ির একটি লোক তখন সবে ভাত-খাওয়া শেষ ক'রে উঠেছে। দেখলাম, ওঠবার সময় সে গোটাকত মাছের কাঁটা হাতে ক'রে মুখ ধোবার জায়গায় রেখে "তু—" বলে ডাকতেই একটা রোগা কুকুর ছুটে এলো সেদিকে। কিন্তু কি আশ্চর্য! কুকুর সেই কাঁটায় মুখ দেবার আগেই একটা মোটা শেয়াল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে সেই কাঁটা খেতে লাগল, আর কুকুরটা ভয়ে সেখান থেকে সরে এসে কাতর ভাবে তার দিকে চেয়ে রইল।

একদিন ছিল, যখন গাঁয়ের কুকুর দেখলে শেয়াল ভয়ে পালিয়ে যেত। এখন তাদের আর সেদিন সেই। এখন কুকুরের চেয়ে শেয়ালের তেজ বেশি। যারা পাড়াগাঁয়ে থাকে, তারা এটা নিশ্চয় দেখে থাকবে।

আমার চোখে ব্যাপারটা বড়ই নতুন বলে বোধ হল। অবাক হয়ে গেলাম দেখে। অবাক না হয়ে উপায় কি? বিড়াল যদি ইঁদুর দেখে ভয় পায়, বাঘ যদি হরিণ দেখে ভয় পায়, তাহ'লে অবাক হবে না কে?

গাঁয়ের লোকেরা অবশ্য এ ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। তারা জানে, কলিকালে সব উল্টে যাবেই। মানুষই এখন আর মানুষ নেই, অমানুষ হয়ে গেছে।

আমি কিন্তু এত বড় অন্যায়টা চুপ ক'রে মেনে নিতে পারলাম না। প্রথমে হঠাৎ মনে হয়েছিল, ভুল দেখছি না তো? তারপর ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, ভুল নয়; ঠিকই দেখছি। খুব রাগ হল শেয়ালের উপর। কাছেই একখানা লাঠি পড়ে ছিল, সেইখানা হাতে নিয়ে গেলাম এগিয়ে শেয়ালের দিকে।

শেয়াল এর মধ্যে খাওয়া শেষ ক'রে ফেলেছে। সামান্য ক'খানা কাঁটা এক মিনিটও লাগে না খেতে।

আমাকে দেখে শেয়াল বলে উঠল, "মারবে নাকি ?"

চমকে উঠলাম তার মুখে মানুষের কথা শুনে। হাত থেকে লাঠি আপনা হতেই পড়ে গেল, কিন্তু তখনই ভেবে দেখলাম, চমকালে চলবে না এখন, শেয়ালের সঙ্গে আলাপ ক'রেই দেখা যাক কি ব্যাপার। বললাম, "না মারব না, কিন্তু আমাকে জানতে হবে তুমি কে, এবং কুকুর তোমাকে দেখে ভয় পায় কেন।"

শেয়াল বলল, "জানতে চাও আপত্তি নেই, কিন্তু এখানে কিছুই বলব না। আমার সঙ্গে আমার রাজ্যে চল, তাহ'লেই সব জানতে পারবে। ভয় নেই, রাজ্য দূরে নয়, এই জঙ্গলের ভিতরেই।"

বললাম, "চল।"

জঙ্গলের ভিতর নানা রকমের কাঁটা-গাছ, বেতের ঝাড়, বাঁশ-ঝাড়, আরও কত রকম ছোট বড় গাছ। ঠেলেঠুলে চলতে চলতে জামা ছিঁড়ে গেল, হাত-পা ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

আমাদের সাড়া পেয়ে অনেক শেয়ালের মাথা জেগে উঠল গর্তের ভিতর থেকে, কিন্তু আমি শেয়ালের সঙ্গে আছি দেখে আবার তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। বোঝা গেল, যার সঙ্গে এসেছি, সে ওদের মোড়ল।

মোড়ল আমাকে একখানা কাঠ দেখিয়ে বলল, "বস ঐখানে।" তারপর জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি জানতে চাও, বল।"

আমি আমার আগের প্রশ্নটাই জিজ্ঞাসা করলাম।

মোড়ল লেজটা একটু চুলকিয়ে নিয়ে বলল, "দেশী কুকুর আমরা পছন্দ করি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন ? এখন তো আমরা স্বাধীন হয়েছি, এখন তো বিদেশী বর্জন আর স্বদেশী-গ্রহণই আমাদের নীতি হওয়া উচিত। এখন বিদেশী কুকুর তাড়িয়ে দেশী কুকুরকে আদর করব।"

মোড়ল বলল, "দেশী কুকুর সব ক্রীতদাস, ওরা অতি ইতর, একমুঠো খাদ্যের জন্য মনিবের পা চাটে।"

আমি বললাম, "কেন বিলিতি কুকুরও তো তাই।"

মোড়ল বলল, "ঠিক তা নয়। বিলিতি কুকুর হচ্ছে জমিদার। তাকে কিছুই করতে হয় না, সে বসে বসে অন্যের উপার্জনের অংশ ভোগ করে।"

আমি বললাম, "তাহ'লে তো সব কুকুরই খারাপ। আর তা যদি হয়, তবে দেশী কুকুরকে এরূপ শাস্তি দিচ্ছ কেন ?"

মোড়ল শেয়াল আমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। শেষে বলল, "শাস্তি দিচ্ছি কেন সত্যি যদি শুনতে চাও, তাহ'লে বলি, রেগো না শুনে। এই কুকুরগুলো নেহাৎ বাঙালী কুকুর বলেই—"

কথাটা শেষ হবার আগেই আমি দপ ক'রে জ্বলে উঠলাম। চিৎকার ক'রে বললাম, "চোপরাও, হতভাগা,—লাঠির ঘায়ে মাথা গুঁড়ো ক'রে দেব—তুমি বাঙালীকে ঘৃণা কর"—ব'লে একখানা শুকনো ডাল হাতে তুলে নিলাম।

মোড়ল আমার হাতে লাঠি দেখে চিৎকার ক'রে উঠল, "ক্যা হুয়া—"

সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের সকল দিক থেকে 'ক্যা-ক্যা হুয়া' ধ্বনিত হয়ে উঠল। বেরিয়ে এলো প্রায় দুশো শেয়াল।

মোড়ল বলল, "লাঠি নামাও, দেখছ না আমাদের একতা ?"

না দেখে উপায় ছিল না। দেখলাম এবং মুগ্ধ হলাম। বললাম, "এই একতা তোমাদের কি ক'রে হল ?"

মোড়ল বলল, "আমাদের ভাষা লক্ষ্য করছ না ? 'ক্যা হুয়া' কোন্ ভাষা ?

প্রশ্ন শুনেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এরা সবাই রাষ্ট্র ভাষায় কথা বলে, স্বাধীন ভাবতে ওদের একতাও যেমন সত্য, জোরও তেমন সত্য। জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহ'লে বাঙালী শেয়াল বলে কেউ নেই ?"

মোড়ল হেসে বলল, "আছে দু'চারটে। দেখবে তাদের ? কিন্তু তারা আমাদের দেখে একটু ভয় পায়। পড়ে আছে ঐদিকে কয়েকটা, তুমি ঐদিকটায় গেলেই তাদের দেখতে পাবে।"

আমি এগিয়ে গেলাম সেদিকে। দেখি ওদের সবাই বসে বসে আড্ডা মারছে। আমাকে দেখেই বলে উঠল, "কি হল কি হল –"

একেবারে 'ক্যা হুয়া'র বাঙলা। বুঝলাম বাঙালী শেয়াল বটে। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরাই কি বাঙালী শেয়াল ?"

আমার কথা শুনে ওরা তো মহা খাপ্পা। একজন দাঁত বের ক'রে বলল, "শেয়াল বলছ কাকে ?"

বুঝলাম শেয়াল বলতে দুঃখ পেয়েছে বোধ হয়। শেয়াল তো তাচ্ছিল্যের ভাষা, তাই শুধরে নিয়ে বললাম, "বাঙালী শৃগাল ?"

'শৃগাল' শুনে ওরা খুব খুশি হল। বলল, "হাঁ, এমনি সম্মান রেখে কথা

বলবে। কিন্তু লেখার সময় 'শৃগাল' লিখ না, লিখবে 'শ্রীগাল'। এই 'শ্রীগাল'ও বেশিদিন থাকবে না, বোধ হয় 'গালশ্রী' নামটাই আমরা চালাব।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন ?"

একজন বলল, "তোমরা অঙ্গশ্রী বঙ্গশ্রী, রঙ্গশ্রী করতে পার, আমরা গালশ্রী করব না কেন ? আমরাও বাঙালী—অনুকরণ করাই আমাদের স্বভাব।"

আমি বললাম, "ভুলে গিয়েছিলাম যে তোমরা বাঙালী শেয়াল।"

সঙ্গে সঙ্গে একজন ব'লে উঠল, "আবার ভুল করছ ? শেয়াল নয়—শৃগাল।"

আর একজন বলল, "যাও যাও, এখন বিরক্ত ক'রো না, আমরা এখন শুয়ে শুয়ে একটু লেজ নাড়ব, তোমার সঙ্গে বকতে ভাল লাগছে না।

আমারও আর ওখানে থাকতে ভাল লাগছিল না। ওখান থেকে একেবারে সোজা বেরিয়ে এলাম বাইরে। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, কারণ মনে হল যেন আড্ডাবাজ নিষ্কর্মা বাঙালী মানুষেরই চেহারা দেখলাম ওদের মধ্যে।

এমন সময় সমস্ত বন ধ্বনিত ক'রে রব উঠল, 'ক্যা হুয়া।'

মনে মনে বললাম, "নতুন আর কি হবে ? যা হবার, তা বহু আগে থেকেই হয়ে আছে !"

(১৯৫২)

আধাভৌতিক

যুদ্ধের সময় যখন জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতা শহরের অর্ধেক লোক ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, সেই সময়ের একটি কাহিনী।

আমিও তখন জনগণকে অনুসরণ ক'রে পরিবারবর্গ বাইরে পাঠিয়ে বাড়িতে একা আছি এবং উদাস মনে অবসর সময়ে স্পিরিচুয়ালিজম অধ্যয়ন করছি। মানুষের মৃত্যুর পর তার সূক্ষ্ম আত্মা কি ভাবে আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে সেই সব কথা যতই পড়ছি ততই আমার সময়ের ওজন কমে যাচ্ছে, একাকিত্বের অসুবিধাও বিশেষ অনুভব করছি না। তবে রাত্রে মাঝে মাঝে কেমন যেন গা ছম ছম ক'রে ওঠে। বাড়িতে পুরুষ ব্যক্তি আরও দু একজন যারা আছে তারা বয়ঃকনিষ্ঠ ব'লে তাদের কাছে এ সম্পর্কে একটি কথাও প্রকাশ করিনি, কারণ একটা নির্দিষ্ট বয়সের আগে স্পিরিচুয়ালিজমে কারও বিশ্বাস আসে না বলেই আমার বিশ্বাস।

মানুষের সূক্ষ্ম আত্মা মানুষেরই মতো দেখতে, কিন্তু যেন একটি খোসা, শাঁস নেই, একটি আত্মিক খোসা, ধরা ছোঁয়া যায় না, কিন্তু দেখা যায়। এরই নাম হচ্ছে এক্টোপ্লাজম। এই সূক্ষ্ম দেহতত্ত্ব যে শুধু আমি চর্চা করেছি তাই নয়, বন্ধু বান্ধবদের কাছেও এর কিছু কিছু ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের ঠিক মতো বোঝাতে পারছি না। তারা তাদের প্রত্যক্ষ স্থূল দেহ নিয়েই ব্যস্ত, সূক্ষ্ম দেহ বিষয়ে তাদের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা যায় না।

এমনি অবস্থায় উত্তর কলকাতাবাসী আমার কাছে এলো এক চিঠি, বালিগঞ্জ থেকে। এক বন্ধু লিখেছে, তার বাড়িতে নাকি এক ভৌতিক কাণ্ড ঘটেছে, তারই ব্যাখ্যা সে আমার কাছে শুনতে চায়।

বলা বাহুল্য, সেই দিনই সন্ধ্যায় আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম।

কালটা ছিল কালবোশেখীর। আমি যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। ধরেই নিলাম রাতটা ওখানেই কাটাতে হবে। বন্ধু অবস্থা বুঝে ঠাকুরকে খিচুড়ির আদেশ দিলেন। আরও ভাল লাগল। কেবল ভয় হচ্ছিল বৃষ্টিটা হঠাৎ থেমে না যায়।

না—বৃষ্টি থামবে না। হাওয়ার বেগ বেশ প্রবল, বৃষ্টির বর্ষণও খুব জোরালো।—এমনি অবস্থায় মন অকারণ একটা আনন্দ মিশ্রিত বেদনায় ভারী হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষে কোনো মনস্তত্ত্ব প্রচার করব না কিন্তু এই অতি

পরিচিত কথাটির পুনরাবৃত্তি ক'রে একবার মাত্র বলে রাখি যে এই রকম বর্ষামুখর আবহাওয়ায় বহু সত্য মিথ্যা, এবং বহু মিথ্যা সত্যের রূপ ধরে অতি সহজেই।

একটা বিমূঢ় ভাব মনের মধ্যে তখন সত্যই জেগেছিল। ভয় হল এই যে, বন্ধু এই রকম আবহাওয়ার প্রভাবে তার ভৌতিক অভিজ্ঞতার কাহিনীতে অকারণ রহস্যের রং চড়িয়ে অতিরিক্ত বাড়িয়ে না ফেলে। বন্ধু বলল, শোন।

কিন্তু ঠিক এমনি সময় পাড়ার আর এক ভদ্রলোক রেন-কোটে গা ঢেকে এসে হাজির হ'লেন সেখানে। সময় কারোই কাটছে না। সবাই পরিবার বাইরে পাঠিয়ে হাল্কা হয়ে বসে আছে, জাপানীরা ডায়মণ্ড হারবারে এসে নামলেই 'একলা চল রে' গাইতে গাইতে নিশ্চিন্ত মনে পালিয়ে যাওয়া যাবে।

আগন্তুকের সঙ্গে পরিচয় হল, নাম প্রফুল্লবাবু, বেশ আলাপী এবং অমায়িক। আমরা দুজনে তখন বন্ধুর ভৌতিক কাহিনী শোনার জন্যে প্রস্তুত হলাম। জমে বসলাম সবাই কাছাকাছি।

বন্ধু বলতে লাগল, গভীর রাত্রে ঘুমের মধ্যে কে তার গলা টিপে ধরেছিল। সে স্পষ্ট অনুভব করেছে তার স্পর্শ। চিৎকার ক'রে উঠেছে 'কে কে' ব'লে। জেগে দেখে জানালা খোলা। ঘরে কেউ নেই। কাঁপতে কাঁপতে উঠে আলো জ্বেলে দেখে দরজা বন্ধই আছে। তার স্পষ্ট মনে আছে শোবার আগে জানালা বন্ধ ক'রে শুয়েছিল বৃষ্টির ছাট আসবে ভয়ে। এই অদ্ভুত ব্যাপারটির কোনো অর্থই সে বুঝতে পারছে না। সেই থেকে সমস্ত রাত আলো জ্বেলে শুচ্ছে এবং তবু ভাল ক'রে ঘুমোতে পারছে না, কি জানি কখন কে এসে গলা টিপে ধরবে।

আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম সব। কিন্তু ভূতের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হল না। মনে হল ওটা শুধু একটি স্বপ্নের ব্যাপার। এবং অতি সাধারণ ঘটনা, অনেকেরই এ রকম হয়ে থাকে। জানালা হাওয়াতে খুলে যাওয়া বিচিত্র নয়। তাছাড়া সূক্ষ্ম দেহ কারো কোনো অনিষ্ট এ ভাবে করে না।

প্রফুল্লবাবু তো এ কাহিনী এক কথায় হেসে উড়িয়ে দিলেন। বন্ধু তাতে একটু নিরাশ হলেও মনে মনে হয় তো আরামই অনুভব করল। আমিও নিরাশ হলাম কম নয়। কারণ সূক্ষ্ম দেহতত্ত্ব শুধু বইতেই পড়ে আসছি, এ সম্বন্ধে নিজের কোনো অভিজ্ঞতা লাভ হয় নি, তাই আশা করেছিলাম বন্ধুর অভিজ্ঞতাটাও যদি সত্যি কোনো এক্টোপ্লাজম সম্পর্কে হত তা হ'লে অবিলম্বে সূক্ষ্ম দেহের অস্তিত্বে বিশ্বাসীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে নিতে পারতাম।

প্রফুল্লবাবু বললেন, "ভূতের কাহিনী শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসিনি, তাই হঠাৎ তোমার ভূতের গল্পে আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কারণ জানতাম এ অভিজ্ঞতা সহজে কারো হয় না। কিন্তু আসরটা যখন ভূতের গল্প পলক্ষেই বসেছে তখন আমার একটা গল্প শুনতে পার।"

"এ অতি উত্তম প্রস্তাব," বলে আমি আমার মন থেকে সমস্ত নৈরাশ্য এক মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। বুঝতে পারলাম এইবার ঠিক জমবে। প্রফুল্লবাবুকে দেখেই মনে হয়েছিল নিশ্চয় ইনি শিল্পীলোক, তারপর কথা শুনে বুঝেছিলাম ইনি পাকা শিল্পী। অতএব আবার জমে বসলাম তাঁর কাহিনী শোনার জন্য।

প্রফুল্লবাবু বলতে লাগলেন, "সে আজ সাত বছর আগেকার কথা। কালিঘাটের একটি বাড়িতে থাকি। বি-এ পাস করেছি সেই বছরেই। সে এমন একটা বয়স যখন ভূত দূরের কথা, বিশ্বাস কোনো বস্তুতেই থাকে না। সকল শ্রদ্ধেয় বস্তু এবং বিশ্বাসকে তর্কের জোরে উড়িয়ে দিয়ে তখন একটা দায়িত্বহীন এলোমেলো হাওয়ার মতো ছুটে বেড়ানোর অবস্থা। অথচ ঠিক সেই সময়েই আমাকে ভূতে বিশ্বাস করতে হল। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

"এর কিছুদিন আগে থেকেই মনের মধ্যে একটা অহেতুক আত্মিক স্ফীতি অনুভব করছিলাম, একটা লক্ষ্যহীন বস্তু-সহীন উচ্ছ্বাস। মানুষের মতো চেহারা অথচ অবাস্তব, ছায়ার মতো দেখা দেয় আবার মিলিয়ে যায়, তাকেই বলা হয় ভূত বা উচ্ছ্বাস। এই ভূত কেমন ক'রে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল, শোন।"

মাত্র এইটুকু শুনেই আমি বুঝতে পারলাম প্রফুল্লবাবু এক্টোপ্লাজম-এর জন্মকথা থেকে শুরু করেছেন। মিথ্যা গাডমটকানো ভূতের গল্প শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়েছি এতকাল, তাই আজ যথার্থ একটি সূক্ষ্মাত্মার কাহিনী শুরু হতেই আমার মন খুব আশান্বিত হয়ে উঠল, মনে মনে নিজের সৌভাগ্যকেই ধন্যবাদ দিলাম।

প্রফুল্লবাবু বলতে লাগলেন, "একদিন সন্ধ্যার পর ঘরে বসে দরজা বন্ধ ক'রে একখানা বইতে জোর ক'রে মন বসাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে সেদিনও বাইরের জগতের এক এলোমেলো হাওয়া প্রবেশ ক'রে আমার সমস্ত মনোযোগ নষ্ট ক'রে দিল। সে এক অতি রোমাঞ্চকর হাওয়া। সে হাওয়ায় কখনও তীব্র বেদনা, কখনও তীব্র আনন্দ। যেন আমারই পাশে

কোনো অশরীরী মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে, যেন সে আমারই মনের প্রতিফলিত এক মূর্তি। তাকে দেখা যায় না, তাকে স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু তার আবির্ভাব আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে আমি অনুভব করি, তার গায়ের একটা সুস্নিগ্ধ গন্ধ সমস্ত ঘরকে উতলা ক'রে তোলে। দিনের পর দিন চলেছে এই পাগল করা অদৃশ্য মূর্তির আবির্ভাব। তাই সেদিন ভেবেছিলাম এই প্রভাব যেমন ক'রে হোক কাটাতে হবে। ভেবেছিলাম সমস্ত মনোযোগ ঘনীভূত করব বইয়ের পাতায়, বইয়ের কথার মধ্যে একেবারে ডুবে যাব। কিন্তু হল না। আমার মন আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

"আমি যে সেই অশরীরীর প্রভাব কাটাতে পারলাম না তাই নয়, সে দিন সেই অনুভূতি আরও বেশি প্রবল হয়ে উঠল। আমি স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে দেখি সে আর অশরীরী নয়, স্পষ্ট রূপ গ্রহণ ক'রে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। সে আমাকে ইঙ্গিত করছে বেরিয়ে যেতে। আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি তখন লুপ্ত, আমি স্বপ্নের মতো, মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকে অনুসরণ করলাম। কতক্ষণ অনুসরণ করেছি মনে নেই, সেও কখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে জানি না। কিন্তু যখন খেয়াল হল তখন দেখি পথের ধারে একটা আলোর কাছে একটা বাড়ির রকে বসে আছি সম্মুখের বাড়িটির দিকে চেয়ে। লজ্জিতভাবে সেখান থেকে উঠে পড়লাম। নিজেকেই বার বার প্রশ্ন করলাম, এর মানে কি?

"কিন্তু আমার বুদ্ধি নীরব। উদাসভাবে বাড়িতে ফিরে দেখি অন্তত একটি ঘণ্টা সেইখানে কাটিয়েছি। বুঝতে পারলাম একটি বিপদ ঘনিয়ে আসছে। যথেষ্ট সতর্ক হলাম, কিন্তু সব বৃথা কারণ সে আমার সমস্ত স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে আঘাত হেনেছে, মস্তিষ্কের ধূসর কেন্দ্রকে দখল করেছে। এর পর থেকে তাই সে প্রতিদিন আমাকে ঘরছাড়া করতে লাগল অতি লজ্জাজনকভাবে, অতি অভদ্রভাবে।"

প্রফুল্লবাবু একটু খানি থেমে চোখ বুজলেন। মনে হল তিনি ক্ষণকালের জন্য সেই রোমাঞ্চকর স্মৃতির মধ্যে একটু খানি ডুব দিয়ে নিচ্ছেন। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, নিচে থেকে আসছে খিচুড়ির গন্ধ। এই উদাস করা শব্দ আর গন্ধের পরিবেশে প্রফুল্লবাবুর উক্ত আমাদেরও মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে লাগল।

আমি প্রায় আপন মনেই বললাম, "এ তো স্পষ্ট এক্টোপ্লাজম-এর ব্যাপার।" জিজ্ঞাসা করলাম "তারপর?"

প্রফুল্লবাবু যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে বললেন, "তারপর?—তারপর অবস্থা আরও খারাপ। আমার জীবনে সে দিন প্রথম অধঃপতনের অনুভূতি।

মনের আচ্ছন্ন অবস্থায় যা করি—আচ্ছন্ন ভাবটা কেঁটে গেলে তখন বুঝতে পারি কি করছি। অথচ বাইরে থেকে দেখতে গেলে আমিই তো দায়ী আমার সব কাজের জন্য? কিন্তু এ কথা আমি কাকে বোঝাব? খুলেই বলি, একদিন আবিষ্কার করলাম বেলা দশটার সময় আমি মেয়েদের কলেজের সম্মুখে বসে আছি! এক বন্ধুর ডাকে সেদিন আমার খেয়াল হল। বুঝলাম এক গুরুতর সঙ্কটের দিকে ছুটে চলেছি। এর পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য। মনে করবেন না যে এটি এক দিনের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আমি বুঝতে পারলাম তিনমাস ধ'রে আমি এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ক'রে চলেছি। কখনও দেখি আমি সেই বাড়িটির সম্মুখে, আবার কখনও দেখি সেই কলেজের সম্মুখে হাঁ ক'রে চেয়ে আছি। এ কথা না পারলাম আমি কাউকে বলতে, না পারলাম এই মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। বুঝতেই পারছেন আমি মনের দিক দিয়ে এবং দেহের দিক দিয়ে কি রকম বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম অল্পদিনের মধ্যেই।"

প্রফুল্লবাবু আবার একটুখানি থামলেন।

আমি বলিলাম, "থামবেন না প্রফুল্লবাবু, আমি পরে সব ব্যাখ্যা ক'রে দেব—এ বিশুদ্ধ এক্টোপ্লাজম-এর ব্যাপার।"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "সে বোধ হয় আপনি পারবেন না। কারণ গোড়া থেকে এই সূক্ষ্ম দেহ একটা অভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ ক'রে চলেছে। অদৃশ্য অনুভূতি ক্রমশ দৃশ্য হয়েছে অথচ তা এখনও সম্পূর্ণ অবাস্তব। কিন্তু তার আগে আমার দিকটাই একটু দেখুন। কারণ এর পর নিজেরই সঙ্গে আমার এক জীবন-মরণ লড়াই শুরু হল, প্রতিজ্ঞা করলাম হয় সে জিতবে আর না হয় আমি জিতব, এভাবে টানাটানির অবস্থা কিছুতেই আর বেশিদিন চলতে দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু হায়, আজও আমি মুক্তি পাইনি পুরোপুরি।"

আমি বললাম "বলেন কি! মানে, এখনও সে আপনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে?"

"এখনও, এবং এই মুহূর্তেও।"

কথাটা শুনে ভয়ে আমার সকল গা কণ্টকিত হয়ে উঠল। প্রফুল্লবাবু তা হলে এক্টোপ্লাজম্ সুদ্ধই আমাদের কাছে বসে আছেন! কি ভয়ানক কথা! প্রফুল্লবাবুর দিকে সবিস্ময়ে সভয়ে চেয়ে রইলাম। ক্রমে মনে হল যেন তিনি নিজেই ভূতের জগৎ থেকে সদ্য নেমে এসেছেন আমাদের সম্মুখে। হয় তো সবটাই ভৌতিক ব্যাপার। হয় তো প্রফুল্লবাবু স্বয়ং এক্টোপ্লাজম্। আমি বার বার তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত লক্ষ্য করতে লাগলাম কোথাও কোন স্বচ্ছ অংশ

আছে কি না দেখতে। আমার হাত পায়ের জোর কমে এলো, কথাও বলতে পারলাম না একটি।

ইতিমধ্যে আমার বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার বল তো? কিছুই তো বুঝতে পারছি না?"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "সব বলতে গেলে যে আমার জীবন ইতিহাসের একটি গোপনীয় অধ্যায় প্রকাশ করতে হয়।"

"তা হোক, কিন্তু এখানে কোনো মতেই গল্প থামতে পারে না।"

প্রফুল্লবাবু একটু ইতস্ততঃ ক'রে শেষ বললেন "আচ্ছা শোন। কথাটা হচ্ছে এই যে ভূতের রাজ্যেও দেওয়া-নেওয়া সম্পর্ক আছে, নইলে শুধু দিতে হলে কেউ বাঁচত না। অর্থাৎ যে পরিচয়হীন আকর্ষণ ছিল শুধু আমারই দিকে, সেই আকর্ষণকে অনেক অর্থ এবং কৌশল ব্যয়ে অপর দিকেও বিস্তার ক'রে দিলাম।

আমার মনের বল এতক্ষণে অনেকটা ফিরে এসেছে। আমি এইখানে একটি কথা না বলে থাকতে পারলাম না। বললাম, "এক্টোপ্লাজম সম্পর্কে এ একটা সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কার যে পয়সা খরচ ক'রে তার প্রভাবকে নিউট্রালাইজ করা যায়! আমি কিন্তু কোথায়ও এ রকম পাইনি। আপনি কি স্পিরিচুয়ালিস্টদের কাছে খবরটা পাঠিয়েছেন?—"

"না, পাঠাবার দরকার হয়নি।" প্রফুল্লবাবু বললেন।

"এক্টোপ্লাজম যে আকর্ষণে আপনাকে টানছে, পয়সা খরচ ক'রে তাকে আপনি টানতে পারলেন, এটা কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে আমার কাছে অসম্ভব বলেই মনে হয়—ওটা আত্মিক খোসা কি না—টানাটানিটা ওকে নিয়ে ঠিক"—

বন্ধু অধীর ভাবে বলে উঠল, "ওসব কথা থাক, আর রহস্য বাড়িও না, কি করলে খুলে বল।"

আমাদের সকল উৎসাহের বেলুনে পিন ফুটিয়ে, সকল এক্টোপ্লাজম ভেঙে দিয়ে, খিচুড়ির স্বাদ বিস্বাদ ক'রে, বর্ষারাত্রির সমস্ত রহস্যটি নষ্ট ক'রে দিয়ে প্রফুল্লবাবু সংক্ষেপে বললেন, "তাকে বিয়ে করলাম।"

বন্ধু ক্ষিপ্তবৎ চিৎকার ক'রে বলে উঠল, "এ কি ব্যাপার?" একটা প্রেমের গল্পকে ভূতের গল্প বলে চালাচ্ছিলে?"

প্রফুল্লবাবু বললেন "আমার কাছে ও দুটো একই।"

(১৯৪৬)

মৃত্যুভয়

জীবনটাকে অতি সহজ ভাবেই লইয়াছি। ক্ষুধা অনুভব করিলে প্রচুর আহার করি, হাসি পাইলে হাসি, কান্না অনিবার্য হইলে প্রাণ খুলিয়া কাঁদি। অবশ্য, ইহা ছাড়া আরও ঘটনা আছে।

কিন্তু অন্য কিছু বলিবাব পূর্বে আমার কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। গত পাঁচ বৎসরে আমার তিনটি স্ত্রী মারা গিয়াছে। মৃত্যু সর্বদাই দুঃখের, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সুখের বিষয় এই যে বিবাহগুলি একসঙ্গে করি নাই, পর পর করিয়াছি। তাহা ছাড়া আর একটি সান্ত্বনার কারণ ঘটিয়াছিল এই যে বহু-মৃত্যুজনিত দুঃখ দূর কবিবাব জন্য আমি কালবিলম্ব না করিয়া চতুর্থবার বিবাহ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলাম।

এইখানে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে একটি অবান্তর কথা বলিতে হইল। বুদ্ধদেব জরা, মৃত্যু প্রভৃতি মানবজীবনের যাবতীয় অভিসম্পাত যৌবন বয়সে হঠাৎ দেখিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা আধুনিক পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মত এই যে বুদ্ধদেব বহু পূর্ব হইতেই এই সব দেখিয়াছেন, এবং মানুষ যে জরাগ্রস্ত হয় অথবা তাহার যে মৃত্যু হয় ইহা বাল্যকাল হইতেই জানিতেন। পণ্ডিতদের এই মতটি প্রতিবাদযোগ্য, কারণ বহুদিন ধরিয়া দেখা ও জানা সত্ত্বেও মানুষ সত্য করিয়া একদিনই মাত্র দেখিতে ও জানিতে পায়। সংসার ত্যাগ করিতে হইলে সেই দিনই করা উচিত।

নিজের গৃহে ধারাবাহিক মৃত্যু দর্শনের সমসাময়িক কালে আমি আমার বাড়ির পাশে এমন অনেক ঘটনা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি যাহাতে আমার মনে বহু পূর্বেই বৈরাগ্য উদয় হওয়া উচিত ছিল। এক ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রীকে অকারণ নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেন, ইহা দেখিয়াছি, সেই স্ত্রী শেষে বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি, সেই ভদ্রলোক পরে এক বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি, সর্বশেষে দেখিয়াছি সেই বালিকাকে, সর্ব-আভরণহীনা বিধবার বেশে। এই সব দেখিয়াও আমার মনে কোনও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই, কারণ চোখের দেখার সঙ্গে সত্য উপলব্ধির সম্পর্ক সব সময়ে ঘনিষ্ঠ নহে।

শেষ পর্যন্ত সত্য আমার মনেও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কাহারও মৃত্যুতে নহে, কাহারও নিষ্ঠুরতায় নহে, বিবাহ ভাঙিয়া যাওয়াতে। আমি চতুর্থবারের

জন্য যে উদ্যোগ করিতেছিলাম তাহার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল না। বিপক্ষের লোকেরা প্রচার করিল আমি স্ত্রীভুক্। বিপক্ষদলে হয়তো কোনও ভুক্তভোগীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। প্রমাণ হইল যাহার ভাগ্যে তিনটি স্ত্রী অস্থায়ী হইয়াছে, চতুর্থ স্ত্রীর স্বামিত্ব তাহার ভাগ্যে কখনই লাভ হইতে পারে না।

হঠাৎ মৃত্যু আমার চোখে ভয়ঙ্কর হইয়া দেখা দিল। তিনটি স্ত্রীর মৃত্যু একসঙ্গে বীজগণিতের ত্রিশক্তি-রীতিকেও অতিক্রম করিয়া প্রবল শক্তিতে আমার বুকে চাপিয়া বসিল। প্রথম স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। তাহার সহিত কথা হইয়াছিল সে আমাকে চিরদিন ভালবাসিবে—আমি তাহাকে চিরদিন ভালবাসিব। দ্বিতীয় স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। তাহার সঙ্গেও ঠিক ঐ কথাই হইয়াছিল। তৃতীয় স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। তাহার সঙ্গেও দেখি ঐ একই কথা হইয়াছে।

তখন রাত্রি বারোটা। ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। শহরের প্রান্তে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের চারিদিকের আমবাগান চাঁদের আলোয় মহা রহস্যপূর্ণ নিবিড় অরণ্যের মতো বোধ হইতেছিল। তাহারই এক প্রান্তে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। মানসিক এবং দৈহিক উত্তাপে মাঠের হাওয়া বড়ই তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু মন হইতে দার্শনিক চিন্তাস্রোত রোধ করিতে পারিলাম না।

এইখানে বলা আবশ্যক যে আমি জীবনে কখনও থিয়েটার করি নাই। দেখিয়াছিও অত্যন্ত কম। কারণ থিয়েটার মাত্রেই কেহ-না-কেহ স্বগতোক্তি করে, এবং এই স্বগতোক্তি আমার কাছে অত্যন্ত আপত্তিজনক বোধ হয়। কথাটা বলিতেছি এই জন্য যে সেদিন রাত্রি বারোটায় চাঁদের আলোয় চিৎ হইয়া শুইয়া আমি স্বয়ং স্বগতোক্তি আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন বুঝিয়াছি স্বগতোক্তি আসলে স্বতোক্তি, রসনা হইতে স্বতই স্খলিত হইতে থাকে, নাট্যকার নিরপরাধ।

সেদিন অনিবার্যরূপে যাহা আমার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতে লাগিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায়—

মৃত্যু বিরাট, অনন্ত, ভয়ঙ্কর। দিন ও রাত্রির মতো নিয়মিত ছন্দে জীবন ও মৃত্যুর গান সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। মৃত্যু পটভূমি, জীবন ছবি। ছবি ক্ষণকালের, মৃত্যু চিরন্তন। হে মহান্ মৃত্যু, হে সুন্দর, প্রশান্ত মৃত্যু, তুমি একদিন আমার জীবনের ছবিকেও তোমার পটভূমিতে মিলাইয়া

দিবে, আমি আর তুমি এক হইয়া যাইব। আমার হাসি-অশ্রু, আমার ভয়-ভাবনা, আমার সংগ্রহের বোঝা তখন কোথায় থাকিবে?

মৃত্যু, তুমি যখন আমাকে আহ্বান করিবে তখন আমার চেতনা থাকিবে কোথায়? তখন কি বুঝিতে পারিব না আমার মৃত্যু হইয়াছে? এই ক্ষণকালের জীবন কি নিতান্তই ক্ষণকালের? এই ক্ষণ-দীপ্তির শেষে কি চির-অন্ধকার? এই স্বপ্নের পশ্চাতে কি কোনো সত্য নাই, কিছু নাই?

গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আমার কানের পাশে ধ্বনিত হইয়া উঠিল "আছে আছে।"

ভয়ে লাফাইয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখি আমার নিকট হইতে প্রায় সাত হাত দূরে আর একটি মানবসন্তান বসিয়া উক্ত কথাটি উচ্চারণ করিয়াছে। কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে আপনি?"

মানবসন্তান বলিল, আমি ইনশিওর্যান্স কম্পানির এজেণ্ট, আসুন, আপনার মৃত্যুভয় দূর ক'রে দিচ্ছি।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তুমি মৃত্যুভয় দূর করবে!"

মানবসন্তান এক লাফে আমার কাছে আসিল এবং আমার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে তুলিতে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দশ রকম প্ল্যান আছে, যেটা আপনার পছন্দ।"

অগত্যা তাহাকেই অনুসরণ করিয়া চলিলাম।

(১৯৩৭)

তিনি

অনেক কাল আগের কথা, যে কালে এ দেশের জনসাধারণ বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে পশুর জীবন যাপন করছিল। দেশের যা কিছু সম্পদ, যা কিছু ঐশ্বর্য সেই লুণ্ঠনকারীরা দখল ক'রে নিয়েছিল, আর দেশের জনসাধারণ অসহায় ভাবে ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে দিনের পর দিন পরকালের চিন্তা ক'রে আসছিল। কর্মফলে তাদের বিশ্বাস ছিল এমন দৃঢ় যে যা কিছু দুর্ভোগ এবং অন্যায় অত্যাচার তা যে তাদেরই পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে, এ কথা ভেবে তারা অসীম তৃপ্তিলাভ করত, এবং যত তৃপ্তিলাভ করত তত তাদের এক দল পরম ঔদাসীন্য ভরে বলত জগতে একমাত্র সত্য হরিনাম, তা ভিন্ন আর যা কিছু তা মিথ্যা, মায়া। এক দল মনে করত মাদুলিই সত্য। আর এক দল মনে করত হীনতার অপমান সহ্য করাই হচ্ছে কৃচ্ছ্র সাধন, ঈশ্বরের কৃপালাভের একমাত্র পথ। এক দল বলত 'অর্থনমর্থং ভাবয় নিত্যম্,' তাদের সুরে সুর মিলিয়ে সবাই বলত 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।'

তারা খেতে পেত না, পরতে পেত না, কিন্তু তবু কি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তারা লুণ্ঠনকারীদের মান্য ক'রে চলত। ক্রমশঃ তাদের পা শিথিল হয়ে আসছিল, হাতের জোর কমে আসছিল, আর তার ফলে বিদেশী লুণ্ঠনকারীরাই তাদের হাত ধরে চালনা করত, নিজের পায়ে চলার আর তাদের কোনো ক্ষমতাই রইল না। এমনি অবস্থাই চলছিল যুগ যুগ ধরে। এমন সময় তাদের মধ্যে দেখা দিলেন তিনি।

তিনি অতি সাধারণ মানুষ, কিন্তু তাঁর মনে মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধ জ্বলন্ত শিখার মতো দীপমান। তিনি এসে বললেন, যা আছে তাই ধ্রুব নয়, যা চলছে তা আর চলবে না, তোমরা মানুষ, তোমরা উঠে দাঁড়াও মানুষের মতো। বল, আমরা অন্যায় সহ্য করব না, বল, আমরা মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকব। তিনি বললেন, এগিয়ে এসো আমার সঙ্গে, এসো আমরা অন্যায় শক্তিকে পরাভূত ক'রে সকল মানুষের মধ্যে সমাধিকার প্রতিষ্ঠা করি।

লক্ষ লক্ষ লোক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর কথা শুনতে লাগল, শুনে চমকিত হল। কেউ বলল, হাঁ একটা কথার মতো কথা বটে। কেউ বলল, এমন কথা আগে তো শুনিনি ভাই, এ যে একেবারে উঠে দাঁড়াতে বলে।

উঠতে যায় তারা, কিন্তু বহুদিনের অনভ্যাসে পা তাদের কেঁপে ওঠে, চলার

শক্তি খুঁজে পায় না তারা নিজেদের মধ্যে, উঠতে গিয়ে পড়ে যায়। 'অন্যায় শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এ কথায় অনেকে ভয় পায়, কিন্তু ডাক শুনে তাদের লোভ হয়।

তারা যে মানুষ সে কথা তারা জানত না, তাই তাদের মতো অসহায় অমানুষদেরও দাম আছে এ সংসারে, তারাও যে আর সবারই মতো অধিকার নিয়ে জন্মেছে, এ কথায় তাদের মন নেচে ওঠে। তাদের মনে স্বপ্ন জাগে। তারা এ সংসারে মানুষের সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবে, আপন ভাগ্য আপন হাতে গড়বে, পড়ে পড়ে পরের হাতে মার খাবে না! এই কল্পনা তাদের মনে এক অদ্ভুত আলোড়ন জাগিয়ে তোলে।

কথাটা ক্রমে ধনিকপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। পরামর্শ সভা বসে তাদের। এ যে সর্বনাশের কথা। তিনি বলেন কি না আমাদের ধনদৌলতের অংশ দিতে হবে সবার মধ্যে ভাগ ক'রে! এই ধন-দৌলতে নাকি তাদেরই অধিকার, আমরা নাকি তাদের সম্পত্তি আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছি মাত্র। তিনি নাকি বলতে শুরু করেছেন যে আমরা ব্যবসা ক'রে যে মূলধন জমা করেছি তা নাকি অন্যায়, অপরকে বঞ্চিত ক'রে করেছি। আর এই কথাটা যদি প্রতিদিন প্রচার হতে থাকে তা হ'লে আমাদের কি হবে ভেবেছ?

একজন বুদ্ধিমান বলল, ভেবেছি। কিন্তু দেখা যাক এর কিছু প্রতিকার করা যায় কিনা। সবাই সমস্বরে বলল, প্রতিকার করতেই হবে যেমন হোক। বুদ্ধিমান বলল, দেখি চেষ্টা ক'রে।

পরদিন বিরাট জনসভা। তিনি এলেন তাদের মধ্যে, তাদেরই একজনের মতো। আনন্দের ঢেউ খেলে গেল জনতার মধ্যে। তিনি এবারে আরও এক নতুন কথা শোনালেন তাদের কাছে। বললেন, আমরা আমাদের অধিকার কেড়ে নেব শয়তানের হাত থেকে, কিন্তু শয়তানকেও সেই সঙ্গে মানুষের ধর্মে দীক্ষা দেব। 'শত্রুকে আমরা মারব না, শত্রুকে আমরা জয় করব, তাকেও আমরা মনুষ্যত্বের ধর্মে দীক্ষা দেব।

কেউ বলল, জবর কথা। এমন কথা আমরা আগে শুনি নি! কেউ বলল, এমন মনের কথা মনের মানুষ ছাড়া আর কে বলবে?

বুদ্ধিমান সময় বুঝে কাজ শুরু করল। সে চুপি চুপি সবার কানে কানে বলতে লাগল, উনি মানুষ নন গো, দেবতা। উনি যা বলেন তা কি আর কোনো মানুষ বলতে পারে?

যে শুনল সেই বলল, ঠিক কথা বটে, আমরা কি বোকা! এই কথাটা আমাদের এত দিন মনে হয় নি! তাঁকে দেখলেই যে আমাদের মনে ভক্তি জাগে, মাথাটি তাঁর পায়ে নত হয়ে পড়ে, এ কি অমনি-অমনি।

কথাটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সবার মধ্যে, সবাই স্বীকার করে, হাঁ দেবতা বটে। ধনিকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তারা টাকা দেয়, দেবতার মন্দির গড়ে উঠতে থাকে আকাশ-ছোঁয়া। সবাই এখন বুঝতে পারে দেবতা যা বলেন তা দেবতার পক্ষেই সম্ভব, মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের যদি কোনো কল্যাণ তিনি করতে চান তা হ'লে মানুষকে অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে না টেনেও তা তিনি করতে পারেন। সবাই এখন বুঝতে পারে তিনি যখন বলছেন তখন হবেই হবে, আমরা কিছু করি আর না করি।

ধনিকেরা খুশি হয়ে ওঠে।

তাঁর কানে যায় এ কথা। তিনি বেদনা বোধ করেন। তিনি ছুটে আসেন মানুষের মধ্যে, এসে বলেন, আমি তোমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ, তোমরা এগিয়ে এসো আমার সঙ্গে, এসো আমরা আমাদের ভাগ্য গড়ে তুলি নিজ হাতে। কিন্তু তিনি যত বলেন লোকের ততই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে তিনি মানুষ নন, দেবতা।

ধনিকদের চরেরা ফিস ফিস ক'রে বলে দেবতা, দেবতা, দেবতা, দেবতা।

ক্রমে তাঁর কানে খবর এসে পৌঁছায় যে এক বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাতে নাকি তাঁরই মূর্তি স্থাপন ক'রে পূজো করা হচ্ছে। হাজার হাজার লোক সেখানে এসে জড়ো হচ্ছে, মহা আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর মূর্তি স্থাপন উৎসব সম্পন্ন হচ্ছে, লোকেরা নাকি মূর্তি দর্শন ক'রে ধন্য হবে বলে অমানুষিক দুঃখ সহ্য করেও সেখানে এসে সমবেত হচ্ছে।

তিনি এ কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে বেরিয়ে এলেন এই বর্বর অনুষ্ঠানটি বন্ধ করতে। এই বর্বরতা, এই মূঢ়তাই মানুষকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে অন্ধকারের মতো—এরই হাত থেকে দেশের লোককে বাঁচাতে হবে। কিন্তু কেমন ক'রে বাঁচানো যাবে?···এ প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে তিনি ছুটে চললেন সেই অনুষ্ঠানের দিকে। এগিয়ে গিয়ে দূর থেকে দেখতে পেলেন হাজার হাজার লোক, লক্ষ লক্ষ লোক সমুদ্রের মতো গর্জন করছে মন্দিরের চারদিকে। মন্দিরের চূড়া সূর্যালোকপাতে সোনার মতো জ্বলে উঠেছে। চারদিক থেকে স্রোতের মতো লোক চলেছে সেই দিকে—তাঁরই মূর্তি পূজো করতে।

তিনি স্থির করলেন মন্দিরের ভিতরে গিয়ে তিনি করজোড়ে সবাইকে এই অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে বলবেন। তাঁর চরম নৈতিক শক্তি তিনি প্রয়োগ করবেন এ জন্য। প্রয়োজন হলে মৃত্যু বরণ করবেন।

কিন্তু কোথায় প্রবেশ পথ। এই বিশাল নিরেট জনপ্রাচীর ভেদ করবেন তিনি কোন্ পথে। যে দিকে প্রবেশ করতে যান সেই দিকেই লোকে তাঁকে ঠেলে দেয়, বলে কে তুমি, তোমার কি আক্কেল নেই, আমাদের ঠেলে ফেলে তুমি এগিয়ে যেতে চাও! কেউ বলে এতই তোমার পুণ্যের বল যে আমাদের টপ্‌কে গিয়ে দেব দর্শন করতে চাও আগে? হবে না, হবে না, অন্যপথ দেখ।

তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিন্তু কোথায়ও প্রবেশপথ পান না। সর্বত্র তাঁকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেয়।

মন্দিরে উৎসবের সঙ্গীত আর দেবতার জয়ধ্বনি প্রতি মুহূর্তে তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে।

(১৯৪৭)

নতুন পরিচয়

ট্রেনে চলছিলাম কলকাতার বাইরে।

আজ সাত বছরের শহুরে একঘেয়ে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র সত্য কথা ?

চলছিলাম গয়া, ভাবী শ্বশুরের একমাত্র কন্যাকে দেখতে। মৃগয়াও বলতে পারেন!

ক'টা বছর নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাববারই সময় পাই নি, অথচ চুলগুলো আমার অপেক্ষা না করেই পেকে উঠেছে, দাঁতও অনেকগুলো স্থান ত্যাগের নোটিস দিয়েছে। বয়সটা যে চলছে সে কথাটা যুদ্ধান্তে হঠাৎ বেশি অনুভব করছি। আর দুটো বছর পার হলেই চল্লিশে গিয়ে উত্তীর্ণ হব, সুতরাং আর বিলম্ব করা যায় না।

মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। অন্তরে আমি যাই হই বাহিরটা কি ইতিমধ্যেই পরিণয়-কার্যের প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে না ? শুধু সন্দেহ নয়, ভয়ও জেগেছে মনে। নিজের সম্বন্ধে সঙ্কোচ বেড়ে গেছে। এখন কি ক'রে আমার ভাবী শ্বশুরকে বোঝাব যে আমার অন্তর-বাহির এক নয়? আমার এই অকালপক্বতাই বা কে বিশ্বাস করবে? আমার অন্তর-বাহির এক নয়, এবং আমি অকালপক্ব, এই দুটি কথা আমার সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেউ বলে নি ব'লে আমার একটা গর্ব ছিল। অথচ আজ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি এই প্রার্থনাই করছি, আমার ভাবী শ্বশুর যেন ঐ দুটি কথা আজ আমার সম্পর্কে বিশ্বাস করেন।

সুতরাং বলা বাহুল্য যে আমি খুব নিশ্চিন্তচিত্তে ট্রেনে উঠি নি। তা ছাড়া গন্তব্য স্থানটি প্রেতলোকের সঙ্গে যোগাযোগের একটি প্রধান স্টেশন, সেখানে অভিপ্রেতের সন্ধানে যাওয়াটাই কেমন যেন একটা নিরুৎসাহজনক ব্যাপার। সে জন্যও মন ভাল নেই।

সেকেণ্ড ক্লাসের উপরের একটা বার্থ রিজার্ভ ক'রে চলেছি। গাড়ি হাওড়া ছাড়বার মুখে আমাদের কামরায় মোট যাত্রী সংখ্যা হলাম পাঁচ। আমার বিপরীত দিকে এক জন ইউরোপীয় ভদ্রলোক। আমার নিচে মোটা শাল জড়ানো এক বাঙালী দন্তহীন বৃদ্ধ। মাঝখানে আর এক বাঙালী বৃদ্ধ, গায়ে কালো কোট, গলায় কম্ফর্টর। ইউরোপীয় ভদ্রলোকের নিচে পশ্চিম জেলার পুষ্টকায় এক ভদ্রলোক। দুর্দান্ত শীত। সবাই বিছানা বিছিয়ে শোবার বন্দোবস্ত করছেন। আমি আগেই শুয়েছি।

কেউ কারো পরিচিত নন, সুতরাং কারো মুখেই কোনো কথা নেই। ইউরোপীয় ভদ্রলোক শুয়ে পড়ে একখানা বই পড়তে লাগলেন। তার পরেই লেপচাপা দিলেন পশ্চিমা ভদ্রলোক। দুই বৃদ্ধ বাঙালী তখনও ইতস্ততঃ করছেন। কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলেন না, শীতে হাড়সুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলছে সবারই।

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে।

কিছুক্ষণ বেশ নিশ্চিন্ত মনেই কাটল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই দেখি কালো-কোটধারী বৃদ্ধ উস্‌খুস্ করছেন। আমার নিচের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু মনে হল তিনিও জেগে আছেন।

কালোকোট লেপ মুড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু সুবিধা হল না, মাথা বের ক'রে হাই তুললেন।

এতক্ষণ পরে শালধারী প্রথম কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাশয়ের ঘুম আসছে না বুঝি? আমারও তাই।"

"না তা ঠিক নয়।" বলে কালোকোট চিন্তাবিষ্ট হলেন।

শালধারী প্রশ্ন করলেন, "মহাশয়ের কতদূর যাওয়া হবে?"

কালোকোট বললেন, "গয়া।"

গয়া শব্দটি আমাকে বিচলিত করল। এঁদের আলাপে যোগ দেবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিছু চেপে গেলাম। কে জানে, ইনিই যদি আমার ভাবী শ্বশুরের পদ অলঙ্কৃত করেন? নানা রকম সন্দেহে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। লেপটা মুখের উপর আরও টেনে দিয়ে কৌশলে চোখ দুটো বের ক'রে স্থিরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম কালোকোটধারীর উপর। ভদ্রলোক যেন দাগী আসামী, আর আমি যেন ডিটেকটিভের লোক।

ইনিও পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "আপনি কতদূর?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, "ধানবাদ।"

ইতিমধ্যে কালোকোট উঠে বসেছেন। এইবার কি তবে আলাপ ভাল ক'রে জমবে? কথায় কথায় কি কন্যার বিবাহের কথাটাও উঠবে না? উঠলে যে বাঁচি। ভাবী জামাতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত স্পষ্ট বোঝা যাবে। কিন্তু আমার ভাবী শ্বশুর এ সময়ে কলকাতা আসবেন কেন? কিছুই বলা যায় না, হয় তো আমার সম্পর্কে অনুসন্ধান নিতে এসেছিলেন গোপনে। হয় তো গত কাল ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কোনো কারণে যাওয়া হয়নি তাই আজ চলেছেন। মনের সন্দেহ আমার দূর হল না, বরঞ্চ ক্রমশই ধারণা হতে লাগল

যে কাল এঁকেই গিয়ে সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করতে হবে। সুতরাং আমার কৌতূহলের চেয়েও অস্বস্তি বোধ হতে লাগল খুব বেশি।

কালোকোটের মনে কি আছে কে জানে?

কিন্তু তিনি ওকি করছেন? ব্যাগ খুলছেন কেন? সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম ব্যাগ থেকে চওড়া-মুখ তরল পদার্থপূর্ণ একটা বেঁটে শিশি বের করলেন। তারপর শিশির কর্ক খুললেন। তারপর ফস ক'রে তাঁর বাঁধানো দাঁত দুপাটি খুলে সেই শিশিতে পুরলেন এবং পুনরায় কর্ক এঁটে সেটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলেন।

শালধারী বলে উঠলেন, "আপনার তো মশাই সব বন্দোবস্তই বেশ পাকা। ভাল করেছেন দাঁত খুলে রেখে।"

কালোকোটের মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। ছিলেন প্রায় ষাট বছরের, এখন আশী বছরের মতো হলেন। তাঁর উচ্চারণও সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল, "মশাই, বাচ্য হয়ে বণ্ডোবস্ট করটে হয়েছে।—দাঁত খুলে নেওয়াতে দন্ত্য উচ্চারণগুলো আর হ'ল না।

শালধারী বললেন, "বাধ্য হয়ে কি রকম?"

"শীতে বড় কষ্ট পাই, দাঁত ঠক্ ঠক্ করতে থাকে, এই যুদ্ধের বাজারের চতুর্গুণ দামে কেনা বাঁধানো দাঁত ঠক্ ঠক্ করিয়ে লাভ কি?" বলে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন।

শালধারী বললেন, "দামের কথা যদি বললেন, তা হ'লে দাঁতে আমার যা লোকসান হয়েছে সে আর বলবার নয়।"

কোট সে কথা জানবার জন্য উৎসাহিত হলেন।

শালধারী বললেন, "আর বলেন কেন। শস্তার বাজারে কিছু সোনা কেনা ছিল, তাই দিয়ে দুপাটি দাঁত করিয়ে নিলাম যুদ্ধের বাজারে। খরচ একই পড়ল, কারণ বাজারের দাঁতের দামও তখন সোনার মতোই। গত মাসে এই গাড়ির মধ্যেই ঘুমন্ত অবস্থায় আমার মুখ থেকে সে দাঁত চুরি হয়ে গেছে, তাই এখন বিনা দাঁতেই কাটাচ্ছি।"

"বলেন কি! এ তো সাংঘাতিক চুরি।"

"সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক!"

মিনিট তিনেক চুপচাপ কাটল। কালোকোট বলে উঠলেন, "দুঃখ করবেন না মশাই, শুধু বিনা দাঁতে তো নয়। যা দিনকাল পড়েছে, বিনা অন্নে, বিনা বস্ত্রে, বিনা বহু জিনিসে কোনো রকমে টিকে থাকা মাত্র।"

এ কথা শুনে আমার মনটা কেন যেন খারাপ হয়ে গেল। শুনেছি আমার

ভাবী শ্বশুর শ্রীযুক্ত অন্নদা মজুমদার খুব ধনী ব্যক্তি। কলকাতায় বাড়ি আছে, দেশে বাড়ি আছে, দেশের বাইরে গয়াতে বাড়ি আছে—এবং কন্যা মাত্র একটি। তথাপি এ কি কথা? "কোনো রকমে টিকে থাকা" তো কোনো ধনী ব্যক্তিরই হতে পারে না। ওঁর দিকে করুণ দৃষ্টি মেলে এই সব কথা ভাবছি—হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল ব্যাগের উপরকার দুটি অক্ষরের উপর। ইংরেজী এ. এম. দুটি অক্ষর। আর সন্দেহ রইল না লোকটি কে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে লেপের মধ্যে ভাল ভাবে আত্মগোপন ক'রে রইলাম। ক্রমশই আমার মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হতে লাগল আমার চেহারা সম্পর্কে। আমার পাকা চুলই আমাকে পরাভূত করবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তা ছাড়া ভাবী শ্বশুর যদি ধনী না হন তা হ'লে অযথা এ পরীক্ষার মধ্যে নামি কেন? তার চেয়ে এখনই আত্মপ্রকাশ করা ভাল নয় কি?

কিন্তু অবুঝ মন আশা ছাড়তে চায় না।

শালধারী বললেন, "মশাই ছত্রিশ বছর জায়গার মধ্যেও যে সব ঘটনার স্থান হয় না, তার চেয়েও বেশি ঘটনা ঘটে গেল ছটা বছরের মধ্যে।"

"ঠিকই বলেছেন আপনি।"—কোট উৎসাহিত হয়ে বললেন। "ঠিক তুবড়ি বাজির মতো। এক-আঙুল খুপরীর মধ্যে এমন সব জিনিস ঠেসে পুরে দেয় যার মুক্তি পেতে জায়গা লাগে পঞ্চাশ হাত।"

"তবেই দেখুন কি ভয়ানক ব্যাপার! ছত্রিশ বছরের জীবন ছ-বছরের খুপরীর মধ্যে কাটানো কি সোজা কথা?"—ব'লে শালধারী ওই কথার প্রতিধ্বনি করলেন।

হাহুতাশের হাওয়ায় আলোচনা হুতাশনের মতোই জ্বলে উঠতে লাগল।

কোট বললেন, "মশাই ভেবে দেখুন ১৯৩৯ থেকে আমাদের নার্ভের উপর মিনিটে দশটা ক'রে হাতুড়ির ঘা পড়েছে কি না?"

শালধারী বললেন, "আপনার মতো ভাষার জোর নেই, কিন্তু আপনি খাঁটি কথা বলেছেন। দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে হয়েছে।"

"শুধু দুশ্চিন্তা? দুশ্চিন্তা করতে গেলেও তো মনের খানিকটা সক্রিয়তা দরকার হয়। এ যে একেবারে বেঁধে মারা! মন কিছু ভাববার সময়ই পায়নি—পড়ে পড়ে কেবল মার খেয়েছে। যুদ্ধের প্রথম বছরখানেক অতটা বোঝা যায়নি, কিন্তু এই মার খাওয়া অসহ্য হয়ে উঠেছে ১৯৪১-এর মাঝামাঝি সময় থেকে।"

"ঠিক কোন্ সময়টার কথা বলছেন?"

"বলছি যখন থেকে আলো-ঢাকা শুরু হল। অন্ধকারে গুঁতো খেতে খেতে পথ চলতে হল।"

শালধারী একটু চিন্তা ক'রে বললেন, "কিন্তু আপনি একটি বড় কথা বাদ দিচ্ছেন। জিনিসপত্রের দাম তার আগে থেকেই বাড়তে শুরু করেছে।"

"বাদ দেব না কিছুই—সবই বলছি একে একে"—ব'লে কোটধারী লেপটা গায়ে জড়িয়ে বেশ ভাল ভাবে বসলেন।

কি সর্বনাশ, এই ছ-বছরের দুঃখের ইতিহাস শুনতে হবে পড়ে পড়ে! কিন্তু আর তো কোনো উপায় নেই। রাত্রি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর-দুজন যাত্রী বহুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার ভাবী শ্বশুরকে এতক্ষণ ওই শালধারী উৎসাহ দিয়ে দিয়ে এমন একটা বিষয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন যা মনে হল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। নানা রকম উপমা দিয়ে যে রকম ফলাও ক'রে তিনি এ সম্পর্কে দু-চারটে কথা এতক্ষণ বলেছেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যুদ্ধজনিত দুর্দশাকে তিনি নিপুণ বৈজ্ঞানিকের মতোই আপন মনে বিশ্লেষণ ক'রে এসেছেন এতদিন। এ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ একটু বেশিই মনে হল। তা না হ'লে তিনি ঘুরে ফিরে আলোচনাটা এর মধ্যেই টেনে আনতেন না। তা ছাড়া রাত্রি গভীর। চলন্ত ট্রেনের একটানা শব্দ, চারিদিকের অন্ধকারের বুকে একমাত্র শব্দ। এই শব্দের পটভূমিতে, এমন গভীর রাত্রে, এমন সহানুভূতিশীল শ্রোতার সম্মুখে যে-কোনো লোকেরই মর্মবেদনা আপনা থেকেই উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম কোটধারী বৃদ্ধ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। তাঁর স্নায়ুর উপর ছ-বছর ধরে মিনিটে দশটা ক'রে হাতুড়ির ঘা পড়েছে, এই ছ-বছরে স্প্রিঙের মতো তাঁর মনের চারদিকে যে শ্বাসরোধকারী কঠিন পাক পড়েছে তা তিনি আজ একে একে খুলবেন এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না। সুতরাং আমাকেও বাধ্য হয়ে প্রস্তুত হতে হল তাঁর কথা শোনবার জন্য।

শালধারীকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "শুনবেন সব ?"

শালধারী জোর গলায় বললেন, "শুনব না মানে ? নিশ্চয় শুনব। এ সব কথা যত শোনা যায় ততই মনটা হাল্কা হয়। তা ছাড়া দুঃখ-দুর্দশা তো শুধু আপনার একার নয়, আমাদের সবার, এবং ব'লে আপনি যত আরাম পাবেন, আমরা শুনে তত আরাম পাব।"

"সে তো বটেই। কিন্তু সব শেষে এমন একটি কথা প্রকাশ করব যা শুনে হয়তো আপনি চমকে যাবেন, আর হয়তো কেন, আমার বিশ্বাস আপনি নিশ্চয় চমকে যাবেন।"

শালধারী চমকে যাবার আগে আমি চমকে গেলাম এই কথাটি শুনে।

আমার সন্দেহ হল উনি সর্বশেষ যে বিস্ময়ের কথা বলবেন সেটি নিশ্চয় আমারই সম্পর্কে। বলবেন—"ছ-বছরের দুর্দশা কাটিয়ে যদি বা আলোর মুখ দেখা গেল, যদি বা কন্যাটির বিবাহ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলাম, কিন্তু প্রথমেই যে পাত্রটিকে পেয়ে খুশি হয় ভাবলাম সে একটি অপাত্র। একেবারে বুড়ো, আমারই বয়সী; এই ভাবে মশাই ধাক্কার পর ধাক্কা, আঘাতের পর আঘাত খেয়ে চলেছি।" অথবা এই কথাই অন্য ভাষায় বলবেন।

এই কাল্পনিক অপমানে আমার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সে বেঁকে দাঁড়াল। আমি গয়া নামব না ঠিক ক'রে ফেললাম। গাড়িভাড়াটা গেল, যাকগে। বিয়ে যদি করতে হয়, ঘরে বসে করব। আরও অনেক রকম শপথ করলাম মনে মনে।

শালধারী একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। বোধ হয় এই যুদ্ধের কয়েকটি বছরের মধ্যে চমকে যাবার মতো কিছু আছে কি না খুঁজে দেখলেন, কিন্তু পেলেন না। বললেন, "বলুন না আপনার কথা—খুবই অদ্ভুত কথা না কি?"

"একেবারে আরব্য উপন্যাসের মত অদ্ভুত। দাঁড়ান দাঁত লাগিয়ে নিই আগে, নইলে বড্ড অসুবিধা হচ্ছে।" ব'লে ব্যাগ থেকে দাঁত বের করতে লাগলেন।

কথা আরম্ভ হল। শুরু হল ১৯৩৯ সালের যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে। কি রকম দিনের পর দিন আতঙ্ক বাড়তে লাগল, কি ভাবে আলোক নিয়ন্ত্রণ শুরু হল, জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা হল, তারপর জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা করল—সব একে একে বললেন। এর প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি খবর, কি ভাবে মানুষের নার্ভের উপর ঘা মেরেছে তা শোনালেন। তার পর জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়া—জিনিস দুষ্প্রাপ্য হওয়া—লোকের দুর্গতির কথা, শোনালেন। দুর্গতি ক্রমশ বাড়তে লাগল। জাপানীরা বর্মা প্রবেশ করল, কলকাতার লোক শহর ছেড়ে পালাল, আবার ফিরে এল, তারপর ৪২ সালের ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম বোমা পড়ল, দ্বিতীয় বার শহর ছেড়ে পলায়ন শুরু হল। এইভাবে শহরবাসীরা নানা ভাবে নাস্তানাবুদ হতে লাগল। জাপানীরা আন্দামান দখল করল। যখন তখন কলকাতা আক্রমণের ভয়। এই অবস্থায় আবার একে একে শহরে ফিরে আসা এবং দ্বিতীয় বার সর্বস্বান্ত হওয়া—এই সব কথা একটি একটি ক'রে তাতে অতি ভয়ঙ্কর রং ফলিয়ে তিনি তাঁর শ্রোতাকে স্তম্ভিত করতে লাগলেন।

বলা বাহুল্য আমিও স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম। এ রকম বিভীষিকা বিশ্লেষণ আমি আর ইতিপূর্বে দেখি নি। তাই তাঁর একটানা একটি পর্বের বক্তৃতা

শেষে যখন তিনি হঠাৎ তাঁর শ্রোতাকে প্রশ্ন করলেন, "শুনছেন ?"—তখন আমিই হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে আগে বলে উঠলাম, "খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনছি।"

আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে ঠিক সেই সময় শালধারীও উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, "নিশ্চয় শুনছি—আপনি—আপনি থামবেন না।" তাই আমার কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। আমি কখন যে এই কাহিনীর মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম বুঝতেই পারি নি।

আধ মিনিট বিরামের পরেই কোটধারী আবার তাঁর কাহিনী শুরু করলেন। এ কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই—এর প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রতিটি দিন ওতপ্রোতভাবে জড়িত—এর প্রত্যেকটি মিনিটের অভিজ্ঞতা আমাদের সবার অভিজ্ঞতা, কিন্তু তিনি যেভাবে সব কিছুর ব্যাখ্যা করছিলেন, এবং বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কি ভাবে এগুলো আমাদের স্নায়ুর উপর আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চলেছে—তা আমার কাছে অন্ততঃ সম্পূর্ণ নতুন। যুদ্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর ভাবে আমাদের সর্বনাশ ক'রে গেছে তা এই প্রথম উপলব্ধি ক'রে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি।

১৯৪৩-এর ১৬ জানুয়ারি তারিখের বোমার আক্রমণটা তিনি বর্ণনার ভঙ্গীতে আবার বাস্তব ক'রে তুললেন। এত দিন পরে তা শুনে আবার বুক কাঁপতে লাগল। তার পর নিপুণভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন প্রথম শহর ছেড়ে পালানোয় স্নায়ুর উপর যে পরিমাণ ঘা লেগেছিল, দ্বিতীয় বারের পলায়নে তার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি ঘা লেগেছে। উপরন্তু এ অবস্থাতেও যখন ৩০ মার্চ তারিখে গোটা বাংলা দেশকে বিপজ্জনক এলাকা ঘোষণা করা হল তখন থেকে শহরের কোনো মানুষই আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে নি—সহজভাবে কেউ আর নিশ্বাসও নিতে পারে নি।

বৃদ্ধের বলবার ভঙ্গি সত্যিই অতি চমকপ্রদ। যখন কথা শুরু করেন তখন কণ্ঠ কিছু ক্ষীণ থাকে। তার পর সে কণ্ঠ ধাপে ধাপে চড়তে থাকে এবং কথার পর কথা চলতে থাকে অবিরাম গতিতে। তিনি না থামা পর্যন্ত মাঝখানে আর কারও কিছু বলবার অবসর থাকে না। তাই এতক্ষণ আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর কথা শুনে গিয়েছি, কখনও বিরক্তি বোধ করিনি—জানা কথার পুনরাবৃত্তি এক মুহূর্তের জন্যও একঘেয়ে লাগেনি।

বৃদ্ধ দ্বিতীয় বার একটু থামতেই শালধারী নিতান্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যেই তাঁর কতকগুলো কথা নিজেরই কথা বলে আবৃত্তি করতে লাগলেন এবং

জানালেন দুবার শহর ছেড়ে পালানোর ব্যাপারে তিনিও প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

কোটধারী আবার অনুপ্রাণিত হয়ে বলতে লাগলেন, "হতেই হবে, কারোই নিস্তার নেই। কিন্তু এই দুশ্চিন্তা আতঙ্ক আর ছুটোছুটিতেই তো সব শেষ নয়, শুধু কাল্পনিক ভয় তো নয়, বিভীষিকা মূর্তি ধরে এলো একেবারে চোখের সম্মুখে। ডাইনে বামে নিরন্নের হাহাকার—ডাইনে বামে মৃত্যু দৃশ্য! পথ চলতে হচ্ছে মৃতদেহ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। মানুষের এমন মৃত্যু তো কখনও দেখি নি, কখনও ভাবি নি! এ রকম নিষ্ঠুর করুণ মৃত্যু, এমন অসহায় নীরব মৃত্যু!—শত শত নরনারী শিশু বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী—শূন্য দৃষ্টি মেলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে চোখেব সামনে—এ কি দেখা যায়? চোখ খুললে এই বেদনার দৃশ্য, চোখ বুজলে গভীর আতঙ্ক। পায়ের নিচে যেন মাটি নেই, আশ্রয় নেই। অন্ধকারে দম বন্ধ হয়, আকাশে চাঁদ উঠলে বোমার ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে। এমনি অবস্থাতেই তো মানুষ পাগল হয়ে যায়, পাগল হইনি এ খুব আশ্চয মনে হয়, কিংবা হয়েছি কি না কে জানে!"

শালধারী বললেন, "এমন কি খবরের কাগজ খুললেও কেবলই বীভৎস সব ছবি দেখতে হয়েছে—জাপানীদের অত্যাচারের সব ছবি।"

"ঠিক কথা। এইভাবে শহরের লোকের হাত পা বেঁধে ছ-বছর ধরে তার তার উপর যেন লাঠি চালানো হয়েছে। মনে আতঙ্ক, চোখে বিভীষিকা, কানে করুণ ক্রন্দন—এতদিন ধরে কোনো মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব? কিন্তু আজও কি মুক্তি পেয়েছি? যুদ্ধ শেষে যে মুক্তি আশা করেছিলাম, সে আশা আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু সাইরেন নেই, কিন্তু আর সবই আছে। আরও কতদিন থাকবে কে জানে?"

এই পর্যন্ত বলে বৃদ্ধ চুপ করলেন। তাঁর দৃষ্টি বেদনাচ্ছন্ন, উদাস। যেন ভবিষ্যৎ কালের অনিশ্চয়তার মধ্যে আরও একবার সে দৃষ্টি চালনা করবার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না, দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে।

আমি একদৃষ্টে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে আছি। এতক্ষণ তাঁর কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই শুনেছি এবং আমিও যে এমনি একটি ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই ছটি বছর কাটিয়ে এসেছি তা এই মুহূর্তে উপলব্ধি ক'রে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি। আমি ভুলে গিয়েছি আমি কোথায় চলেছি, কেন চলেছি। এমন সময় শালধারীর কণ্ঠ থেকে প্রশ্ন কানে এলো "আপনি সর্বশেষ কোন্ কথাটি বলতে চেয়েছিলেন?"

এই প্রশ্নটি আবার আমাকে বিহ্বল ক'রে তুলল। নিশ্বাস রোধ ক'রে অপেক্ষা ক'রে রইলাম সেই কথাটি শোনবার জন্য, যেন এইবার আমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশটি শুনতে পাব।

কিন্তু যা শুনলাম সে তো মৃত্যুদণ্ডাদেশ নয়! অত্যন্ত সাধারণ একটি কথা এবং তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। বললেন, "মশাই শুনলে বিশ্বাস করবেন না, আমি এই শক্ কাটিয়ে উঠতে পারি নি।"

তা হ'লে কি বৃদ্ধ উন্মাদ? কে জানে! হয় তো তাই। কারণ তিনি উন্মাদের মতোই পলকহীন দৃষ্টিতে শালধারীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "এই দেখছেন চুল? এর একটিও কালো নেই। এই দেখছেন মুখ? মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। দাঁতের কথা তো আগেই জানেন। কিন্তু কেন আমার এই দুর্দশা? এই যুদ্ধের আঘাতে, স্নায়ুর উপর অবিরাম ধাক্কায়। আমার আয়ু শেষ ক'রে দিয়েছে এই ছটি বছর! আমি—আমি সম্পূর্ণ অকালে একেবারে বুড়ো হয়ে পড়েছি—সম্পূর্ণ অকালে, আপনি বিশ্বাস করুন।"

শালধারী মাত্র একটি বিস্ময়সূচক শব্দ করলেন, তাঁর মুখ থেকে কিছুক্ষণ আর কোনো কথা শোনা গেল না। আমার মনে সহসা নতুন আলোকপাত হল! আমি এই সুযোগে একেবারে উঠে বসলাম। বৃদ্ধের যুক্তি আমি কাজে লাগাব। তাঁর কথায় আমারই আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি মিলে গেল, হয় তো মুক্তিও এতেই মিলবে। এখন একমাত্র ভাবনা রইল, ভাবী শ্বশুরের কন্যাকে কি বলে ভোলাব? তবু পকেট থেকে ডায়েরি বের ক'রে কয়েকটা পয়েণ্ট নোট ক'রে নিতে লাগলাম।

এমন সময় আমার সমস্ত আশা নির্মূল ক'রে কোটধারী বলে উঠলেন, "মশাই বিশ্বাস করতে পারেন আমার বয়স আটত্রিশ বছর? বিশ্বাস করতে পারেন, চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কি অমানুষিক বেদনায় একখানি কাঁচা মন বয়ে বেড়াচ্ছি একখানা পাকা দেহের মধ্যে?"

আমার আর ভাববার ক্ষমতা ছিল না। এঁর যদি বয়স আমার সমান হয়, তাহ'লে ইনি যে আমার ভাবী শ্বশুর নন সে কথা ভেবে তৎক্ষণাৎ আমার কিছু আরাম বোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু এতক্ষণ ধরে যাঁকে অন্তর থেকে পূজনীয় ক'রে তুলেছি—মনে হল তিনি যেন আজ আমাকে নানাভাবে ঠকাবার জন্যই উদ্যত হয়েছেন। হঠাৎ একটা আশাভঙ্গের বেদনার চেয়েও নিজের অনুমানশক্তির এতখানি দারিদ্র্য উপলব্ধি ক'রে বেশি বেদনা পেলাম। সমস্তই

কেমন যেন একটা ধাঁধা বলে বোধ হতে লাগল। যেন গাড়ির মধ্যে একটা ভৌতিক ক্রিয়া চলছে—যেন সমস্তই অবাস্তব, সমস্তই মায়া।

সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল যখন শালধারী বললেন, "মশাই কে কাকে অবাক করবে তাই ভাবছি। আমার বয়স কত মনে হয়? বিশ্বাস করবেন, আপনার চেয়ে আমি মাত্র দু-বছরের বড়? বলিনি এতক্ষণ, কারণ দরকার হয় নি। কাউকেই বলি না, চুপ ক'রে থাকি, কৌতুক বোধ করি মাঝে মাঝে নিজেকে বৃদ্ধ মনে ক'রে।"

কোটধারী একেবারে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন এই কথা শুনে। হাসতে হাসতেই বললেন, "তা হ'লে দেখছি আমার নিজের কথা সত্যিই সবার কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে! এ যুদ্ধের ধাক্কায় তা হ'লে ক্ষীণজীবী সব বাঙালী যুবকেরই এই দশা ঘটেছে।—আমি একা অনুকূল মুখুজ্জেই শুধু বুড়ো হই নি!"

শালধারী তড়িৎগতিতে দাঁড়িয়ে উঠে অনুকূল মুখুজ্জেকে জাপটে ধরলেন, এবং গলা ফাটিয়ে উচ্চারণ করলেন, "তুই অনুকূল? তুই আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি সন্তোষ!"

এইবার আমার পালা। আমার হাত-পায়ে প্রকৃত যৌবনশক্তি ফিরে এলো, আমি এক লাফে নিচে পড়ে দুজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলাম—"আর আমি যে বিনয় রে! চিনতে পারছিস তোরা?"

এর পর যা ঘটল তা অকথ্য। চলল বেপরোয়া চিৎকার। তিন অকাল-বৃদ্ধের কোলাহলে ইউরোপীয় ভদ্রলোক রক্তচক্ষু খুলে কর্কশ কণ্ঠে হাঁকলেন "হোয়াট্স আপ্ দেয়ার?"

"নাথিং সাহেব, উই ওল্ড ফ্রেণ্ডস্ মীট আণ্ডার নিউ সারকমস্ট্যান্সেস্"—বলে আমি সাহেবকে আশ্বস্ত করলাম। সাহেব পাশ ফিরে শুলেন।

সাহেবকে সত্য কথাই বলেছিলাম। আমরা তিন জনেই সহপাঠী অন্তরঙ্গ বন্ধু—মাত্র ছ-সাত বছর আমাদের দেখা হয় নি।

এত কোলাহলেও পঞ্চম যাত্রীটির কোনো অসুবিধা হয় নি। তাঁর চেহারা দেখে মনে হল বহু বাঙালীকে মেরে ইনি সম্প্রতি স্ফীত হয়েছেন, তাই তাঁর নাক-ডাকা একই ভাবে চলতে লাগল।

(১৯৪৭)

প্রতিযোগ

পৃথিবী একদিন অগ্নিপিণ্ডবৎ ছিল, তারপর ধীরে ধীরে আগুন নিবে এলো, ধোঁয়াটে জিনিস জমাট বাঁধল, জল এবং স্থল দেখা দিল, তারপর একক সেল্‌দেহী প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব ঘটল, তারপর সেই প্রাণী বিবর্তনের ধারাপথে মানুষরূপে দেখা দিল, তারপর সে মানুষ ভাষা শিখল, দেশবিদেশের পরিচয় সংগ্রহ করল এবং পৃথিবীর ভূভাগের একটি ক্ষুদ্রতম অংশের নাম দিল পাবনা জেলা। সেই পাবনা জেলার একটি ছোট্ট গ্রামে পদ্মানদীর ধারে হরেন দাস তার সঙ্গীদের নিয়ে বসে আলাপ করছে।

সে বলছে "দূর দূর, গাঁয়ে আবার মানুষ থাকে? না আছে রেলগাড়ি, না আছে থিয়েটার বায়োস্কোপ, না আছে সাহেবমেম, যত সব মুখ্‌খু চাষার আড্ডা। আর, কাজের মধ্যে কি? না, মাঠে লাঙ্গল নিয়ে তা-তা কর, না হয় জাল নিয়ে গাঙে মাছ ধর, না হয় কুড়ুল দিয়ে গাছ কাট। এমন গ্রামের মুখে লাথি মারি।"

উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে গ্রামের হীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে হরেনের দিকে। হরেন চেয়ে থাকে পদ্মার স্রোতের দিকে। সেই স্রোত বেয়ে হরেনের মন গ্রাম ছেড়ে কোন্ সুদূরে চলে যায়। তারপর হঠাৎ বলতে থাকে, "আমি তো বাবা, এ গাঁয়ে বেশি দিন থাকতে পারব না, সে তোরা যাই বলিস। ঘেন্না ধরে যায় না রোজ রোজ একপাল রোগা মুখ্‌খু চাষার মুখ দেখে দেখে? দম বন্ধ হয়ে আসে না এই জেলখানায়? পেটে চর পড়ে যায় না মুড়িচিঁড়ে খেয়ে খেয়ে?"

কথাগুলো হরেন এমন চালের সঙ্গে উচ্চারণ করে যাতে এই প্রশস্ত উদার নদীর কলগান মুখরিত, সহস্র সুখস্মৃতিবিজড়িত ছোট্ট গ্রামখানি সঙ্গীদের চোখে অতি কুৎসিত কালিমালিপ্ত হয়ে দেখা দেয়। তাদের মনে হয় এই বিপুল স্নেহবর্ষী গ্রামখানির মধ্যে কোথায় যেন একটি মস্ত ফাঁকি আছে, কিন্তু কোথায় তা তারা বুঝতে পারে না।

হরেন খুব গম্ভীর ভাবে বলে, "দেখে নিস তোরা, হরেন দাস কবে সট্‌কেছে গাঁ থেকে।"

হরেন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ে। গ্রামেই এক ভাঙা স্কুল আছে। কিন্তু স্কুলকে সে বড় গ্রাহ্য করে না। সে সাধারণ চাষী গৃহস্থের ছেলে হয়েও ঔদ্ধত্যে

এবং অহঙ্কারে গ্রামের সবার মনে ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে। ওর জামাকাপড় পরার ভঙ্গিতে, ওর চালচলনে, ওর কথার উচ্চারণে, যতদূর সম্ভব গ্রাম্যতা বর্জনের চেষ্টা আছে। শিক্ষকেরা বিরক্ত হয়ে বলেন, ছোকরা মহা ওস্তাদ। গ্রামের লোকেরা বলে, ও একটি কুলাঙ্গার। কিন্তু সে অন্য কারণে।

হরেনের বাবা বিশ্বম্ভর দাসের অবস্থা গ্রামের অনেকের চেয়েই ভাল। গৃহস্থ হলেও সুখী পরিবার। সবার মনে ঈর্ষা জাগানোর পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু এ ছাড়াও কারণ আছে। বাবা ছেলেকে আস্কারা দেয়, প্রশ্রয় দেয়, এমন দুর্নীতির দৃষ্টান্তে গ্রামের ছেলেদের মাথা খাওয়ার চেষ্টা করাতেও ছেলেকে কিছুই বলে না। ছেলে জেলা-শহরে গিয়ে মাঝে মাঝে চুল ছাটিয়ে আসে, আর কি বাহার তার! এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত পিছনে ক্ষুর দিয়ে চাঁছা। এই দুষ্কার্যের পয়সা দেয় তার বাবা—অথচ দরকার মতো দায়ে-ঘায়ে ঠেকলে দুটো টাকা হাওলাত পাওয়া যায় না।

বিশ্বম্ভর দাস অবশ্য মাঝে মাঝে বিরক্তির ভান ক'রে বলে, "তোর চোদ্দ পুরুষে যা করেনি, তা করতে তোর লজ্জা হয় না?" হরেন জবাব দেয়, "আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ ম্যাট্রিকুলেশন পড়েছে?" এর পর আর বিশ্বম্ভরের বলবার কিছু থাকে না।

গ্রাম যে তার জন্য নয়—এ ধারণা হরেনের মাথায় কোত্থেকে ঢুকল তা কেউ জানে না। কিন্তু সে এই আশাতেই অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত হচ্ছে অনেক দিন ধরে। এর জন্যই সে গ্রাম্য ভাষার সঙ্গে কলকাতার উচ্চারণ মিশিয়ে কথা বলে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে ইংরেজী শব্দেরও মিশেল আছে। সে জানে কথার সঙ্গে ইংরেজী না মেশালে ভদ্রলোকের ভাষাই হয় না।

গ্রামের হিতৈষী লোকেরা বিশ্বম্ভরকে বলে, "হরেনকে গাঁয়ে আটকে রাখতে পারবে না, দাসের পো। সময় থাকতে বিয়েটি দিয়ে ফেল, নইলে অনুতাপে কাটবে সারাটা জীবন।"

কিন্তু হরেন বিয়ের প্রস্তাবে ক্ষেপে যায়। মাকে বলে, "গাঁয়ের মুখ্‌খু মেয়ের জন্য নগেন আছে।"

নগেন ওদের শরীকের ঘরের ছেলে। দুই শরীকে বিবাদ, যেমন হয়ে থাকে। বিশ্বম্ভর নকুলেশ্বর দুই ভাই, কিন্তু এখন ওদের সবই আলাদা। বিশ্বম্ভর চতুর, নকুলেশ্বর সাদাসিদে। সুতরাং একই জমিজমার উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নকুলেশ্বরের অবস্থা খারাপ। নকুলেশ্বর ছোট থাকাতেই বিশ্বম্ভর বাকী খাজনায় সম্পত্তির অনেকখানি অংশ নিলামে চড়িয়ে বেনামীতে আত্মসাৎ করেছে।

তাই ওদের দেমাক একটু বেশি। ছেলেদের মধ্যেও এই বিষ ছড়িয়েছে। হরেন নগেনকে ছোট নজরে দেখে। ওকে তাচ্ছিল্য করে। সে জন্য নগেন দাস ওর মুণ্ডপাত করে, কিন্তু বাইরে কিছু করতে পারে না। পড়াশোনার দিক দিয়েও ও হরেনকে নিচে ফেলতে পারে না, সেইজন্য মনে মনে জলতে থাকে, হিংসা জেগে ওঠে ওর মনে, কিন্তু সে অসহায়ের হিংসা। সুতরাং সে যতই চেষ্টা করে হরেনকে ছাড়িয়ে উঠতে, ততই সে আরও যেন নিচে পড়ে যায়। হরেন দেখতে দেখতে ইংরেজীতে অনেক উন্নতি ক'রে ফেলল, নগেনের সেই কারণেই ইংরেজী ভাষার উপর ঘৃণা জন্মাল। হরেন প্রাণপণে শহুরে হয়ে উঠল, নগেন আরও বেশি ক'রে গ্রাম্য ভাব ফুটিয়ে তুলল তার চালচলনে।

ইতিমধ্যে সামান্য একটি ঘটনায় হরেন গ্রামের মধ্যে রীতিমতো একটি উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে বসল। ঘটনাটি এমনই অপ্রত্যাশিত এবং অতর্কিত যে মুহূর্তকালের জন্য হরেনের শত্রু মিত্র সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

হরেন স্টীমারের এক সাহেবের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলে এসেছে! বাপ্ রে, কি কাণ্ড! স্বয়ং হেডমাস্টার পর্যন্ত ভয় পায় সাহেবের সামনে যেতে! পথ চলতে সবাই সবিস্ময়ে হরেনের দিকে চেয়ে থাকে! সাহেব আর হরেন মুখোমুখি, সেই অকল্পিত দৃশ্যটি কল্পনায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে।

অন্য ছেলেদের আর মাথা উঁচু ক'রে চলবার উপায় রইল না। সবাই বলে, বিশ্বম্ভর দাসের ছাওয়াল ছাওয়াল নয়, হীরের টুকরো। আর তোরা হতভাগারা সব অকালকুষ্মাণ্ড।

চক্রবর্তীর সঙ্গে দত্তের দেখা।

"ওহে শুনেছ ?"

"আজ্ঞে দাঠাকুর, কে না শুনেছে ?"

একদল ছেলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, চক্রবর্তী তাদের ডেকে বলল, "মুখে একেবারে কালি মাখিয়ে দিয়েছে না ? একই গাঁয়ের ছেলে, ছোটলোকের ছেলে, আর তার কাছে কি না তোদের মাথা হেঁট হল ?"

ছেলের দল কোনো রকমে মাথা নিচু ক'রে সরে পড়ল।

চক্রবর্তী দত্তের চোখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল, তারপর চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে চাপা সুরে বলল, "হারামজাদা ছেলে খিরিষ্টান হবে, গাঁ ডোবাবে বলে দিচ্ছি।"

দত্ত সোৎসাহে বলল, "তাতে আর সন্দ আছে।"

হরেনের বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ষ্টীমারের মারফৎ বেড়েই চলল। কেউ তা রোধ করতে পারল না। এবং একদিন সবাই স্তম্ভিত হয়ে শুনল হরেন ষ্টীমারে উঠে কোথায় চলে গেছে।

চক্রবর্তী বলল, "শালা ছেলে গেছে না বাঁচা গেছে।"

দত্ত বলল, "আগেই বলেছি দাঠাকুর, অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে।"

সরকার বলল, "এখনও বিশ্বাস নেই বাবা, ফিরে এসে আরো কি কেলেঙ্কারি ক'রে বসে, দুদিন সবুর ক'রে দেখ।"

চক্রবর্তী প্রস্তাব করল বিশ্বম্ভরকে কিছু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। বিশ্বম্ভর গুম হয়ে হুঁকা টানছিল! তার স্ত্রী একটু দূরে বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। চক্রবর্তী তাকে শুনিয়ে বিশ্বম্ভরকে বলতে লাগল, "ভাবনার কি আছে এতে? ও ছেলে তোমার ঠিক ফিরে আসবে।"

দত্ত বলল, "তবে ছেলে সাহেব হবে—"

সরকার বলল, "তাতে আর হয়েছে কি? হাতে না খেলেই হল।"

চক্রবর্তী বলল, "তাই বা খাওয়া যাবে না কেন? প্রাচিত্তির ক'রে নিলেই হবে।"

ঘটনাটি বিশ্বম্ভর পরিবারের পক্ষে যতই মর্মান্তিক হোক, গ্রামের সবাই বেশ একটা উত্তেজনাপূর্ণ আরাম অনুভব করতে লাগল। নগেনের পক্ষেও ঘটনাটি এক রকম ভালই হল। হরেনকে সে শত্রু মনে করত, সে শত্রু সরে গেল। তদুপরি গ্রামের সবাই এখন তার দিকে মনোযোগ দিল। তারা ওকে বোঝাতে লাগল হরেনের মতো ছেলে গ্রামে ছিল বলেই নগেনের উন্নতি হয়নি। বলা বাহুল্য নগেনও তাই মনে করে।

হরেনের পদমর্যাদা পাবার জন্য নগেনও ভাষার সঙ্গে ইংরেজী মেশাল; লোকে বলল, এই তো উন্নতি হচ্ছে। নগেন ঘাড় কামিয়ে ফেলল, লোকে বলল, হরেনের চেয়ে নগেন কিসে কম? নগেন উগ্র রঙচঙা জামা পরল, লোকে বলল, চমৎকার। কেবল এই অস্বাভাবিক বর্ণবাহুল্যে গ্রামের শুকনো কুকুরগুলো ভয় পেয়ে নগেনের পিছনে পিছনে তাড়া ক'রে ফিরতে লাগল।

কিছুকাল বেশ ভালই কাটল। নগেনের ভাগ্যতরীখানা বেশ উজিয়ে আসছিল, এমন সময় এক দমকা বাতাসে তার পাল ছিঁড়ে তরী মাঝপথে ঘুরপাক খেতে লাগল, সম্পূর্ণ যে ডুবে গেল না সে কেবল নগেনকে নিয়ে আরও একটু খেলাবে বলে।

মাস তিনেক পরে বিশ্বম্ভরের নামে চিঠি এলো—লিখেছে হরেন। এতদিনের নিরুদ্দিষ্ট ছেলের উদ্দেশ পাওয়া গেল সত্যি সত্যি।

এই চিঠি সকলের আগে পড়ল পোস্টমাস্টার, তারপরে পোস্টম্যান, তারপরে ডাকঘরে উপস্থিত সবাই। চিঠি বিশ্বম্ভরের হাতে পৌছনর আগেই তার কাছে খবর পৌছে গেল, হরেন কলকাতা আছে, এবং এক সদাগরি আপিসে চাকরি করছে। আরও লিখেছে আপিসের সাহেবরা তার কাজে খুব খুশি সুতরাং ভবিষ্যতে খুব উন্নতির আশা আছে।

একটা বোমা এসে যেন ফেটে পড়ল।

"দাসের বেটা যে তাক লাগিয়ে দিলে হে ?"

"তখনই সন্দেহ হয়েছে মনে মনে, ও ছেলে একটা কিছু করবেই।"

চক্রবর্তী দ্রুত পায়ে বিশ্বম্ভরের বাড়িতে গিয়ে বলল, "যা ভেবেছি ঠিক তাই হল কি না ?"

দত্ত গিয়ে ফলাও ক'রে বলতে লাগল, "আমি কিন্তু অবাক হইনি দাস মশায়। বুঝলেন না ? এ যে হতেই হবে। সূর্য পূব দিকে ওঠে এতে কি কেউ অবাক হয় ? তুমিই বল না ?"

একবার চক্রবর্তী বলে, একবার দত্ত বলে। কেউ সহজে উঠতে চায় না। চক্রবর্তী মনে মনে অধীর হয়ে বলল, "দত্ত, চল এবারে উঠি।"

দত্ত বলল, "আপনি এগোন, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

চক্রবর্তী উঠে যাবার পর ক'দিন আগের প্রস্তাবিত হাওলাতটা আজ চেয়ে বসল। গোটা দশেক টাকা আজ তাকে দিতেই হবে।

বিশ্বম্ভর খুশি ভাবেই টাকাটা তাকে দিয়ে দিল। পূর্বেকার অনাদায়ী পাঁচটা টাকার কথা আর তার তুলতে ইচ্ছে হল না।

দত্ত চলে যেতে না যেতে চক্রবর্তী এসে তারও কিছু নিবেদন পেশ ক'রে রাখল।

হরেনই যে ভবিষ্যতে গ্রামের একমাত্র ভরসা এ বিষয়ে কারো আর সন্দেহ নেই, তাই তারা অতি নিষ্ঠার সঙ্গে হরেনকে উপলক্ষ ক'রে তাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন গড়ে তুলতে লাগল। এবং অবসর পেলেই নগেনের বাড়ি গিয়ে নকুলেশ্বরকে বলতে লাগল, "ছেলেকে আর গাধার মতো পড়িয়ে লাভ কি ? ও সব ছাড়িয়ে চাষের কাজে লাগিয়ে দাও।"

বলা বাহুল্য বিশ্বম্ভরের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশের এ এক নিষ্ঠুর গ্রাম্যপন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নগেন অত্যন্ত আহত হয়, তার পড়া এগোয় না, মনে হয় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু কোথায় সে যাবে ? বাইরে যাবার পথ তার বন্ধ,

বাইরের সহানুভূতি সে পায় না, এমন অবস্থায় বাধ্য হয়েই সে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে পড়াশোনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিল, এবং খারাপ ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও যথাসময়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করল। এ ঘটনাও দাস-পরিবারের পক্ষে স্মরণীয়, কিন্তু তবু কোনো উৎসাহ সে পেল না একমাত্র বাপমায়ের কাছ ছাড়া। নকুলেশ্বর ওকে বুঝিয়ে বলল, "ভাগ্য যখন এই দিকেই ফিরেছে তখন চালিয়ে যা যতদূর পারিস।"

নগেনও বুঝে দেখল, এ ছাড়া বড় হবার আর পথ নেই। কালক্রমে আইন পাস করতে পারলে গ্রামের মধ্যে কিছু খাতির পাওয়া যাবে—তার আগে কিছু হবে বলে বিশ্বাস হয় না। যুদ্ধের বাজারে কষ্ট করেও সে আই-এ পড়তে গেল জেলা-শহরে।

সুদীর্ঘ দুটি বছর গেল। বড়ই দুঃখের দুটি বছর। কিন্তু সে সকল দুঃখ ভুলে গেল যখন সে জানতে পারল আই-এ পরীক্ষায় সে পাস করেছে।

এই দুবছরে হরেনও বহুদূর এগিয়ে গেছে। সম্প্রতি তার চিঠি এসেছে, যুদ্ধের কাজে খুব বড় একটা কনট্রাক্টের কাজের ভার সে পেয়েছে। জানাতে ভোলেনি যে এই সৌভাগ্য সহজে কেউ পায় না, কিন্তু সাহেবরা তাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে না বলে তাকেই এত বড় দায়িত্বের কাজটি দিয়েছে। শুধু চিঠি নয়, হাজারখানেক টাকাও পাঠিয়েছে সে বাবার নামে। এই টাকায় বাড়িখানা নূতন ক'রে ফেল, আরও টাকা যা দরকার জানালেই পাঠাব।

এতবড় খবর এ গ্রামে ইতিপূর্বে আর আসে নি। এক হাজার টাকার ইনশিওর করা চিঠিও এ গ্রামের ডাকঘরে অভূতপূর্ব। ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল এই ঘটনায়। এই উত্তেজনার ঘূর্ণিপাকে নগেনের আই-এ পাসের কৃতিত্ব কোথায় তলিয়ে গেল! এই উপলক্ষে নকুলেশ্বর সামান্য কিছু উৎসবের আয়োজন ক'রে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু তারা খাওয়া উপলক্ষ ক'রে সর্বক্ষণ হরেনের গুণগানেই কাটিয়ে দিল। হরেন কন্ট্রাক্টের কাজ শেষ করলে কি ভাবে গ্রামের চেহারা ফিরিয়ে দেবে, এবং কি কি করলে গ্রাম শহর হয়ে উঠবে তারও পরিকল্পনা তারা মুখে মুখে তৈরি ক'রে ফেলল নকুলেশ্বরের বাড়িতে খেতে খেতে। বলা বাহুল্য নগেন সম্পর্কে তারা একটি কথাও বলল না।

দাস-পরিবারে কেউ আই-এ পাস করে নি এটা মস্তবড় ঘটনা, কিন্তু দাসবংশে কেউ সাহেবের কৃপালাভ করে নি সেই ঘটনাই আজ সবচেয়ে বড় হয়ে উঠল। ব্যর্থ হল নগেনের আই-এ পাস করা।

এই আঘাত প্রচণ্ড বেগে নগেনের মনে এক ধাক্কা মারল। সে হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। শপথ করল মনে মনে এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

দিনের পর দিন চলে যায়। যুদ্ধ থেমে গেছে, লোকে সাময়িকভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে, কিন্তু নগেনের মন ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। ভাগ্যদেবতা তাকে কোন্ পথে টানছে তা সে জানে না, কিন্তু এক অদৃশ্য প্রবল টান সে অনুভব করছে দিনের পর দিন।

ইতিমধ্যে হরেনের অলৌকিক সব কীর্তি কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হরেন নাকি লাখ-লাখ টাকা জমিয়ে ফেলেছে, মোটর গাড়ি কিনেছে, বাড়িও নাকি কিনেছে কলকাতা শহরে।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। যুদ্ধের বাজারে টাকা লুটে নেবার যে সুযোগ পাওয়া গেছে তা এবারে কোনো চতুর লোকেরই হাতছাড়া হয়নি। কত ফ'ড়ে এই সুযোগে বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। ধূর্ত হরেনের পক্ষে লাখ-লাখ টাকা করা কিছুমাত্র অসম্ভব ঘটনা নয়।

বিশ্বম্ভরের কোঠাবাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। তাকে কিছুই ভাবতে হয়নি; চক্রবর্তী, দত্ত, সরকার—সবাই মিলে বাড়ি তৈরির সমস্ত ঝঞ্ঝাট স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঘাড়ে নিয়ে বিশ্বম্ভরকে উদ্ধার ক'রে দিয়েছে। রাজপুত্রের বাবা হয়ে নিজে এসব তদারক করা শোভা পায় না, এ কথা ওরা বিশ্বম্ভরকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে, এবং এই নিঃস্বার্থ পাঁচহাজার টাকার কাজে তিন মুরুব্বি মাত্র হাজারখানেক টাকা 'গায়েব' করতে পেরেছে, তার বেশি কিছু তারা লোভও করে নি, নেয়ও নি।

নগেনের বাড়িতেও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। তার বাবা আর বেঁচে নেই। হঠাৎ কলেরার আক্রমণ হয়েছিল। নগেনকে দুএকজন সান্ত্বনা দিতে এসেছিল। চক্রবর্তী দুঃখ ক'রে বলেছিল, "হরেন যখন গাঁয়ের উন্নতির ভার নেবে তখন গাঁয়ে আর কলেরা হবে না। আহা, নকুলেশ্বর সে কটা দিন যদি বেঁচে যেত!"

বাড়ি তৈরির খবর পেয়ে হরেন আরও টাকা পাঠিয়ে আদেশ করেছে, ষ্টীমার ঘাট থেকে বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটা ভাল ক'রে তৈরি করিয়ে রাখতে, মাসখানেক পরেই সে একদিন দেশে যাবে।

রাজপুত্র দেশে আসবে, এ খবর গ্রামের মধ্যে একটা শিহরণ জাগিয়ে তুলল। চক্রবর্তী সবেগে এগিয়ে এলো রাস্তা তৈরির জন্য। হাজার টাকার বরাদ্দ। চক্রবর্তী তার প্রাপ্য অর্ধেক অংশটা উজ্জ্বল ক'রে দেখতে লাগল কল্পনার চোখে। কিন্তু হল না। দত্ত এবং সরকারকে বাদ দেওয়া গেল না, কাজেই

রাস্তা যতটা ভাল হতে পারত, ততটা ভাল হল না। যেটুকু হল সেও ওদের পিতৃপুরুষের পরম সৌভাগ্যবশত ক'দিনের বৃষ্টিতে ধুয়ে পদ্মায় মিশে গেল।

হায় হায় করতে লাগল সবাই। চক্রবর্তী দত্ত দু-দফায় দুঃখ পেল। প্রথমত, রাস্তা ভেঙে গেল; দ্বিতীয়ত, গেলই যদি তা হ'লে সেই রাস্তার জন্যে সাড়ে তিন শ টাকা খরচ করল কেন? শ'খানেক টাকার উপর দিয়েই যেত। এদিকে হাতেও থাকত তিনভাগে তিনশ টাকা ক'রে।

গতস্য শোচনা নাস্তি—চক্রবর্তী পরবর্তী চালের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। সে সংস্কৃত বই খুলে ভাল ভাল আশীর্বচন মুখস্থ করতে লাগল প্রাণপণে, হরেন এলেই সেগুলো তার মাথায় বর্ষণ করবে, এবং তারই জোরে নিজের একপাল অপদার্থ ছেলেকে মানুষ করবার জন্য তার হাতে সমর্পণ করবে।

দত্তও বসে নেই। সে তোরণ তৈরির কাজে লাগল। সরকার শোভাযাত্রার বন্দোবস্ত করল। হরেনের মতো সুসন্তান যে স্কুলে মানুষ হয়েছে সে স্কুলও চুপ ক'রে রইল না, তারাও হরেনকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করবে বলে প্রস্তুত হল। পাবনা শহরে গিয়ে স্কুলের অভাব অভিযোগের তালিকা সহ রিপোর্ট এবং অভিনন্দনপত্র ছেপে আনল। আশা ক'রে রইল হাজার পাঁচেক টাকা আদায় করা যাবেই। স্কুলের নাম হরেন্দ্র হাই স্কুল দেওয়া হবে এই রকম একটা প্রস্তাব করবেন হেডমাস্টার, কিন্তু সে কথা আর কাউকে জানালেন না।

কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। কে জানত হরেন এক মোটর গাড়ি সঙ্গে নিয়ে আসবে? সে আগে পাবনা এসেছিল একটা জরুরি কাজে, অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে সেজন্য ছোট একখানা গাড়ি সঙ্গেই রেখেছিল। তা ছাড়া গ্রামে এসে মোটরে ক'রেই বাড়িতে পৌছবে এ কল্পনাও ছিল। কিন্তু স্টীমার থেকে নেমে পথের অবস্থা দেখে সে তো আগুন। এত টাকা খরচ ক'রে এই পথ। শীক্—সবাই শীক্। চক্রবর্তী কাঁপতে লাগল, তার আশীর্বচন সব ভুল হয়ে গেল। সরকার এবং দত্ত কোনো রকমে বাকী অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত পাল্কী এনে হরেনকে বাড়িতে তুলল। হরেন হেঁটেই যাবে বলে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু তার পথরোধ ক'রে তাকে এত বড় হীন কাজ থেকে সবাই বাঁচিয়ে দিল।

হরেন রাজা হয়ে ফিরেছে এই খবরটাই গ্রামের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তার মোটর গাড়ির খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকের গ্রামে। যুদ্ধের কৃপায় গাঁয়ের লোকেরা এয়ারোপ্লেন দেখেছে, কিন্তু মোটরকার আজ পর্যন্ত

দেখেনি। হরেন গিয়ে বাড়িতে উঠল, কিন্তু হাজার হাজার নরনারী পদ্মানদীর ধারে এসে জমল মোটরগাড়ি কেমন দেখতে।

হরেন বাড়ি থেকে কোথাও বেরোল না। প্রথম থেকেই তার মেজাজ বিগড়ে গেছে। তারপর বাড়ির চেহারা দেখেই বুঝতে পারল বাড়ির কণ্ট্রাক্টে কত টাকা চুরি হয়েছে। সে নিজেও কণ্ট্রাক্টের কাজ করে, 'মাসতুতো ভাই'দের পরিচয় তার কাছে আর অজানা থাকবার কথা নয়। হরেন গুম্ হয়ে রইল। তার কাছে কেউ যেতে সাহস করল না, সবাই তার গাড়ি দেখতে ঝুঁকে পড়ল। আশেপাশের সমস্ত গ্রামে একটা বিপ্লব বেধে গেল। দৈনন্দিন বাজার ঠিকমত বসল না, কারো বাড়িতেই যথাসময়ে উনুন জ্বলল না।

কিন্তু এই মহা উত্তেজনা আর হৈচৈ-এর ভিতর নগেনের স্থান কোথায়? হরেন তার কথা একবার জিজ্ঞাসাও করল না। এটা অবশ্য সে আশা করেনি—কিন্তু আজ তার মনটা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ল। যে দু-একজন বন্ধু লোক ছিল তারাও আজ সমস্ত দিন তার কাছে এলো না, তারাও মোটর গাড়ির উত্তেজনায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে! এই দুঃখটা তার বড্ড বেশি বেজে উঠল মনে। মনে যেন বেদনার ঝড় বয়ে চলেছে। তার বাবার কথা মনে এলো। তার নিচু মাথা নিচু হয়েই ছিল চিরদিন—তার মায়ের মূক বেদনারই বা কোন্ সান্ত্বনা দিতে পারল সে?

কোনো দিকেই তার কোনো জোর ছিল না, কিন্তু জেদ ছিল। এই জেদের বশেই সে আই-এ পাস ক'রে বি-এ পড়তে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু আজ তার মনে হল তার জীবনের গতি চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় সে পড়ে থাকবে না কোনো মতেই। চারদিকের নির্মম ঘা খেয়ে খেয়ে তার কঠিন জেদ কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগল।

মোটর গাড়ির জন্য তার এই অপমান?

আচ্ছা···তাই হোক··

নগেন অস্পষ্ট স্বরে আপন মনেই এক অভাবনীয় শপথ ক'রে বসল। গ্রাম্য আবহাওয়ায় ছোটলোকদের মধ্যে বর্ধিত নগেন এই সব তুচ্ছ মান অভিমানের উপর দিয়ে আজ আর উঠতে পারল না।

বিছানা থেকেও মাসখানেকের মধ্যে প্রায় আর উঠল না। মাসখানেক পরে তাকে দেখা গেল পাশের গ্রামের এক জোতদারের বাড়িতে যেতে।

ক'দিন ধরে পর পর সেখানে গেল। কিন্তু তার ফল যা হল তা আত্ম-হত্যারই নামান্তর

গাঁয়ের লোকেরা যদিও হরেনের কাছ থেকে বিশেষ কিছু আর আশা করছে না, এবং তাকে ঘুঘু ছেলে বলে অভিহিত করেছে, তবু তারা আজও নগেনের প্রতি প্রসন্ন হতে পারল না। তারা তবু বলতে লাগল, "নগেনের মতো হিংসুটে তারা আর দেখেনি—এই হিংসেয় তার মাথা খারাপ হয়েছে।"

কিন্তু কথাটা তারা মিথ্যা বলেনি। নইলে এমন সম্পত্তি কেউ এত শস্তায় বিক্রি করে? এমন মাটি কেউ মাটির দরে বিক্রি করে? একশ বিঘে খামার জমি মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকায়? কেন, হরেনের কাছে চাইলে এই টাকাটা সে অমনি দিতে পারত না? হাজার হলেও ভাই তো?

নগেন বিষাক্ত হাসি হাসল এ সব শুনে।

চক্রবর্তী একদিন এসে বড়ই দরদের সঙ্গে বলল, "নির্বংশে হতচ্ছাড়া, আমাকে একবার জানালি নে?"

চক্রবর্তীর দিকে নগেন অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

চক্রবর্তীকে না জানানো তার নিতান্তই অপরাধ—জানালে সে নিজে কিনতে পারত। হাতে তার কিছু কাঁচা টাকা এসেছে সম্প্রতি।

কিন্তু নগেন এক মুহূর্তে সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে জীবনে আজ এই প্রথম নির্ভীক ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াল মুক্ত আকাশের নিচে। আজ কারো জন্য তার কোনো ভয় নেই, লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, এতদিন সে পড়ে পড়ে বিনা প্রতিবাদে অসহায়ের মতো মার খেয়েছে, কিন্তু আজ সে মারবার জন্য প্রস্তুত। তার মনের বন্ধন যে মুহূর্তে খুলে গেছে, সেই মুহূর্তে সে সম্পূর্ণ নতুন এক শক্তি অনুভব করেছে নিজের মধ্যে। এই শক্তি অদম্য, দুর্বার। এ তাকে কোন্ পথে টানবে তা সে জানে না। এরই অতি প্রবল আকর্ষণে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল অজানা অন্ধকার জগতে।

কলকাতা শহর। নগেন ছুটে চলেছে মোটরে। আজ সে গাড়ির মালিক! মোটর গাড়ি হলে কৌলিন্য হয়, না? তার মনে পৈশাচিক আনন্দ। এই গাড়ি নিয়ে সে গ্রামে ফিরবে। কিন্তু তার আগে হরেনের কাছে তার কৌলিন্য প্রমাণ ক'রে যাবে। আজ এক মুহূর্তের জন্যও সে হরেনের সমপদস্থ হবে এই কল্পনা তাকে উন্মাদ ক'রে তুলেছে। হরেন চমকে যাবে তাকে মোটরে দেখে! তাকে খাতির করতে এগিয়ে আসবে। মূর্খ, টাকার মর্যাদা ভিন্ন আর কোনো মর্যাদা সে বোঝে না।

নগেনের মন ক্রমশ হিংস্র হয়ে ওঠে।

ড্রাইভারকে বলে, "আরও জোরে চালাও, আরও জোরে।" "কত দূর পথ? পথ যে ফুরোয় না?"

অধৈর্যে সে ছটফট করতে থাকে।

ঠিকানা সে ড্রাইভারকে দিয়ে দিয়েছে। সে ঠিক পথেই নিয়ে চলেছে গাড়ি। বহু ছুটন্ত গাড়ির সংঘর্ষ বাঁচিয়ে বে-আইনী গতিতে ছুটে চলেছে সে। এরই জন্য সে যে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ বাজি রেখেছে।

আর কত দূর?...

গাড়ি চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে, কালীঘাট ছাড়িয়ে, টালিগঞ্জেই এসে পড়ল। গাড়ির বেগ কমল। ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট নম্বরের কাছে এলো, আরও ধীরে প্রবেশ করল ফটকের মধ্যে।

ভিতরে প্রশস্ত মাঠ ...ভুল হল না তো?...এখানে এয়ারোপ্লেন কেন?—নগেনের ভ্রূকুঞ্চিত হল।

গাড়ি দ্বিধাগ্রস্তভাবে এগিয়ে চলল।

এয়ারোপ্লেনখানা তখুনি রওনা হচ্ছে। কিন্তু এ যে ছুটে আসছে তাদেরই দিকে! মাটি থেকে একটু উঁচু হল, আরও উপরে উঠল! প্রোপেলারের আওয়াজে কান ফেটে যাচ্ছে। মুহূর্তে এয়ারোপ্লেনখানা সোঁ—ক'রে তার গাড়ির প্রায় পনেরো হাত উপর দিয়ে কামানের গোলার মতো ছুটে উপরে উঠে গেল।

কোথায় এলো সে?

গাড়িসুদ্ধ এগিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "হরেন কোথায়?"

সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র জনতার মধ্য থেকে একজন আকাশের দিকে চেয়েই বলল, "ঐ যে উপরে!"

আর একজন উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, "দেখ দেখ এরই মধ্যে কত উপরে উঠে গেল, দেখ।"

নগেন টলতে টলতে গাড়ি থেকে নেমে আকাশের দিকে চাইল। কিন্তু কোথায় এয়ারোপ্লেন?...সমস্ত আকাশ এত অন্ধকার কেন?...পায়ের নিচে থেকে পৃথিবী সরে যাচ্ছে কেন?...

সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত পৃথিবী ধোঁয়াটে ছিল—পৃথিবী কি আবার সেই অবস্থায় ফিরে গেল?...

'কত উপরে উঠে গেল' এই শব্দটি শুধু সহস্র সূঁচের মতো তার মর্মে বিঁধতে লাগল—চারদিকে আর কোনো শব্দ নেই, কোনো দৃশ্য নেই।

—'ফিরে চল' কথাটি শুধু উচ্চারণ করবার মতো চেতনা তার তখনও অবশিষ্ট ছিল।

(১৯৩৩)

ফেল

অরূপকুমার গত দুবছরের মতো এবারেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে পিতাকে বলল, "বাবা, আমি ফেল করেছি।"

পিতা অক্ষয়কুমার শুনে গম্ভীরভাবে শুধু বললেন, "হুঁ।"

অরূপ কিছুক্ষণ লজ্জিত ভাবে মাথা নিচু ক'রে রইল; তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে কিছু বলতে গেল, কিন্তু বলা হল না। সে দেখতে পেল তার পিতার মুখখানা চার্লি চ্যাপলিনের মতো বেদনাহত। সে সরে পড়ল।

সন্ধ্যাবেলা আবার পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ। অরূপের সলজ্জ ভাবটা কেটে গেছে। সে সহজেই পিতাকে বলল, "আমাকে আর পড়তে বলবেন না, আমি এখন কিছুকাল বাইরে একটু ঘুরে বেড়াতে চাই। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই ভবিষ্যৎটা চিন্তা ক'রে নেব।"

অক্ষয়কুমার আপন মনেই যেন বলতে লাগলেন, "কলকাতার পথে পথে এত হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষের জন্য এত ভিখারীর মৃত্যু, তার মধ্যে যে পড়তে পার নি সে তো বুঝতেই পারছি।"

অরূপ যেন সে কথার প্রতিবাদ ক'রে বলল, "মনের দুর্ভিক্ষ আরও কঠিন, বাবা।"

"সে আবার কি?"—অক্ষয়কুমার চমকিত হলেন। কথাটা তাঁর ভাল লাগল না।

অরূপ বলল, "মনের দুর্ভিক্ষে আত্মার মৃত্যু।"—বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

অক্ষয়কুমার গম্ভীরতর চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে ঘরে গিয়ে বসে পড়লেন। অরূপের মনে হল যেন বিমর্ষ বাস্টার কীটন সামনে থেকে সরে গেল।

অরূপকুমার যে-পথে পা বাড়িয়েছে সে-পথ পরীক্ষা পাসের পথ নয়। কিন্তু সে কথা সে পিতাকে কেমন ক'রে বলে?—কলকাতার সেই সর্বগ্রাসী স্মৃতি! উঃ, দেশভ্রমণ করলেই কি তা যাবে। তবু সে চেষ্টা করবে।

কলকাতা শহর তার নিয়ন্ত্রিত আলোকের রহস্যময় পথে তাকে যে টেনে বের ক'রে আনে প্রতিদিন। তারপর সে গিয়ে পৌছয় সম্পূর্ণ এক অন্ধকার আবেষ্টনে। সেইখানে তার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এক বিচিত্র আনন্দময় জগৎ। সেখানে স্বর্গীয় সঙ্গীত, সেখানে সুখদুঃখ হাসিকান্নায় রচিত মহামানবের বিস্ময়কর সংসার—সেখানে মানুষের হৃদয়ের আবেগময় অনুভূতি তার হৃদয়ে অপূর্ব স্পন্দন জাগিয়ে তোলে।

এই রহস্যের জগতের সঙ্গে অরূপের সমস্ত রক্তকণিকা আত্মীয়তা গড়ে তুলেছে, এ থেকে দূরে পালাবার তার উপায় নেই।

দেশ ভ্রমণ ?

মুখে বলল বটে, কিন্তু তার সমস্ত সত্তা ভিতরে ভিতরে একথার প্রতিবাদ করতে লাগল। যাকে সে হৃদয় সমর্পণ করেছে তার স্মৃতি মন থেকে মুছে যাবে না, যেতে পারে না।

"আপনি যদি দুঃখ পান, তাহ'লে আমি আবার কলকাতাতেই ফিরে যাব।" একটু পরেই অরূপ তার পিতাকে গিয়ে বলল।

রিটায়ার-করা অক্ষয়কুমার মধুপুরের তাঁর নবনির্মিত কুটীরে বসে পুত্রের এই কথায় অনেকখানি তৃপ্তিলাভ করলেন।…কিন্তু মনের দুর্ভিক্ষ। তার মানে কি ?—কথাটা তাঁর মনের কোণে একটি তিল পরিমাণ স্থান অধিকার ক'রে রইল।

কলকাতা শহরে অরূপকুমার সে কোন্ আকর্ষণে বাঁধা পড়েছে ? সে আকর্ষণ সিনেমার। কলেজে পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে সে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় গেছে। প্রথমে সপ্তাহে একদিন, তার পর দুদিন, তারপর প্রত্যহ এবং একা। সিনেমা তাকে গ্রাস করেছে।

সিনেমাগল্পের নায়ক নায়িকা তার পরম আত্মীয়। তাদের হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত তার হৃদয় আলোড়িত করে। জীবনের বহু স্বপ্ন সিনেমার ভিতর দিয়ে সে সফল হতে দেখে। সিনেমার অভিনয় তার মনে নতুন স্বপ্ন জাগায়। অভিনয় লোকের কেন ভাল লাগে, আর্টের আবেদন কোথায় সার্থক, এ সব বিষয় পাঠ্য পুস্তকে পড়তে গিয়ে সে চমকিত হয়েছে। তাতে সে পেয়েছে নিজেরই সমর্থন। যা ছিল বিশ্লেষণমাত্র, তাই তাকে আরও বেশি ক'রে প্রেরণা জুগিয়েছে। অভিনয়-শিল্পের প্রতি তার আকর্ষণ আরও বেড়ে গেছে।

মানুষের জীবনে যে সব সুখদুঃখের খেলা সে অভিনয়ের ভিতর দেখতে পায়, নিজের জীবনের সঙ্গে তা মুখ্যভাবে জড়িত নয়। সেখানে যে মর্মভেদী দুঃখের দৃশ্য দেখে, তাতে তার চোখে জল আসে, কিন্তু তবু তার সঙ্গে সে নিজে সম্পর্কিত নয়। যে হত্যাকাণ্ড এবং অপরাধমূলক অন্যান্য নিষ্ঠুরতার বীভৎসতা তাকে আহত করে, তা থেকে তাকে দূরে পালিয়ে যেতে হয় না। আফ্রিকার জঙ্গলের ভীষণ-দর্শন হিংস্র সিংহের সম্মুখে সে অবলীলাক্রমে বসে থাকতে পারে। নরখাদকদের পল্লীতে, আগুন জেলে, যখন তারা কোনো শিকার করা মানুষকে পুড়িয়ে খাবার আগে উৎসব করে, তার মধ্যে বসে থাকতেও তার ভয় করে না।

জীবনের সমস্ত সুশ্রী এবং কুশ্রী প্রকাশ একই জায়গায় বসে এমন নিশ্চিত মনে দেখার মোহ থেকে সে নিস্তার পাবে কিসে? সিনেমা দেখতে দেখতে সে নিজে কখনও প্রেমিক, কখনও অত্যাচারী বর্বর, কখনও হিংস্র বাঘ, কখনও সিংহের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে।

অরূপের কাছে প্রথমে শিল্পের আকর্ষণই ছিল প্রধান, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শিল্পীরা এসে তার মন অধিকার করল। হলিউডের সব শিল্পী। তারা তার সমস্ত সত্তাকে নাড়া দিতে লাগল। সে ফিলজফিতে মন দিতে পারে না, ইকনমিক্সে মন দিতে পারে না। শেক্সপীয়ার পড়তে গেলে আরও বিপদ। প্রত্যেকটি নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দবেদনামিশ্রিত স্মৃতি জেগে ওঠে তার মনে। রোমিও জুলিয়েট পড়তে নরমা শিয়ারার, টেমিং অব দি শ্রু পড়তে মেরি পিকফোর্ড। লক্ষ্য পথে পা বাড়াতে প্রতি পদে এক একটি ফুল ফুটে ওঠে, ফুলের শোভায় গন্ধে মন মেতে ওঠে, লক্ষ্যের কথা ভুলে যায়।

আচ্ছা, ফেল করার মূলে কি এই সিনেমা? কিন্তু ফেল করার দামেই তো সে জীবনের সার্থকতা কিনেছে। ফেল করা কি লজ্জাকর? তা যদি হয় তা হ'লে সিনেমা তার কারণ নয়। আর যদি সিনেমাই ফেল করার কারণ হয় তা হ'লে সে যেন জন্ম জন্ম ফেল করে।

কিন্তু আবার সে পরীক্ষা দিতে রাজি হল কেন? তার বিদ্যা যেখানে এসে থেমেছে সেইখানেই যে তার সীমা এ কথায় তার সন্দেহ নেই। সে ভাল করেই জানে, সে বিদ্যায় বিশ্ববিদ্যার আলয়ে বার বার মাথা খুঁড়লেও ডিপ্লোমা নামক পার্চমেণ্টের কাগজখানা তার ভাগ্যে জুটবে না।

কিন্তু তবু অন্তরের আকর্ষণকে সে এড়াতে পারল না। এবারেও সে পরীক্ষা দিতে রাজি হল। বুদ্ধিমান পুত্রের বুদ্ধিতে ঘুন ধরল কেন সে খবর পিতা জানতে পারলেন না। তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল বলেই কোনো সন্দেহ তার মনে জাগেনি। তবে দুবার ফেল করাতে পুত্রের উপর বিরক্ত না হয়ে তিনি পারেননি। চটেও গেছেন মাঝে মাঝে, কিন্তু প্রকাশ্যে নয় মনে মনে। সে সময় মনের পা থেকেই অদৃশ্য জুতো বেরিয়ে অতি গোপনে পুত্রের পিঠে গিয়ে পড়েছে।

সেই দিনই রাত্রে শুয়ে শুয়ে অক্ষয়কুমারের মনে একটি কথা হঠাৎ খোঁচা দিল। অরূপ তৃতীয় বার পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাবে বাইরে ঘুরে বেড়াতে চায় কেন? তার মনে কিসের দুর্ভিক্ষ?

এ কথার অর্থ কি?

এর ভিতর কি কোন ইঙ্গিত নেই ?

সে কি মর্মাহত ভাবে এই কথাই বোঝাতে চায়নি যে সংসারে আর তার মন নেই ? কিংবা ঘরে ?

অর্থাৎ সে কি···অক্ষয়কুমার চকিতে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন।

চিন্তার আভাস মাত্রে তাঁর সমস্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে এসে জমা হওয়াতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, তাই উঠে বসে চিন্তাটি সমাপ্ত করলেন···সন্ন্যাসী হতে চায় ?

গভীর রাত্রে অক্ষয়কুমারের চোখে আর এক অন্ধকার নেমে এলো। তিনি হঠাৎ কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়লেন।

তিল পরিমাণ সন্দেহটা ক্রমেই তাঁর মনে তাল পরিমাণ রূপ নিতে লাগল।

তিনি দেখতে পেলেন পুত্র জটাজুটধারী হয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

উপায় কি ?

একই মাত্র উপায় আছে; তাকে সন্ন্যাস থেকে ভ্রষ্ট করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরের ধাপই যদি হয় বিশ্বভুবন, তবে তাকে সেই বিপজ্জনক পদপাত থেকে বাঁচাতে হবে।

অক্ষয়কুমার নিজে বিপত্নীক। ভেবেছিলেন পুত্র কৃতী হওয়ার আগে গৃহের শূন্যতা তিনি যেমন ক'রেই হোক সহ্য করবেন। কিন্তু তা আর হল না।

পাত্রী এক রকম ঠিকই ছিল। অক্ষয়কুমারের এক বন্ধুর কন্যা। তার প্রতিই তাঁর লক্ষ্য ছিল। মেয়েটি ম্যাট্রিক পাস, বড় সুশ্রী, বড় সরল।

মেয়ের দিক থেকেই এতদিন প্রস্তাব চলছিল, অক্ষয়কুমার বরাবর বলে আসছিলেন ছেলে এম-এটা পাস করলেই আর কথা নেই। কিন্তু বাধ্য হয়ে এখন তাঁকেই প্রস্তাব করতে হল।

কিন্তু হায়, তিনি জানতে পারলেন না, তিনি কি হারাচ্ছেন !

অরূপ স্তম্ভিত হল সব শুনে। মন তার একেবারেই প্রস্তুত নয়। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে বুঝতে পারলে—বন্দোবস্ত এমন কঠোর ভাবে পাকা, যে এ থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

চুপচাপ মাঠের ধারে বসে বসে সে কদিন মনটাকে প্রস্তুত করতে লাগল।

ক্রমে বিবাহিত জীবনের কল্পনাটা তার কাছে ভালই লাগল। সিনেমাতেও সে বিবাহদৃশ্য অনেক দেখেছে। হঠাৎ-পরিচয়ের পর প্রেমের পথে দ্রুত ধাবন এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহ।

কিন্তু···সিনেমায় প্রথম দৃশ্যেই যাদের বিয়ে হয় তারা তো সুখী হয় না। তবে কি সে ভুল করবে ? না না। ভুল সে করবে না। এর মধ্যে এক

অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ আছে। এ যেন আলো থেকে অন্ধকারে—জানা থেকে অজানায় ঝাঁপিয়ে পড়া। আর এই তো বীরের পথ—এই পথেই সে জীবন নাট্যের প্রধান ভূমিকায় নামতে পারবে।…

বিবাহের পর বরবধূর প্রথম মিলন-রাত্রি।

অরূপের হৃদয়ে পুলক, মনে উন্মাদনা।…নীহারিকা! বেশ নামটি। ওকে ডাকা যাবে, মনোহারিকা!… চোখ দুটি ঠিক গ্রেটা গার্বোর মতো। জ্রদুটো কামিয়ে সূক্ষ্ম ধনুরেখার মতো ক'রে দিলেই কুইন ক্রিষ্টিনা!

অরূপ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নীহারিকার মুখখানির দিকে।…কিন্তু কি নিয়ে আলাপ করা যায়?

সমস্যা কঠিন।…অরূপ বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। প্রথম বারেই স্ত্রীর মনে রেখাপাত করা চাই। সাধারণ কথায় চলবে না। প্রথমেই একটা নাটকীয় ভঙ্গী চাই। সিনেমা ছবিতে দেখা সমজাতীয় দৃশ্যের কথা মনে আনার চেষ্টা করল সে। কিন্তু কাজের সময় কোনোটাই কি মনে পড়ে?…তবে কি সে স্ত্রীর কাছে হার মানবে? তার কাছে ছোট হবে?

অবশেষে মরীয়া হয়ে ডাকল, "নীহারিকা"—

নীহারিকার বুকে তখন আনন্দের ঢেউ ভেঙে পড়ছে। স্বামীর মুখের প্রথম সম্ভাষণ। তার নিজের নাম যেন একটি স্বতন্ত্র রূপ ধরে তার কানে ধ্বনিত হল।

"নীহারিকা"—

নীহারিকার মুখে কোনো কথা নেই।

আবার ডাকল, "নীহারিকা।"

নীহারিকা অস্ফুট স্বরে বলল, "কি?"

অপ্রস্তুত অরূপের মুখ থেকে ফস্ ক'রে বেরিয়ে এলো "তুমি 'নিনচ্‌কা' দেখেছ?"—অরূপ জানল না, তার বিবাহিত জীবনের ফাঁসীর হুকুম বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে।

নীহারিকা নির্বাক।

"দেখেছ? কি সুন্দর, না?"

অরূপ বুঝতে পারছে প্রথম মিলনের ঠিক সুরটি সে লাগাতে পারছে না—কিন্তু তবু যেন কোন্ এক অদৃশ্য অন্ধ শক্তি তাকে এই পথে জোর ক'রে ঠেলে দিল।

"বল, নীহারিকা!"

নীহারিকা ভীতভাবে বলল, "কি বলব?"

"নিনচ্‌কা?"

"জানি না সে কি। দেখিনি।"

নীহারিকা নিজের অজ্ঞতাজনিত মহা অপরাধে এতটুকু হয়ে গেছে।

অরূপ স্তম্ভিতভাবে দেখছে তার অজ্ঞতার পরিধি।

"গ্রেটা গার্বোকে দেখেছ?"—স্বর এবারে দৃঢ়।

নীহারিকা কেঁদে ফেলল।

অরূপ বিছানায় অর্ধশায়িত ছিল লাফ দিয়ে উঠে বসল।

বিবাহ এত বড় ফাঁকি?

সে আর স্থির থাকতে পারল না, সর্পাহতের মতো ঘরের মধ্যে ছটফট করতে লাগল আর আপন মনে, শূন্য দৃষ্টিতে, বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগল—"টু বী, অর নট্ টু বী"—"টু বী, অর নট্ টু বী—"

পরদিন অরূপের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। আরও দুদিন কেটে গেল। তৃতীয় দিনে চিঠি পাওয়া গেল। "ব্যর্থ বিবাহে জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, অতএব সার্থকতার অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করলাম। বি-এ ফেল করেছি, বিয়েতেও ফেল করলাম, আমার অপরাধ মার্জনা করবেন।"

আরও কিছু দিন পরে খবর পাওয়া গেল, বোম্বাইতে কোন এক সিনেমায় নায়কের ভূমিকা নিয়ে সে বেশ জমিয়ে তুলেছে।

(১৯৪৬)

ভেলকি

১

যে ঘটনা ঘটবে, আগে থাকতেই তার ছায়াপাত হয়, এই রকম একটা প্রবাদ ইংরেজদের মধ্যে চলতি আছে। কিন্তু আসন্ন ঘটনার ছায়াকে উক্ত ঘটনার কারণ বলে মনে করা ঠিক নয়, একটা আর একটার পূর্বে ঘটে মাত্র।

আমার কাছে কিন্তু সবই ইন্দ্রজাল বলে বোধ হয়। যেন কোনো অদৃশ্য জাদুকর আড়ালে বসে সুতো টানছেন, আর তারই টানে টানে কেউ বলছে শান্তি চাই, কেউ বলছে রক্ত চাই, কেউ আরামে বসে চা খাচ্ছে, কেউ হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করছে। অর্থাৎ সবই কার্যকারণ শৃঙ্খলে বাঁধা।

এই ভাবে দেখতে গেলে যাবতীয় ঘটনাপারম্পর্য পুঞ্জীভূত হয়ে মনকে পিষে মারতে চায়, সুতরাং তত্ত্বকথা বেশি দূরে না টেনে দৃষ্টিকে সুশীল, মাধব আর মিহিরের সঙ্কীর্ণ পরিসরে নিবদ্ধ করা যাক।

সুশীল ওকালতি পাস করেছে সম্প্রতি, মাধব এম. এ. পরীক্ষায় ফেল করেছে, মিহির গত এম-এস্‌সি. পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণী লাভ করেছে। কিন্তু বুদ্ধিপ্রখরতায় ওদের মধ্যে মিহিরের ব্যক্তিত্বই আর সবার উপরে।

বয়স ওদের কারোই চব্বিশের বেশি নয়, সবাই অল্পবিস্তর ছিটগ্রস্ত. বিষয়-বুদ্ধির ছোঁয়াচ লাগে নি কারো মনে, মন এখনো অপরিণত, যদিও কোনো বিষয়ে আলোচনা কালে বুদ্ধি ওদের মুহূর্তের মধ্যে বেশ সজাগ হয়ে ওঠে। বহু জনের মতে যে সিনেমা ছবিটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, টিকিট কিনে সেইটি দেখতে যায় ওরা আমোদ বেশি পাওয়া যাবে বলে, তা নিয়ে হাসা যাবে বলে। বাজার থেকে নিকৃষ্ট বই বেছে বেছে কেনে, আলোচনা এবং উত্তেজনার বিষয়বস্তু পাওয়া যাবে বলে। রেডিও খুলে চীনদেশীয় সঙ্গীত শোনে প্রতিবেশীকে বিভ্রান্ত করবে বলে। প্রবীণেরা বলেন, ওরা বালকই রয়ে গেল, সাবালক হল না।

সন্ধ্যাবেলা। সুশীল বন্ধুদের আগমন অপেক্ষায় তার বৈঠকখানা ঘরটিতে বসে 'লিসেনার' সম্পাদক রিচার্ড ল্যাম্বার্টের লেখা বি. বি. সি.র আভ্যন্তরীণ অবস্থা সংক্রান্ত একখানা বই পড়ছিল। তার এক জায়গায় ইণ্ডিয়ান রোপ ট্রিক বা ভারতীয় দড়ির খেলার কথা বেশ বিস্তারিত ক'রে লেখা আছে। সেই জায়গাটা সে বেশ তদ্গতচিত্ত হয়ে পড়ছিল।

এমন সময় মাধব এসে হাজির। সুশীল তাকে পেয়ে যেন একটা বিরাট নৈরাশ্যের হাত থেকে বেঁচে গেল।

"আচ্ছা বলতে পার লোকে ম্যাজিক দেখে অবাক হয় কেন?"

মাধব তার অভ্যস্ত আসনখানি দখল ক'রে বসল এবং বলল, "লোকে একটু আমোদ উপভোগ করতে চায়, তা যে কোনো উপলক্ষেই হোক না, আপত্তি কি? তা কি বই পড়ছিলে?"

"বইখানা ম্যাজিক সংক্রান্ত নয়"—বলে সে তার ভিতরকার ঐ অধ্যায়টি মাধবকে পড়ে শোনাল, এবং বলল, "ম্যাজিকের কৌশলটা তো একটা ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়। হাতের মুঠোয় একটা টাকা ছিল, মুঠো খুলে দেখা গেল টাকাটি নেই—এতে অবাক হবার কি আছে? যদি জানা থাকে টাকাটা থাকবে না, আর সবাই যদি সেটা আগেই ভেবে নেয়, তা হ'লে আমোদটা কোথায়?"

মাধব হেসে বলল, "আগে ভাববে কেন? যাতে না ভাবতে পারে জাদুকর সেই চেষ্টাই তো করে।"

এমন সময় উক্ত রঙ্গমঞ্চে মিহিরের আবির্ভাব ঘটল, আর সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেরই চোখ আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু'জনের দ্বন্দ্বে তৃতীয় ব্যক্তির দেখা মিললে দু'জনেই মনে করে তাকে নিজের দিকে টেনে যুক্তির জোর বাড়ানো যাবে।

মিহির একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তাদের দিকে চেয়ে বলল, "সামনে বই খোলা এবং দু'জনেই সীরিয়স, ব্যাপার কি?"

সুশীল বলল, "জাদুবিদ্যা। বলছিলাম ম্যাজিক জিনিসটা আদিম প্রবৃত্তিকে তুষ্ট করে। যখন লোকে প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাতেই অলৌকিকত্ব খুঁজত সেই সময়ের মন এখনও যাদের মধ্যে আছে তারাই ভেলকিতে ভোলে।"

মিহির বলল, "একটু চা খাওয়াবে?"

সুশীল ব্যস্তসমস্তভাবে উঠে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা ক'রে এলো।

"ভাগ্যিস আদিম লোকেরা চা খেত না, নইলে হয়তো শুনতে হত এটাও আদিম অতএব এতে আনন্দ নেই।" বলে মিহির হাসতে লাগল।

মাধব বলল, "আদিম বল, এডাম বল, বা আদমি বল, এড়াবার উপায় নেই, কারণ আমরা সবাই আদিম—একেবারে আদিম আদমি।"

সুশীল বলল, "আমরা আদমি নই, মানুষ।"

মিহির বলল, "তুমি একটি অমানুষ।"

সুশীল বলল, "মানুষ বলেই চট ক'রে অমানুষ হতে পারি, কিন্তু আদমি তা পারে না, অনাদমি হওয়া কঠিন।"

"কিন্তু তোমার জাদুবিদ্যার কথা বল—বৈঠকখানা ঘরকে জাদুঘরে পরিণত করলে কেন দেখা যাক।"

সুশীল বলল, "আমার মতে ভেলকি জিনিসটি হাত সাফাইয়ের ব্যাপার, ওটা আর্টের পর্যায়ে পড়ে না। ওতে পরিণত মন ভোলে না, ছোটদের মন ভোলে, এই কথাটাই মাধবকে বোঝাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ওকে ভোলাতে পারছি না, এখন তোমার মতটা জানতে পারলেই একটা মীমাংসা হয়ে যায়।"

মিহির বলল, "চিন্তাশক্তিকে পোলারাইজ ক'রে বসে আছ দেখছি। চারদিকে ছড়ানো আলোকরশ্মিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে এমন করা যায় যাতে তা শুধু নিয়ন্ত্রকের খুশীমতো এক দিকে ছড়াবে। চিন্তাকেও সেই রকম নিয়ন্ত্রণ করার দরকার মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু তর্কের সময় নয়। তর্কের সময় বিষয়বস্তুর চারদিকে চিন্তাটাকে বিকিরণ কর, দেখবে তুমি যা দেখছ তার চেয়ে আরও বেশি দেখা যায়।"

সুশীল কিঞ্চিৎ অসহায়ের মতো মিহিরের দিকে চেয়ে বলল, "বুঝলাম না কথাটা।"

"না বোঝার কিছু নেই, সোজা কথা। অর্থাৎ যা কিছুতে মন ভোলে তা সবই জাদু। ভিতরের কৌশলটা জানলেই কি তার মাধুর্য কমে? তোমার এই আদমিকেও তো বৈজ্ঞানিক-আদমি টুকরো টুকরো ক'রে দেখেছে, সবই কতকগুলো রাসায়নিকের যোগাযোগ। জাদুকরের জাদু ফাঁস হয়ে গেছে অনেক কাল, কিন্তু—কি বল মাধব—মানুষের রহস্য কিছু কমেছে কি?"

মাধব কিছু রোমান্টিক ধর্মী, সে ইতিমধ্যেই তার কোনো প্রিয়জনকে কল্পনার চোখে রহস্যাবৃত ক'রে দেখতে শুরু করেছিল, মিহিরের প্রশ্নে চমকে উঠে বলল, "আমিও তো তাই বলি—নইলে তোমার দা ভিঞ্চি, মিশেল-আঁজ, রাফায়েল এত পূজো পেতেন কি ক'রে?"

মিহির বলল, "তাঁরা তো তুলিতে এঁকেছেন মানুষকে, আমরা মনে মনে এঁকে চলেছি সর্বক্ষণ।"

মাধব চমকে উঠে ভাবল, টের পেয়েছে না কি মিহির তার মনের কথা?

মিহির বলতে লাগল, "আসল কথা কি জান? এই যে তোমার টেবিলে—কি বইখানা পড়ে আছে—এ-রি-য়ে-ল অ্যা-ণ্ড হি-জ কো-য়া-লি-টি। কি বিষয়ের বই এটা?—এর প্রথমেই দেখছি টেম্পেস্ট থেকে উদ্ধৃতি—

"All hail, Great Master, grave Sir, hail : I come
To answer thy best pleasure"...

আশ্চর্য নয় কি এই এরিয়েল,? এই টেম্‌পেস্ট নাটক ? শেক্সপীয়ার কি জাদুকর নন ? যে শব্দগুলো ব্যবহার ক'রে তিনি তাঁর নাট্যজগৎ সৃষ্টি ক'রে গেছেন সে শব্দগুলো কি অভিধানে মেলে না ? সেগুলো তুমি সাজাও না নিজের ইচ্ছামতো—হও না দ্বিতীয় শেক্সপীয়ার ? বাংলা শব্দকোষ নিয়ে বসে, হও না দ্বিতীয় রবি ঠাকুর ?"

সুশীল বলল, "তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ—কোথায় ম্যাজিক আর কোথায় সাহিত্য!"

মিহির সদ্যাগত চায়ের দিকে চেয়ে বলল, "দাঁড়াও আগে চা খেয়ে নি।"

চা খাওয়ার পরে মিহির এমন এক বক্তৃতা দিল যাতে সুশীলের আর কিছু বলবার রইল না। সে বুঝতে পারল বিশুদ্ধ উপভোগের ক্ষেত্র বিস্তৃত, সবারই মূল উদ্দেশ্য মন ভোলানো, তবে এটুকু স্বীকার্য যে জাদুবিদ্যা নিম্নশ্রেণীর আর্ট। আরও বুঝল ম্যাজিক দেখার সময় কৌশল টের পাওয়াটা বড় কথা নয়, জাদুকর তার সাহায্যে কতখানি মন ভোলাতে পারল সেটাই বড় কথা।

ঘরের মধ্যেকার উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়াটা এতক্ষণে কেবল একটুখানি স্বাভাবিক হয়ে আসছিল, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল।

ওদের আর এক বন্ধু, উপেন, বেশি রকম উত্তেজিতভাবে এসে বলল, "এখনও ঘরে বসে আছ তোমরা ?"

"কেন, হঠাৎ উঠে যাবার কি ঘটেছে ?" প্রশ্ন করল মাধব।

"অমর সিং এসেছে কলকাতায়।"

"অমর সিং ?"—সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। "বল কি ? কবে এসেছে ?"

"বিশেষ সংখ্যা কাগজ বেরিয়ে গেছে এই খবর নিয়ে—পড়ে দেখ।"

সবাই উপেনের হাতের কাগজ খুলে মস্ত বড বড় অক্ষরের মোটা শিরোনামা পড়ল—"কলিকাতায় বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর অমর সিং।"

"দেখতে হবে এই অমর সিং-এর খেলা।" বলল মিহির।

"আমিও দেখব।" বলল মাধব।

"আমিই কি বাদ যাব ?" বলল সুশীল।

বলা বাহুল্য এর পর আর কোনো আলাপ জমল না। এত বড় একটা উত্তেজক খবর, একেবারে অভাব্য, অচিন্ত্য খবর। সুতরাং শহরের বিরাট মানবস্রোতের সঙ্গে এদের চিন্তাস্রোত অমর সিং-এর দিকে প্রবলবেগে ধাবিত হয়ে চলল। মনে সন্দেহ জাগল তবে কি ঐ প্রবাদটাই সত্য ? অমর সিং

আসবে বলেই কি জাদুবিদ্যা এদের মনে তার পূর্বাভাস জাগিয়েছিল? হয় তো তাই।

২

পৃথিবী ভ্রমণ শেষ ক'রে উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম সকলদিকের জাদুকরদের পরাজিত ক'রে এক-জাহাজ মেডেল ও অন্যান্য পারিতোষিক নিয়ে অমর সিং এসেছেন কলকাতা শহরে। বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর উর্দ্যা এবং হুডীনির প্রধান শিষ্যেরা অমর সিং-এর কাছে হার মেনেছেন, ভারতবর্ষের এটা জাতীয় গৌরব।

এত দিন সবার জানা ছিল হাতকড়া লাগানো অবস্থায় বাক্সবন্দী জাদুকরের বাক্স থেকে অনায়াস নির্গমনই হচ্ছে জাদুবিদ্যার চরম খেলা। যেমন খুশি, যেখানে খুশি, দর্শকদের নিজ হাতে তৈরি সিন্দুকে তালার পর তালা লাগিয়ে যেখানে ইচ্ছা বন্ধ ক'রে রাখা হোক না, সেই বন্ধন এবং বন্দিত্ব মুহূর্তে ঘুচিয়ে জাদুকর বেরিয়ে এসে দর্শকদের সঙ্গে কোলাকুলি করেন—এর চেয়ে বড় কৌশল আর নেই। কিন্তু অমর সিং এ কৌশলকে ছাড়িয়ে বহু উর্ধ্বে উঠে গেছেন। অর্থাৎ তিনি বেরিয়ে আসেন না, আবির্ভূত হন না, অদৃশ্য হন। রাত্রের কালো যবনিকার সম্মুখে দর্শকদের দিকে কড়া আলো ফেলে অদৃশ্য হওয়ার যে খেলা সবাই জানে, অমর সিং-এর খেলা সে খেলা নয়। তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে লোকবেষ্টনীর কড়া পাহারার মধ্যে সবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অদৃশ্য হন।

এ খেলার বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে চোখে ধুলো দেওয়া নেই। শিবজীর অদৃশ্য হওয়া, সুভাষ বসুর অদৃশ্য হওয়া, অথবা লায়েক আলির অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে এর তুলনা চলে না। এ একেবারে অলৌকিক। অতএব লৌকিক আকর্ষণ যে এর সবচেয়ে বেশি হবে সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

৩

রেখাচিত্রে সূর্যোদয়ের ছবি আঁকবার একটা পরিচিত প্রথা আছে। একটি দিগন্তজ্ঞাপক রেখা, তার সঙ্গে সংলগ্ন একটি অর্ধবৃত্ত এবং তা থেকে বিচ্ছুরিত অনেকগুলি সরল রেখা সূর্যরশ্মির পরিচয় বহন করে।

গত এক সপ্তাহ ধরে কলকাতা শহরের একটি বিশেষ অংশে এই রকম একটি সূর্যোদয়ের বৃহৎ রেখাচিত্র বিমানভ্রমণকারীরা আকাশ থেকে দেখতে পাচ্ছে।

বিষয়টিতে রহস্য কিছুই নেই। ঐ অর্ধবৃত্ত হচ্ছে অমর সিং-এর প্রকাণ্ড প্যাভিলিয়ন, আর রশ্মিরেখাগুলি সাতটি বিভিন্ন 'কিউ'-এর রেখা।

প্রথম দু'দিন খেলা দেখানো সম্ভব হয় নি, শহরের যাবতীয় লোক একসঙ্গে গিয়ে ভেঙে পড়েছিল সেখানে, অনেকে হাড ভেঙেও পড়েছিল, অবশেষে সেনাবিভাগের সাহায্যে ভিড় নিয়ন্ত্রিত ক'রে, সাতটি বিভিন্ন 'কিউ' রচনা ক'রে তবে দেখানো সম্ভব হয়েছে। বৃদ্ধ পুরুষ, বৃদ্ধা মহিলা, যুবক পুরুষ, যুবতী মহিলা, বালক, বালিকা, এবং খোকা ও খুকীর (এটি সম্মিলিত) পৃথক গেট এবং 'কিউ' করাতে এবং সমস্ত আসনের নম্বর ক'রে দেওয়াতে সবার পক্ষেই খুব সুবিধাজনক হয়েছে। প্রত্যেক গেট-মুখ পর্যন্ত যে এক একটি লাইন দাঁড়িয়েছে তার পিছনের দৈর্ঘ্য সীমাহীন।

বহু লোক মনুমেণ্টের মাথায় উঠে এই দৃশ্য দেখছে, কারণ এরও একটি আশ্চর্য শোভা আছে। তা ভিন্ন প্রত্যেক দুটি কিউ-এর মধ্যবর্তী স্থানে একটি ক'রে সাঁজোয়া গাড়ি স্থাপিত হওয়াতে দৃশ্যটি সুন্দরতর হয়ে উঠেছে।

সাত দিনের চেষ্টার ফলে সুশীল, মাধব এবং মিহির বসতে পেরেছে ভিতরে গিয়ে। বহু রকমের খেলা, বিচিত্র সব ভেলকি, একটার পর একটা দেখানো হচ্ছে। কত ঘড়ি চূর্ণ হয়ে আবার নতুন হল, কত পায়রা বেরিয়ে উড়ে গেল একটা টুপীর মধ্য থেকে, কত তাসের খেলা, টাকার খেলা, ভূতের খেলা, কিন্তু তবু সেগুলো যেন দর্শকদের মনে ধরছে না। এরা শুধু দেখতে চায় সকল খেলার সেরা খেলা—অমর সিংএর অন্তর্ধান।

সেই খেলা অবশেষে দেখানো হল। কঠিন দর্শক-প্রাচীব-বেষ্টিত অমর সিং প্রথমত ভারতীয় তান্ত্রিক সাধনা, হঠযোগ এবং বহু প্রকার কৃচ্ছ্র যোগের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিলেন এবং বলেলন, "এবারে আসি।"

সবাই চমকিত বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে দেখে অমর সিং নেই।

দীর্ঘস্থায়ী করতালিতে চন্দ্রাতপের নিচে এক অভূতপূর্ব আনন্দ পরিবেশ। হঠাৎ দেখা গেল অমর সিং দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপালের পাশে। —বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়।

রাষ্ট্রপাল উঠে দাঁড়িয়ে জাদুকরকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে বললেন, "আজকের পৃথিবীতে অমর সিং-এর মতো ঐন্দ্রজালিক আর কেউ নেই।"

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হতে না হতে এক স্থূলকায় ব্যক্তি বলে উঠলেন "জুড়ি আছে। সেই জুড়ির কাছে অমর সিং শিশু।"

দর্শকেরা এ কথা শুনে প্রায় ক্ষেপে গেল, বলল, "হতে পারে না—ও রকম

অসম্ভব কথা আমরা শুনতে চাই না।" এই চিৎকারের মধ্যে সুশীল, মাধব, মিহির এবং উপেনের কণ্ঠও শোনা গেল।

স্থূলকায় বললেন, "সত্য কথা বলছি।"

গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখে রাষ্ট্রপাল দ্রুত চলে গেলেন সেখান থেকে। জনতা স্থূলকায়কে চ্যালেঞ্জ ক'রে বলল, "নিয়ে আসুন আপনার জাদুকরকে।"

স্থূলকায় বললেন, "তাঁর মঞ্চ এখানে নয়, উত্তর-প্রদেশে, সেখানে গিয়ে দেখতে হবে তাঁর খেলা।"

তখন স্থূলকায়ের পরিচয় নেওয়া হ'ল, এবং সবাই বুঝতে পারল, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তিনি, তাঁর কথা অবিশ্বাস করা যায় না।

হৈ হৈ পড়ে গেল সভাস্থলে। সে কি উত্তেজনা! কি উৎসাহ! সঙ্গে সঙ্গে কমিটি গঠন করা হয়ে গেল এবং ঠিক হল, স্বয়ং অমর সিং সেখানে গিয়ে সেই খেলা দেখবেন এবং তিনি নিজে যদি স্বীকার করেন সে খেলা তাঁর খেলার চেয়েও চমকপ্রদ, তা হ'লে সে কথা মানা হবে, অন্যথায় হবে না।

কিন্তু অমর সিং-এর মুখে একটি কথা নেই। অমর সিং কিছু না বললে চ্যালেঞ্জ করার কোনো মানে হয় না। বহু সাধ্যসাধনা ক'রে শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজি করানো হল। সুশীল, মাধব, মিহির বলল, "আমরাও যাব আপনার সঙ্গে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এর মধ্যে কোথায়ও ধাপ্পা আছে, কিন্তু সেটা কি তা না দেখা পর্যন্ত বলা শক্ত।"

স্থূলকায় ব্যক্তিটি সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা ক'রে ফেললেন এবং ঠিক হল উত্তর-প্রদেশের প্রদেশপাল স্বয়ং খেলায় উপস্থিত থাকবেন।

সে খেলার কথা যা শোনা গেল তা সত্যই অবিশ্বাস্য। কিন্তু যদি সত্য হয়, তা হ'লে অমর সিং-এর ভাগ্যে কি হবে তা অনুমান ক'রে সবাই শিউরে উঠল। শোনা গেল প্রকাণ্ড একটি পাহাড় সবার সম্মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে। কথার ফাঁকি নেই এর মধ্যে, কেউ হয় তো মনে করতে পারে পাহাড় তো ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় অথবা অ্যাটম বোমায়, কিন্তু ব্যাপার তা নয়। পাহাড়ের চারদিকে যত ইচ্ছা লোক থাকতে পারে, পুলিস থাকতে পারে, সৈন্যদল থাকতে পারে, কিন্তু তবু প্রকাশ্য সূর্যালোকে দৃশ্য পাহাড় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

সুশীল মিহিরকে বলল, "ভাবতে পারছ কিছু?"

মিহির বলল, "কৌশলটা আমার কাছে অবান্তর, আমার কাছে এ রকম

একটি ঘটনাই হচ্ছে বড় কথা। কি ক'রে হয় জানতে চাই না, বুঝতেও চাই না, আমি শুধু উপভোগ করতে চাই।"

মাধব বলল, "আমি আর্টের জন্যেই আর্ট কথাটা ষোল আনা মানি না, তাই ওর কৌশলও খুঁজি, উদ্দেশ্যও খুঁজি।—সব আমি তলিয়ে বুঝতে চাই।"

সুশীল বলল, "তোমরা সবাই মিলে যা চাও আমিও তাই চাই।"

দিন ঠিক হয়ে গেল। কলকাতা থেকে অমর সিং-এর সঙ্গে বিমানে গেল পঞ্চাশ জন বিচারক। তার মধ্যে মিহির, সুশীল ও মাধব। পরে দেখা গেল উপেনও তার মধ্যে স্থান পেয়েছে কোনোমতে।

রেলগাড়িতে যে কত লোক গেল তার সংখ্যা নেই। তারা সবাই যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছল উত্তর-প্রদেশে। সব আয়োজন আগে থাকতেই পাকা করা ছিল।

বিপুল জনতা, বিপুল উল্লাস, বিপুল উত্তেজনা। একটি দিন ধরে কি যে হয়ে গেল তা প্রকাশের ভাষা নেই।

৪

খেলা দেখানো শেষ হয়েছে। নিশ্বাস রোধ ক'রে সবাই সকল ভেলকির চরম ভেলকি দেখেছে। কিন্তু কলকাতার উৎসাহীদের চোখে সকল আলো নিবে গেছে, তাদের সকল আশা ভেঙে গেছে, সকল উৎসাহ জল হয়ে গেছে, রক্তের চাপ কমে গেছে, ধাত বসে গেছে, কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে, মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গেছে, কনুই-হাঁটুর অস্থিবন্ধনী ঢিলে হয়ে গেছে, কটিদেশ বেদনায় টনটন করছে, কপালের শিরা দপ দপ করছে, পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গেছে।

আর অমর সিং? তাঁর অবস্থা অবর্ণনীয়, সবচেয়ে সঙ্কটজনক। অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে হাঁসপাতালে আনা হয়েছে, হাত-পা ঠাণ্ডা—গরম সেঁক দিচ্ছে নার্সরা, উত্তেজক ইন্‌জেকশন দিচ্ছে ডাক্তাররা, উপরন্তু পেটে কিছুই থাকছে না বলে শিরার ভিতর গ্লুকোসের জল ঢোকানো হচ্ছে।

দীর্ঘ সাত দিন কাটল এই ভাবে। ম্যাজিক বিষয়ে সকল তত্ত্বকথা ওদের মনে ওলোটপালট হয়ে গেছে। সবারই মুখ ঝুলে পড়েছে, সবাই নির্বাক, শুধু বসে বসে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকানো।

দিন তিনেক পরে একে একে সবাই কলকাতা ফিরতে লাগল। অমর সিং বিমানে ফিরলেন, ফিরল না শুধু সুশীল, মাধব আর মিহির।

কলকাতায় যারা ফিরে এলো, তাদের আর কাউকে কিছু বলতে হল না, খবর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। তা ছাড়া বলবার কিছু ছিল না।

সেখানে যে খেলাটি সবাই দেখল সেটি হচ্ছে এই যে পাহাড়টি ঠিক পাথরের পাহাড় ছিল না, দশ লক্ষ মণ চিনির বস্তার পাহাড়।

সরকারের লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, পুলিস ছিল, সেনাদল ছিল, স্বয়ং প্রদেশপাল ছিলেন, সরকারী খাতায় চিনির হিসাব ছিল, তাতে লেখা ছিল সাত লক্ষ মণ চিনি উদ্বৃত্ত আছে। কিন্তু জাদুদণ্ডের ছোঁয়া লেগে সবার সামনে চিনির পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল, পড়ে রইল নিচের স্তরের পাটাতনগুলি, এবং হিসাব ক'রে দেখা গেল সাড়ে ন'লক্ষ মণ ঘাটতি পড়েছে।

কি ক'রে এটি সম্ভব হল তা সরকারী বুদ্ধি, বে-সরকারী বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, অবৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অগম্য। স্বয়ং অমর সিং-এর জাদু-কৌশল পরাহত।

সুশীলরা পড়ে রইল উত্তর-প্রদেশে, একটি প্রশ্নের উত্তর তাদের চাই-ই, নইলে তারা ফিরবে না পণ করল।

ওরা তিন বন্ধু জাদুকরের পদধূলি নিতে লাগল প্রতিদিন। কিন্তু তবু প্রশ্নের উত্তর মিলল না। মিহিরের মুখে একমাত্র প্রশ্ন, এত বড় পাহাড় গেল কোথায়!

অবশেষে জাদুকর ওদের অবস্থা দেখে করুণাভরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, "সিঙ্গাপুর"।

পরদিনই কাগজে খবর বেরুল, সিঙ্গাপুরে উত্তর-প্রদেশের সাড়ে ন'লক্ষ মণ চিনির চোরা চালান ধরা পড়েছে।

(১৯৫০)

বহুরূপী

এখন কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে সাংবাদিক, ত্রিশ বছর আগে এ রকম ছিল না। তখন আমরা সাংবাদিককে দেখতে খবরের কাগজের অফিসে যেতাম।

বর্তমানে সাংবাদিক-পপুলেশন বৃদ্ধির কারণ—এ যুগটাই হচ্ছে সংবাদের যুগ। দুই যুগের সংবাদেও তফাৎ কত। আগে ঘটনা আগে ঘটত, এখন সংবাদ আগে ঘটে। চাই সাংবাদিক প্রতিভা।

কিছুকাল আগে এক সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হঠাৎ আলাপ। আমার বাড়ির সামনে কয়েকদিন তাঁকে ঘুরতে দেখেছিলাম একখানা নোট বই ও পেন্সিল হাতে। দেখতাম তিনি মাঝে মাঝে সে নোট বইতে কি সব টুকে রাখছেন। পুলিসের লোক ভেবেছিলাম আগে। অদম্য কৌতূহল বশত একদিন দু'এক কথায় আলাপ শুরু করলাম, ক্রমে আলাপ জমে উঠল।

তিনি যে সাংবাদিক সে পরিচয় তিনিই দিয়েছিলেন।

তখন কলকাতা শহরে দুর্ভিক্ষে পথে পথে লোক মরছিল। একদিন বলেছিলাম তাঁকে, "কেমন দেখছেন সব ?" আমার প্রশ্নটি অবশ্য নিতান্তই অর্থহীন ; উদ্দেশ্য, কোনো রকমে একটু আলাপ জমানো।

তিনি বললেন, "অদ্ভুত।"

"কি পরিমাণ লোক মরছে ?"

"স্বাভাবিক।"

কথাটা ভাল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "স্বাভাবিক মানে কি ? রিপোর্টটা কি ভাবে লিখছেন ? যত লোক মরছে ততটাই কি আপনি আশা করছেন ?"

"মৃত্যুর কথা কিছু লিখছি না।"

"কেন ?"

"আমাদের দেশে ওটা খবর নয়।"

"বলেন কি ? এত মৃত্যু, এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু !"

সাংবাদিক বললেন "আমার চোখে এর কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়।"

"আপনি অবাক করলেন আমাকে।"

"আমি ঠিকই বলছি। খবর কাকে বলে বোধ হয় জানেন না। কুকুর মানুষকে কামড়েছে এটি খবর নয়, মানুষ কুকুরকে কামড়ালে খবর হয়। বিলেতের এক কাগজের অফিসের গল্পটা জানেন? বার্তা সম্পাদকের কক্ষে সবাই বিচলিত, উত্তেজক কোনো খবর সেদিন আসে নি। এ দিকে রাত বারোটা বাজে, শেষ কপি দেবার সময় উপস্থিত। এমন সময় এক সহকারী তার নিজের কুকুরটি পাশের ঘর থেকে ধরে এনে টেবিলে তুলে তার পা কামড়াতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে খবর তৈরি হয়ে গেল। সম্পাদক তাঁর সহকারীকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলেন।"

"তা হলে যারা মরছে তাদের খবর কি ক'রে হতে পারে?"

"হতে পারে, যারা মরছে তারা যদি মারতে পারত। কিন্তু যাক সে কথা, আজ গোটা দুই খবর পেয়েছি। একটুক্ষণ আগে দু'জন কেরানি আমার পাশ দিয়ে বলতে বলতে ছুটে গেল—ভরপেট খেয়ে এ ভাবে হেঁটে অফিসে যেতে তাদের বড়ই কষ্ট হচ্ছে, ভিড়ের জন্য ট্রামে-বাসে উঠতে পারেনি তারা।"

"খবর হল কোথায়, বুঝতে পারছি না।"

"কেরানি হয়েও পেট ভরে খেতে পেয়েছে এটি অবশ্যই খবর। আর একটি খবর—অবশ্য এটি আগেই আমার জানা উচিত ছিল—এই শহরে কোথাও ঘি পাওয়া যায় না।"

আমি বললাম, "এ তো পুরানো খবর, আমরা সবাই জানি, কারণ সব ঘি-তেই ভেজাল থাকে।"

সাংবাদিক বললেন, "ভেজাল ঘিও পাওয়া যায় না।"

"বলেন কি, হঠাৎ কি হ'ল? আমি তো জানি ভেজাল ঘি-তে বাজার ছেয়ে গেছে, আপনি অসম্ভব কথা বলছেন।"

"অসম্ভব কথা বলছি বলেই সংবাদ হিসাবে এর দাম খুব বেশি। আর অসম্ভব বলেই এ তথ্য আবিষ্কারে আমার দেরি হয়েছে।"

কথাটা শুনে একটু বিরক্ত বোধ করলাম। বললাম "মিথ্যাকে সত্য বলে চালানোটাও কি সংবাদ সৃষ্টি না কি?"

সাংবাদিক এ প্রশ্নে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন "সত্য আর মিথ্যা বলে কোন জিনিস নেই। ও দুটির মাপকাঠি কি? আপনি চোখে দেখেছেন বলে ভাবছেন ঠিক দেখছেন, এই তো? কিন্তু একটা জিনিস বা একটা ঘটনার কতটুকু আপনি এক সঙ্গে এক সময়ে দেখতে পান? প্রত্যেকটি জিনিস বা ঘটনার অনেকগুলো ডাইমেনশন আছে, স্থান ও কালের মধ্যে তার

বিস্তার আছে, আপনি হাজার চেষ্টা করলেও একই সময়ে কোনো জিনিসের সব দিক দেখতে পান না, আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ তা পায় নি। অতএব আপনার কাছে যা সত্য তাই বলছেন সত্য, শুধু আমার কাছে যা সত্য সেটি আপনি মানছেন না। কিন্তু যন্ত্র দিয়ে মেপে দেখলে বুঝতেন সবই আংশিক সত্য। আসল জিনিসের একটুখানি অংশ দেখেই আমরা সত্য মিথ্যা নিয়ে এত মারামারি করি।"

আমি বললাম "কিন্তু তাই বলে কোনো জিনিস আছে এবং নেই একই সঙ্গে সত্য হয় কি ক'রে ?"

"তাও হয়, মশায়, একই সঙ্গে একটি জিনিস চলছে এবং চলছে না, একই সঙ্গে একটি জিনিস ছোট এবং বড়, ভাল এবং মন্দ হতে পারে। বিজ্ঞান এ কথা স্বীকার করেছে। আপেক্ষিকবাদ পড়ুন, তা হ'লেই বুঝতে পারবেন আপনি যাকে একমাত্র সত্য বলে চেপে ধরে আছেন, দেখবেন তা আপনার মুঠোর মধ্যেই মিথ্যা হয়ে আছে।"

আমি বললাম "তা যদি হয় তাহ'লে আপনার কথাগুলোও তো সত্য না হতে পারে ?"

"অবশ্যই না হতে পারে। আমি তো বলছি না যে আমার কথা ধ্রুব সত্য।"

"তাহ'লে বাজারে ঘি ও নেই, ভেজাল ঘি-ও নেই, এই দুটি কথাকে আপনি খবর হিসাবে চালাবেন কি ক'রে ?"

"এটা সম্পূর্ণ পৃথক প্রশ্ন। আপনি যেদিক থেকে দেখে বলছেন বাজারে ভেজাল ঘি আছে, আাম সেদিক থেকে দেখছি না। আমি অন্য দিক থেকে দেখে বলছি বাজারে ঘি-ও নেই ভেজাল ঘি-ও নেই।"

"তা হ'লে কি আছে ?"

"আছে 'বিশুদ্ধ ঘি' অথবা 'খাঁটি ঘি'। ঘি নেই। 'বিশুদ্ধ ঘি' অথবা 'খাঁটি ঘি' ঘি থেকে পৃথক। তেমনি ধরুন বাজারে দুধ নেই, আছে শুধু বিশুদ্ধ দুধ। হোটেল নেই, আছে পবিত্র হোটেল।"

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হচ্ছিলাম, এমন সময় সামান্য কিছু দূরেই গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটাতে আমাদের আলোচনা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। একখানা বাস দারুণ শব্দ ক'রে থেমে গেল, সবাই চিৎকার ক'রে উঠল এক সঙ্গে। মুহূর্তে সেই বাস ঘিরে দুর্ভেদ্য ভিড় জমে উঠল। শোনা গেল বাস একটি স্কুলের মেয়েকে চাপা দিয়েছে।

ভিড় ঠেলে দুর্ঘটনা দেখবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আমার ছিল না, বলা বাহুল্য

আমার সঙ্গে আলাপ-রত সাংবাদিক বহু পূর্বেই অদৃশ্য হয়েছিলেন সেই ভিড়ের মধ্যে।

অতিরিক্ত আরও একটি দুর্ঘটনা ঐ একই সঙ্গে ঘটেছে শোনা গেল বাইরে থেকেই। বাস-এর ড্রাইভারকে উপস্থিত জনতা ইতিমধ্যেই মেরে আধমরা ক'রে ফেলেছে।

পরদিন খবরের কাগজে দুর্ঘটনার বিবরণ পড়তে অতি-উৎসাহ বশতঃ তিন খানা কাগজ কিনলাম। সত্য-দৃষ্টি সম্পর্কে নবলব্ধ জ্ঞানই আমাকে এ কাজে প্রেরণা যুগিয়েছিল। যাচাই ক'রে দেখছিলাম বিভিন্ন রিপোর্টার একই ঘটনা কিভাবে দেখেছে।

একখানা কাগজ লিখেছে, মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল পথে, বাস তার ঘাড়ে এসে পড়ে। আর একখানা কাগজ লিখেছে—বাস-চালকের কোনো দোষ নেই, মেয়েটি এমন অতর্কিতে চলন্ত বাস-এর সামনে এসে পড়ে যে সে অবস্থায় বাস থামানোর প্রশ্নই ওঠে না। আর এক কাগজ লিখেছে মেয়েটি কলার খোসায় পা পিছলে চলন্ত বাস-এর নিচে পড়ে গেছে।

কয়েকদিন পরে দেখা হল সাংবাদিকের সঙ্গে। বললাম, "আপনি সেদিন ঠিকই বলেছিলেন—একই ঘটনা নানা জনে নানা ভাবে দেখে।"

"কি ক'রে বুঝলেন?"

"দুর্ঘটনার পর দিন আমি তিনখানা কাগজ কিনেছিলাম—দেখলাম কোনোটার সঙ্গেই কোনোটা মেলে না, তিন কাগজে তিন রকম রিপোর্ট।"

তিনখানা কাগজের নাম বললাম। সাংবাদিক মৃদু হেসে বললেন, "ঐ তিনখানা কাগজেরই রিপোর্টার আমি নিজে।"

(১৯৫২)

মুক্তির স্বাদ

কাপড়ের জন্য একদিন, তেলের জন্য একদিন—চন্দ্রনাথ এই দুদিন ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে। কাল কাপড় কিনেছে একবেলা লাইনে দাঁড়িয়ে, আজ দাঁড়িয়েছে তেলের জন্য। একা মানুষ, ছুটি না নিলে কাপড়, তেল, কয়লা, কিছুই কেনা হয় না।

লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চন্দ্রনাথের পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। পয়সা দিয়ে জিনিস কিনবে তার জন্য এত শাস্তি কেন? কি পাপ করেছে দেশের লোক? দু-চার ডজন চোরাবাজারীর জন্য এত লোক ভুগবে? তারাই হবে সবার ভাগ্যবিধাতা? ক্যাবিনেট মিশন আসছে! গোষ্ঠীর মাথা আসছে। দেশ স্বাধীন হচ্ছে লাইনে দাঁড়িয়ে!

চন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধৈর্য রাখতে পারে না, সামনের লোকটিকে এই অবিচারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে, কিন্তু সে লোকটি নির্বিকার। সে শুধু ওর কথায় একবার চকিতের জন্য চোখ ফিরিয়ে ওর চেহারাখানা দেখে নেয়, তারপর যেমন ছিল ঠিক তেমনি নির্জীবের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। চন্দ্রনাথ মনে মনে বলে ভেড়ার পাল সব, একটু চটতেও জানে না।—একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হলে সময়টা একটু সহজে কাটতে পারত।

ইঞ্চি ইঞ্চি ক'রে এগিয়ে দোকানের দরজায় পৌঁছতে দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা কেটে গেল চন্দ্রনাথের, কিন্তু হায় রে অদৃষ্ট! তার পালা যখন এলো, তখন দোকানে আর তেল নেই।

তার মানে একটি মাস বিনা তেলে কাটাতে হবে।

ছুটি এ মাসে সে আর পাবে না।

দোকানীকে খুন করতে ইচ্ছা হল তার। চিৎকার ক'রে দোকান ফাটাতে ইচ্ছা হল তার। দোকানের আসবাবপত্র ভেঙে একটি দাঙ্গা বাধাবার ইচ্ছা হল তার। কিন্তু কিছুই সে করল না।

করতে পারল না।

দুঃসাহসের বয়স চলে গেছে। শক্তিও অন্তর্হিত।

আঠারো বছরের চাকরি তার সকল শক্তি হরণ করেছে। সুতরাং মনে মনে গভর্মেণ্টকে অভিশাপ দিতে দিতে খালি টিন হাতে বাড়ি ফিরতে হল তাকে।

একটি দিনের ছুটি অথচ কিছুই হল না!

এই ব্যর্থতা, এই নিষ্ফল প্রয়াসের জ্বালা চন্দ্রনাথ আর যেন সহ্য করতে পারছে না। উত্তেজনার চরম অথচ কিছুই করবার নেই। তেলের অভাবে স্রেফ সেদ্ধ ডাল মাছ খেতে হবে, তিন টাকা সেরের বাদাম তেল কত দিন কেনা যায়? কিনবে না বাদাম তেল। আত্মবঞ্চনার কাজে সে নতুন ব্রতী নয়, এ তার অভ্যাস হয়ে গেছে। তার জন্য আর ভাবনা কি? ভাবনা হচ্ছে মনের জ্বালা জুড়ানো যায় কিসে?

আচ্ছা, খবরের কাগজে অনেকে অভাব অভিযোগ জানায়, তাতে কি কিছু ফল হয় না? না হলে এত চিঠি ছাপা হয় কেন? আর কিছু না হোক নিজের কথাটি তো পাঁচ জনকে শোনানো যায়? তাতেও অনেক শান্তি। চুপ ক'রে বসে থাকার চেয়ে অন্তত ভাল। হাজার হাজার লোক চিঠি পড়ে, তাতে একটা সান্ত্বনা আছে বৈ কি। সেও কেন লিখবে না? লিখলে নিশ্চয় তা ছাপা হবে।

অবশেষে চিঠি লেখাই সে ঠিক করল। এককালে কলেজে পড়ার সময় রচনাশক্তি তার ভালই ছিল, বহুকাল পরে একখানি পত্র রচনায় সুযোগ পেয়ে তার মনে বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হল। অনেক খুঁজে একখণ্ড কাগজও সে সংগ্রহ করল, কারণ কাগজেরও দুর্ভিক্ষ লেগেছে। কিন্তু হায়!—লেখা যে বেরোয় না কলম থেকে! খবরের কাগজে যে চিঠি ছাপা হবে, তার চেহারা কেমন হবে? মন অত্যন্ত আত্মচেতন হয়ে উঠল, যত লেখে তত কাটে, কিছুতে চিঠির ভাষায় ঠিক সুরটি লাগে না। অবশেষে কাটতে কাটতে দেখে কাগজ শেষ হয়ে গেছে।

মনে আগুন জ্বলছে অথচ কলমে ভাষা নেই!

ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর গলদঘর্ম হয়ে উঠে পড়ল চন্দ্রনাথ। অসহায় সে সকল দিকেই। মনটা বিষিয়ে উঠল তার। মনে পড়ল লাইনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। এখন দেখল কাগজে চিৎকার করার ক্ষমতাও তার নেই।

চন্দ্রনাথ দ্রুত আত্মস্থ হল। আশ্চর্য মানুষের মন! কল্পনাবলে বা হঠাৎ উত্তেজনায় নিজেকে যত বড় করেই দেখুক, সেই অতিকায় চেহারার পরমায়ু দীর্ঘ হয় না। কারণ কয়েক মুহূর্ত পরেই তার মনে এই তত্ত্বকথার উদয় হল যে চুপ ক'রে যাওয়াই ভাল। অনেকেই তো চুপ ক'রে আছে। তারাও তেল

পায় না, কাপড় পায় না, অথচ বেশ নিশ্চিন্ত মনে অফিস করে, সন্ধ্যাবেলা রকে বসে দাবা খেলে, হারমোনিয়াম তবলা নিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত আসর জমায়। এতটাও কিন্তু আবার বাড়াবাড়ি। এত দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও এত সুখে আছে দেখানোর চেষ্টা। চন্দ্রনাথ ওর মধ্যে নেই। ওরা উচ্ছন্ন যাক, চন্দ্রনাথ বাড়াবাড়ি করবে না। দুঃখ নিয়েও না, সুখ নিয়েও না।

দিনটা চন্দ্রনাথের সত্যই খারাপ কাটল। ছুটি পেয়েও তার সদ্ব্যবহার হল না। বাড়ির বদ্ধ আবেষ্টনে মনটা তার হাঁপিয়ে উঠতে লাগল। ইচ্ছে হল বাড়ির বাইরে গিয়ে একটু ঘুরে বেড়ায়! নিরুদ্দিষ্টভাবে চলতে চলতে একেবারে পৌঁছল গিয়ে ময়দানে। বহু বৎসর পরে তার মন একটুখানি খোলা আকাশের জন্য আর্ত হয়ে উঠেছে।

আঃ! কি মুক্তি কি আনন্দ! একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল সে সেইখানে। ময়দানের হাওয়া তার ক্ষত মনের উপর একটা মধুর প্রলেপ লাগিয়ে দিল, একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল তার মনে।

এ রকম দায়িত্বহীন ভাবনাচিন্তাহীন খোলা আকাশের নিচে বসে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেবার কল্পনা ছাত্রজীবনে কতবার সে করেছে, এবং সে কল্পনা মিলিয়েও গেছে সে জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু তবু এতদিন পরে অথচ সে দিনের সেই পরিচিত হাওয়াটাই যেন আজও সেদিনের সেই স্নিগ্ধতা বহন ক'রে বয়ে চলেছে।

একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনের ফাঁকে, এতদিন পরে, ভাগ্যের হাত থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নেওয়া এই ক্ষণমুক্তির অবসরটুকু তার কাছে পরম উপাদেয় বলে বোধ হতে লাগল। উদার আবেষ্টনে একটুখানি বসেই তার পুনর্জন্ম ঘটল। জীবনভর বাজার করা, খাওয়া, আর অফিসে ছোটা, হাস্যকর মনে হতে লাগল। যেন ওসব স্বপ্ন, সব মিথ্যা।

সব চেয়ে মজার কাণ্ড, আকাশ, মাঠ, বাতাস সম্পর্কে কতকগুলো ফিল্মের গানও অবচেতনার নিভৃত সমাধি থেকে হঠাৎ জেগে উঠে তার মনের মধ্যে গুঞ্জরণ ক'রে ফিরতে লাগল।

খোলা আকাশের এত শক্তি?

এ তো ভয়ানক ব্যাপার!

চন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে পড়ল।

যে মানুষ ছিল এত বড়, যার দুশ্চিন্তা ছিল পর্বতপ্রমাণ, সেই মানুষ এই বিরাট আকাশের নিচে এত ছোট হয়ে যেতে পারে!

কীটের মতো ছোট !

ভাবনা চিন্তার পাহাড় পড়ল ধ্বসে।

একটা মধুর আনন্দে মশগুল হয়ে চন্দ্রনাথ শুয়ে পড়ল সবুজ ঘাসের বিছানায়। চোখ দুটি তার বুজে এলো অতি সহজেই।

হাওয়ায় ভেসে চলেছে যেন···দেহমনের সকল গ্লানি তার মুছে গেছে।

ভাবছে মনে মনে, যেমন ক'রে হোক প্রতিদিন এইখানে একবার ক'রে আসতে হবে, এসে মুক্তিস্নান ক'রে প্রতিদিন নতুন মানুষ হয়ে ফিরতে হবে। দিনের গ্লানি ময়দানের আকাশ-গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে প্রতিদিন।···

হঠাৎ কার স্পর্শ ?

চন্দ্রনাথ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো তড়াক ক'রে উঠে বসল। স্তম্ভিত-বিস্ময়ে চেয়ে দেখে এক ভীষণ গুণ্ডা। সে আঙুলের ইসারা ক'রে বলছে, বাবুজি, কি আছে মেহেরবানী ক'রে দিয়ে দাও।

অন্য হাতে তার এক ছোরা—সন্ধ্যার অন্ধকারে যেন জ্বলছে।

বিমূঢ় চন্দ্রনাথ যন্ত্রের মতো উচ্চারণ করল—কি আছে ? কিছু তো নেই।

ছোরার তীক্ষ্ণ ফলক চন্দ্রনাথের পাঁজর স্পর্শ করল। গুণ্ডার চোখ দুটিতে ব্যঙ্গের হাসি।—চন্দ্রনাথ মন্ত্রমুগ্ধ।

একেবারে সর্বাঙ্গীন মুক্তি। মনের বোঝা আগেই নেমেছিল, এবারে নামল অঙ্গের বোঝা। চন্দ্রনাথ বলেছিল কিছু তো নেই, কিন্তু দেখা গেল তার কথা ঠিক নয়। পকেটে আড়াইটি টাকা ছিল, গায়ে শার্ট ছিল, চাদর ছিল, হাতে ঘড়ি ছিল, চোখে চশমা ছিল, পায়ে একজোড়া নতুন জুতো ছিল, পরিধানে ধুতি ছিল।

গেঞ্জি গায়ে, খালি পায়ে, ল্যাঙ্গটপরা, উদ্ভ্রান্ত চন্দ্রনাথ রিকশয় ফিরছে ময়দান থেকে—যেন কুস্তির আখড়া থেকে ফিরছে।

তৃতীয় আর একটি মুক্তির স্বাদ এখন কেবল তার বাকী রইল—কিন্তু সে মুক্তির ডাক কবে আসবে কে জানে। (১৯৪৭)

একটি দেব-নৈতিক গল্প

১

জম্বুদ্বীপে এমন একটা সময় ছিল যে-সময়ের কথা ইতিহাসে লেখা নেই। সেই সময়ে এই দ্বীপ দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল: পূর্ব অংশ ও পশ্চিম অংশ। দুই অংশে একই জাতীয় লোক বাস করত কিন্তু তবু এদের মধ্যে একটা বিষয়ে গুরুতর ভেদ ছিল।

ভেদের বিষয় হচ্ছে ছাতা ও পাগড়ী।

পূবের লোকেরা বলত, ছাতাই হচ্ছে মাথা রক্ষার একমাত্র উপায়, কেননা ছাতা একই সঙ্গে মাথা থেকে মুক্ত এবং ছাতার সঙ্গে যুক্ত। একই সঙ্গে ত্যাগ এবং ভোগ। একই সঙ্গে মিলন এবং বিচ্ছেদ। একই সঙ্গে সীমা এবং সীমাহীনতা।

পশ্চিমের লোকেরা বলত, পাগড়ী হচ্ছে মাথার রক্ষক এবং ভূষণ। যে জিনিস মাথা বাঁচাবে, মাথার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা হওয়া চাই ঘনিষ্ঠ। একেবারে অঙ্গাঙ্গী ভাব। তিলেক বিচ্ছেদ নেই। যাকে বন্ধু বলে মানব তাকে বন্ধু বলেই চেপে ধরব। তার অর্ধেক ছেড়ে অর্ধেক ধরে রাখার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। যাকে একবার মাথায় তুলে নিয়েছি তাকে চিরদিনই মাথায় রাখব। পাগড়ী আমাদের চিরশিরোধায।

পূবের লোকেরা যখন ছাতার গৌরব প্রচারে একটু বেশি মুখর হয়ে উঠত, তখন পশ্চিমের লোকেরা অপমানিত বোধ ক'রে তাদের মাথা ভাঙত। আবার পশ্চিমের লোকেরা যখন পাগড়ীর গুণগানে দেশ কাঁপিয়ে তুলত, তখন পূবের লোকেরা তাদের উপর গিয়ে হানা দিত।

এমনি ক'রে কেটে গেল তাদের বহু যুগ। পূব পূবই থেকে গেল, পশ্চিম, পশ্চিম।

কিন্তু পূব-পশ্চিমে যত বৈপরীত্যই থাক, তবু দুইয়ের মাঝখানে একটা মিলন-রেখা থাকেই। সেইখানে স্বভাবতই একটা মিলন-ভূমি গড়ে উঠতে থাকে। সেই খানে বিরোধ যত হয় তীব্র, ঠোকাঠুকি যত হয় কঠিন, ততই পরস্পর আঘাত প্রত্যাঘাতের ভিতর দিয়ে একটা মিশ্রণ ঘটতে থাকে। এদেরও হয়েছিল তাই। এইখানে পূবের লোকেরা পাগড়ী এবং পশ্চিমের লোকেরা ছাতা সহজেই ব্যবহার করতে শুরু করল। আর নতুন বিরোধেরও সূত্রপাত হল তাই থেকেই।

পূবের চরম পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিমের চরম পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ হল। অতি মারাত্মক ব্যাপার। পূবের লোক পাগড়ী পরবে—এই অভূতপূর্ব ব্যাপার পূবের লোকেরা কিছুতেই সহ্য করবে না। ছাতাই তাদের ধর্ম, ছাতাই তাদের মর্ম, ছাতাই তাদের জীবন। এত বড় সভ্যতা তাদের গড়ে উঠেছে ছাতাকে কেন্দ্র ক'রে। তারা হয়েছে ছত্রপতি, দাসানুদাসেরা হয়েছে ছত্রধর। ছাতার কথা মনে হলে গর্বে তাদের বুকের ছাতি ফুলে ওঠে। এই ছাতা তাদের একতাসূত্রে গেঁথেছে, ছাতা ত্যাগ করা আর ঐক্যবদ্ধ পূবের ছত্রভঙ্গ হওয়া একই কথা।

পূব যতই ছাতার মাহাত্ম্য অনুভব করে, পশ্চিমও ততই পাগড়ীর প্রতি তাদের ভক্তি বাড়িয়ে তোলে। পশ্চিমবাসী যে-কোনো লোক পাগড়ীর জন্য প্রাণ দিতে পারে, পাগড়ীর মান বাঁচাতে প্রাণহরণের চেয়ে পুণ্য আর হতে পারে না। পাগড়ী দেওয়া আর শির দেওয়া তাদের চোখে এক। পাগড়ীর বদলে শির নেওয়াই তাদের ধর্ম।

আপোষ প্রয়াসী মধ্যবর্তীদের নিয়ে এইভাবে বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে—আর তার ফলে পূব-পশ্চিমবাসী সবার শান্তি ভঙ্গ হয়। যুগ যুগ ধরে চলে এই অশান্তি। দুই পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়ে একদিন।

কিন্তু কোনো মতেই আপোস সম্ভব হয় না।

দুটি মাত্র আপোষ প্রস্তাব উঠেছিল :

এক—ছাতা ও পাগড়ী একই সঙ্গে সবাই ব্যবহার করলে কেমন হয়।

দুই—ছাতা ও পাগড়ী একই সঙ্গে ত্যাগ করলে কেমন হয়।

প্রথমটির বিরুদ্ধে বলা হয় পূব-পশ্চিম সংস্কৃতি এক সঙ্গে মিলতে পারে না, তাতে সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে।

দ্বিতীয়টির বিরুদ্ধে বলা হয়, সংস্কৃতি মানেই ধর্ম, সুতরাং সংস্কৃতি ছাড়া মানেই ধর্ম ছাড়া, আমরা তাতে রাজি নই। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।

২

মীমাংসা হল না, উপরন্তু দুপক্ষেরই উত্তাপ ক্রমশঃ এত বেড়ে গেল যে একটা বড় রকমের সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠল। নানারকম প্ল্যান চলতে লাগল আক্রমণের।

এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল জম্বুদ্বীপে।

কিছুদিন ধরেই অনাবৃষ্টি চলছিল দেশে। খবর প্রচার হয়ে গেল, এবারে খাদ্য শস্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য।

সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মাঠে শস্য নেই!

পরস্পর আক্রমণের এমন সঙ্ঘবদ্ধ পরিকল্পনাটাও মাঠে মারা গেল। উদ্যোগকারীরা হতাশ হয়ে পড়ল। পূব-পশ্চিম দুদিকেই বৈজ্ঞানিকেরা অভিনব অস্ত্র তৈরি করেছিল, কবিরা দেশের লোকের মনে হিংস্রতা জাগানোর জন্য গান লিখেছিল—সবই যে বৃথা যায়! দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কি লড়াই করা যায় না? ধর্মের চেয়েও কি পেট বড়?—দুর্ভিক্ষই এই মীমাংসা ক'রে দিল। দেখা গেল, না খেয়ে কিছুই করা যায় না।

এলো দুর্ভিক্ষ প্রবল মূর্তিতে। পূবপশ্চিম দুদিকের লোকেরাই মরতে লাগল হাজার হাজার। অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানেরা অর্ধাহারে দিন কাটাতে লাগল। এই মহাবিপদে দুপক্ষই ভুলল তাদের বিরোধ, দুপক্ষই পরস্পরের আরও কাছে সরে এলো।

দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এলো মহামারী। বছরের পর বছর চলল মড়কের লীলা। পূব-পশ্চিম মরতে লাগল একই নিয়মে। ছাতা এবং পাগড়ী কারও মাথা বাঁচাতে পরল না।

এখন উপায়?

পূব প্রশ্ন করল পশ্চিমকে, পশ্চিম প্রশ্ন করল পূবকে।

আবার বসল পরামর্শ সভা।

প্রাণ বাঁচাতে হবে।

পূবকে বাঁচতে হবে, পশ্চিমকে বাঁচতে হবে। অর্ধাহারে অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে জীবনধারণের কোনো অর্থ হয় না।

পূব পশ্চিমকে ডেকে বলল, ভাই, ছাতা মিথ্যা, ত্যাগ করলাম ছাতা।

পশ্চিম পূবকে ডেকে বলল, পাগড়ী আমরা আগেই ফেলে দিয়েছি। আমরা দুদিকের লোকই এখন বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের নিরাপদ ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছি, এখনও যদি আমরা আমাদের নিশ্চিত ধ্বংসের কোনো প্রতিকার খুঁজে না পাই তা হ'লে ধিক আমাদের মনুষ্যত্বের।

পূব বহু চিন্তা ক'রে বলল, অমৃতের অধিকারী হতে হবে।

সে চেষ্টা তো আমরা করেছি কিন্তু কোনো ফল হয় নি।

আমরাও করেছি, তাতেও কোনো ফল হয় নি।

তা হ'লে চেষ্টা ক'রে লাভ কি?

লাভ আছে। এতদিন আমরা চেষ্টা করেছি পৃথকভাবে, এবারে চেষ্টা করতে হবে এক সঙ্গে মিলে।

তা হ'লে হবে ঠিক ?

হবে, যদি মিলনটা ঠিক হয়।

মিলতেই হবে অমৃতের জন্য। অমৃত না পেলে আমরা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাব।...কিন্তু মিললেই যে অমৃত লাভ করব, তার নিশ্চয়তা কোথায় ? দেবতারা তো বলেছেন, অমৃত তাঁরা ছাড়তে রাজি নন।

আমাদের মেলবার পরেও তাই বলবেন, কিন্তু আমরা তা শুনব না। কেন না এবারে জোর ক'রে অমৃত আদায় করব, আর ভিক্ষা নয়।

আমাদের মিলিত শক্তি কি দুর্বার হবে না ?

মিলিত শক্তিতে স্বর্গ আক্রমণ করলে দেবতারা বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন

৩

স্বর্গের আজ সত্যই বিপদ। এতদিনের অমৃত ভোগের মেয়াদ এবারে বোধ হয় ফুরিয়ে যায়।

জম্বুদ্বীপের লোকেরা একজোট হয়ে স্বর্গে আসছে অমৃত দখল করতে। দেবতাদের মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনা এবং ভয়মিশ্রিত অস্থিরতা জেগে উঠেছে।

স্বয়ং ব্রহ্মা স্বর্গের রক্ষী-ব্যবস্থাগুলো পরীক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছেন। দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় তাঁর বাহিনী প্রস্তুত ক'রে আত্মরক্ষার জন্য যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে তাঁর দূরবীণ। ব্রহ্মা হাঁকলেন, সেনাপতি ?

কার্তিকেয় চমকিত হয়ে আদেশের অপেক্ষায় চুপ ক'রে রইলেন।

ব্রহ্মা প্রশ্ন করলেন, পারবে ?

কার্তিকেয় বিনীতভাবে বললেন, ভাবছি।

তা হ'লে ভাব—বলে ব্রহ্মা ইন্দ্রের দ্বারস্থ হলেন।

অমৃত কার কাছে আছে ?

ইন্দ্র বললেন, আজ্ঞে, আমারই কাছে রেখেছি।

ব্রহ্মা প্রশ্ন করলেন, পারবে ?

কি ?—নির্বোধের মতো ইন্দ্র পাল্টা প্রশ্ন ক'রে বসলেন।

ব্রহ্মা মহা বিরক্তভাবে বললেন, তোমার মাথা।

মাথা রক্ষা করতে পারব কি না প্রশ্ন করছেন ?

সে প্রশ্নে আমার দরকার নেই। অমৃত রক্ষা করতে পারবে কি না বল।

চেষ্টা করব।

ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বললেন, তোমরা সবাই দেখছি কাপুরুষ, দৈববিশ্বাসী, অদৃষ্টবাদী। তোমরা অপদার্থ। জম্বুদ্বীপের লোকদের কি ক'রে ঠেকিয়েছ তাই ভাবছি।

আজ্ঞে, সোজা উপায়েই ঠেকিয়েছি; বলেছি দোব না।

ওরা অমৃত চায় কেন, বলেছে ?

বলেছে, ওরা দেবত্ব লাভ করতে চায়। ওদের মধ্যে হিংসাদ্বেষ মারামারি কাটাকাটি চলছে বহুদিন। ওরা বহু রকম দুঃখ ভোগ করছে যুগের পর যুগ, আর পারছে না। ওরা আমাদের সঙ্গে এখন কো-প্রস্‌পেরিটি চায়।

তুমি এই সব চুপ ক'রে শুনেছ, এবং আত্মরক্ষার জন্য কিছুই বল নি ?

আজ্ঞে, বলবার আর কি আছে।

কেন বলনি যে আমরা অমৃতের অধিকারী হয়েও তোমাদেরই মতো ছোটলোক, হিংসা দ্বেষ হানাহানিতে তোমাদের মতোই পটু ? কেন বলনি যে অমৃত পেলেও তোমাদের দুঃখ ঘুচবে না ?

বললে বিশ্বাস করত না বলেই বলি নি।

এখন বাঁচবে কি ক'রে ওদের হাত থেকে ? ওরা এবারে একজোট হয়ে আসছে, এবারে তো আর মুখের কথায় কাজ হবে না, এবারে যে লড়াই করতে হবে।

ইন্দ্র চিন্তিতভাবে বললেন, আজ্ঞে মানুষের সঙ্গে তো কোনো দিন লড়াই করি নি।

তা হ'লে জয়লাভে তোমারও সন্দেহ আছে। যা ভেবেছিলাম তাই হল শেষটায়। তা হ'লে এখন যে যার পথ দেখ। আমি চললাম নারদকে খুঁজতে।
—বলেই ব্রহ্মা ছুটলেন নারদের এলাকার দিকে।

পথে বিশ্বকর্মার সঙ্গে দেখা।

বিশ্বকর্মা ব্রহ্মাকে ছুটতে দেখে সভয়ে প্রশ্ন করলেন, প্রভু, ব্যাপার কি ?

ব্যাপার অতি গুরুতর। এখন সব বলবার সময় নেই। তুমি সাইরেন বাজাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক। ইঙ্গিত পেলেই বাজিয়ে দেবে।

বিশ্বকর্মা বললেন, তথাস্তু, তবে—

তবে কি ?

মন্দাকিনী নদীর উপর যে সেতুটি তৈরি করেছিলাম, যমরাজ তার উপর দিয়ে স-বাহন পারাপার করাতে সেতুটি ভেঙে পড়েছে, সেইটি মেরামত করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

ব্রহ্মা বললেন, সেতুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস কর। কেন, প্রশ্ন করো না, যা বলি চোখ বুজে শুধু মেনে যাও। এখন আর সময় নেই। জম্বুদ্বীপের মানুষেরা আসছে স্বর্গ আক্রমণ করতে, হুঁশিয়ার থাক।

ব্রহ্মা আবার ছুটতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়েই দেখেন, একটা নিরিবিলি জায়গায় নারদ বসে তাঁর চারদিকে ধূম্রজাল সৃষ্টি করছেন।

ব্রহ্মা এগিয়ে গিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করতেই নারদ হাতের ইসারায় তাঁর ধ্যান ভাঙতে নিষেধ করলেন।

তাঁর চারদিকে ধোঁয়ার আবরণ ক্রমেই গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল, কিছুক্ষণ পরে আর তাঁকে দেখাই গেল না।

ব্রহ্মা অত্যন্ত বিরক্ত হলেন নারদের এই স্বার্থপর ব্যবহারে। যাঁরা প্রবীণ তাঁদের উচিত আর সবাইকে বাঁচার পথ ক'রে দেওয়া, তা না ক'রে নারদ নিজেকে রক্ষা করতেই ব্যগ্র। এই পলায়নী বৃত্তি নারদের পক্ষে অতি জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

ব্রহ্মা ইন্দ্রকে ডেকে নারদের চারিত্রিক ত্রুটির কথা নিবেদন করলেন।

ইন্দ্র বললেন, কিন্তু এখন আমাদের প্রত্যেকেরই তো ও ছাড়া আর পথ নেই। আপনিও তাই বলেছেন।

ব্রহ্মা বললেন, সে বলেছি তোমাদের জন্য। তোমাদের উচিত ছিল মেয়েদের পাড়ায় গিয়ে তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা তারা হয়তো এখনও কিছুই জানে না।

ব্রহ্মার কথা শেষ হতে না হতে হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তাঁদের কানে। তারা মাঝামাঝি পথে এসে পড়েছে, তাদের দূরাগত ধ্বনি ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র দুজনকেই দিশাহারা ক'রে দিল।

ইন্দ্র, আমি চললাম নন্দন কাননের দিকে, পার তো তুমিও এসো—বলে ব্রহ্মা উন্মাদের মতো ছুটে পালালেন।

ইন্দ্র বললেন, আপনি আগে পালান, আমি অমৃত ভাণ্ডটি নিয়ে এখুনি আসছি।

ইন্দ্র অমৃত ভাণ্ডটি ঘাড়ে ঝুলিয়ে একটু পরেই নন্দনকাননের দিকে ছুটে চললেন।

মানুষদের কোলাহল আরও কাছে শোনা যেতে লাগল। তারা এসে পড়েছে স্বর্গে। বিশ্বকর্মা সাইরেন বাজিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবসেনাপতি তাঁর বাহিনীকে নিয়ে কোথায় সরে পড়েছেন, তার কোনো পাত্তা নেই। মেয়েরা নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করেছে।

জম্বুদ্বীপের লোকেরা সম্পূর্ণ সশস্ত্র হয়ে এসেছে। ব্রহ্মা ধোঁয়ার আবরণে বসেই বুঝতে পারলেন তারা সংখ্যায় কয়েক হাজার হবে।

নারদ আরও শুনতে পেলেন তারা নানারকম স্লোগান আওড়াচ্ছে, তার মোটামুটি অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা এবারে দেবতাদের শক্তি চূর্ণ ক'রে অমৃতভাণ্ড লুণ্ঠন ক'রে নেবেই।

নারদ ধূম্রকুণ্ডলীর ভিতর থেকে সব শুনে আরও একাগ্রচিত্তে প্রতিকার চিন্তা করতে লাগলেন। তবে একটা বিষয়ে তিনি এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলেন যে মানুষেরা দেবতাদের সহজে খুঁজে পাবে না, কারণ তাঁরা যে ইতিমধ্যেই আত্মগোপন করেছেন এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই।

৪

নারদের ধারণা ঠিক।

মানুষেরা স্বর্গে এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তারা এখানে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। সাইরেন বাজার শব্দ শুনে তারা যতটা উল্লসিত হয়ে পড়েছিল, দেবতাদের আশ্রয়স্থলের কোনো সন্ধান না পেয়ে তারা তেমনি দমে গেছে।

তারা এসে জড়ো হল মন্দাকিনী নদীর ধারে।

কিন্তু আসতে না আসতেই ঝপাং ক'রে নদীতে এক শব্দ! সবারই দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল।

কি হল? কি হল?—চেয়ে দেখে একটা গাভী তার ল্যাজটি শূন্যে তুলে নদী পার হয়ে যাচ্ছে।—গোরু এলো কোত্থেকে?

কামধেনু!

সে নদীর ধারে একটি ঝোপে লুকিয়ে ছিল, বিপদ বুঝতে পেরে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কামধেনুই যেন তাদের পথ দেখিয়ে দিল। তারাও নদী পার হবে। তারা আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আজ এস্পার কি ওস্পার একটা কিছু করবেই। তা ছাড়া দেবতাদের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে ওরা স্পষ্টই বুঝতে পারল তাঁরা ইতিমধ্যেই

প্রায় হার স্বীকার করেছেন। আত্মসমর্পণ তাঁদের করতেই হবে, না হয় তো স্বর্গ থেকে তারা নড়বে না।

ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মন্দাকিনীর জলে।

নদীটি বেশি প্রশস্ত নয়, পঁচিশ কিংবা ত্রিশ গজ হবে।

স্বর্গীয় নদীর জলে পথক্লান্ত মানুষদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

নদী থেকে উঠেই সম্মুখে দেখতে পেল পারিজাত বৃক্ষ। এই বিখ্যাত বৃক্ষের কথা এবং এর বিখ্যাত পুষ্পের কথা তাদের আগে থাকতেই জানা ছিল। তারা গিয়ে দাঁড়াল সেই গাছের নিচে। প্রচুর ফুল ফুটে ছিল গাছে, কিন্তু আপাতত তারা সে দিকে মন দিতে পারল না। মনোযোগ দিলে ইন্দ্রের পক্ষে একটু মুশকিল হত, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই অমৃতভাণ্ড নিয়ে সেই গাছের ডালেই গা ঢাকা দিয়ে বসে ছিলেন।

ওদের একজন প্রশ্ন করল, যদি কারও দেখা না পাই?

আর একজন প্রশ্ন করল, স্বর্গটা দখল করলে কেমন হয়?

আর একজন বলল, দেবতারা পৃথিবীতে গিয়ে জম্বুদ্বীপে বসবাস করুক, আমরা থাকি এখানে।

ইন্দ্রের কানে এই সব মারাত্মক কথা গিয়ে তাঁকে আরো উতলা ক'রে তুলল। স্বর্গও যাবে, অমৃতও যাবে, এ যে এক মহা বিপর্যয়!

ওদের আর একজন বলল, স্বর্গ দখল করা এখন আর কঠিন মনে হচ্ছে না, কিন্তু এখানে আমরা খাব কি?

যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন।

একজন প্রশ্ন করল, স্বর্গেও কি খাওয়া দরকার হয়?

আর একজন বলল, না হলে ইতিমধ্যেই খেতে ইচ্ছে হচ্ছে কেন?

আর একজন বলল, তোমার একার ইচ্ছেয় তো বিচার হবে না।

দুহাজার লোক সমস্বরে বলে উঠল, আমরা সবাই খেতে চাই, খিদেয় পেট জ্বলতে আরম্ভ করেছে।

ইন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, হায় রে দুর্ভিক্ষের দেশের লোক!

একজন প্রস্তাব করল, কামধেনুকে খুঁজে বের করতে হবে।

ওদের কেউ কেউ কামধেনুর পরিচয় জানত না। তারা এ প্রস্তাবে হতাশ হয়ে বলল, তাকে দিয়ে চাষ করিয়ে, ফসল ফলিয়ে তবে খাব?

প্রস্তাবকারী বলল, না। ওকে পেলেই আমাদের সকল ক্ষুধার অবসান। ওর কাছে যা চাইবে তাই পাবে এবং চাওয়ামাত্র পাবে।

সে আবার কেমন গোরু ?

ও আসলে গোরুই নয়। গোরুর ছদ্মবেশে ও হচ্ছে স্বর্গের কমিশন এজেন্ট। ও সব সময় সবার কামনা পূরণ করে।

কামধেনু ওদের কাছাকাছি এক গর্তে লুকিয়ে ছিল, সে এ-কথায় বেশ কৌতুক অনুভব করল।

৫

ওরা এইখানে নানা রকম আলোচনা এবং আক্রমণ আর অনুসন্ধান পরিকল্পনা শেষ ক'রে চারটি পৃথক দলে বিভক্ত হল এবং চতুর্দিকে অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

ইন্দ্র বৃক্ষতল নিরাপদ জ্ঞান করায় তাঁর আশ্রয় শাখা থেকে নিচের দিকে পা বাড়াতেই গাছের মাথা থেকে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন ধ্বনিত হল, ওরা কি চলে গেছে ?

ইন্দ্র চমকে উঠে চেয়ে দেখেন, ব্রহ্মা তাঁর উপরের এক ডালে বসে আছেন।

ইন্দ্রের অভয় পেয়ে তিনিও এলেন নিচে। এসেই প্রশ্ন করলেন, বিশ্বকর্মা কোথায় ? তাকে ডেকে তাড়াতাড়ি এখন এমন একটা দুর্গ তৈরি করানো দরকার, যেখানে মানুষেরা আর প্রবেশ করতে না পারে। নারদ ধোঁয়ার মধ্যে বসে আছে— ও নিতান্তই নির্বোধ, ওকে এখনি ডেকে আন।

ডেকে আনতে হল না। দেখা গেল নারদ বীণা বাজাতে বাজাতে তাঁদের দিকেই আসছেন।

ব্রহ্মা বললেন, তা হ'লে কি মানুষের জম্বুদ্বীপে ফিরে গেল ? তা হ'লে কি নারদের বীণাকে 'অল ক্লিয়ার' মনে করতে পারি ?

নারদ কাছে এগিয়ে এসে বললেন, পারেন। তার কারণ আমি স্বর্গের বিপদ আশঙ্কা ক'রেই ধ্যানে বসেছিলাম। বিশ্বাস করুন, এ রকম একাগ্রচিত্ত ধ্যান আমি ইতিপূর্বে আর কখনও করিনি। আমার বিশ্বাস আমি সাফল্যও লাভ করেছি। কিছুক্ষণ ধ্যানে বসেই আমি দেখলাম মুক্তির উপায় অতি সহজ। আমরা মানুষের সম্পর্কে এতদিন একটা মস্ত বড় ভুল ক'রে আসছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম জম্বুদ্বীপের লোকেরা কখনও একসঙ্গে মিলতে পারে না। তাই যখনই পুবের লোকেরা এসেছে তখনই বলেছি অমৃত দেব না, পশ্চিমের লোকদেরও ঐ এক কথাই বলেছি। আমরা জানতাম, ওরা

যতদিন পৃথক থাকবে ততদিন আমাদের কোনো আশঙ্কাই নেই। শুধু পূর্ব বা শুধু পশ্চিম কখনও পৃথকভাবে আমাদের কাছ থেকে অমৃত কেড়ে নিতে পারে না। আমরা এই ভেবেই এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম।

ব্রহ্মা বললেন, এখন কি ভাবে ওদের সম্মিলিত চেষ্টা ব্যর্থ করবে?

নারদ বললেন, সেটা মুখে না বলে একেবারে কাজেই দেখিয়ে দিই। মানুষেরা তো দেবতাদের ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর আবার ফিরে এদিকেই আসছে। আপনারা নির্ভীকচিত্তে এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন এবং আমি যা করি, বিনা প্রতিবাদে তা দেখুন।

ব্রহ্মা বললেন, তোমার কথা বরাবরই বিশ্বাস করেছি, এখনও করলাম, কিন্তু যা পরীক্ষাসাপেক্ষ তার উপর তোমার এতখানি ভরসা করা কি ঠিক হচ্ছে?

নারদ বললেন, দেখুনই না। আমার বিশ্বাস আমি সফল হব। পারব স্বর্গকে বাঁচিয়ে দিতে। ঐ তো মানুষেরা সব এসে পড়ল।

ইন্দ্র ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, অমৃতভাণ্ডটা কি সামনেই পড়ে থাকবে?

নারদ বললেন, যেমন আছে তেমনি থাকবে।

ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্তে এবং সভয়ে নারদের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কামধেনু ঝরে-পড়া পারিজাত ফুলগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগল।

৬

জম্বুদ্বীপের লোকেরা আসছে যেন বন্যার স্রোতের মতো। তারা দেখতে পেয়েছে ব্রহ্মা, নারদ, ইন্দ্রকে। তারা মুহূর্তে মুহূর্তে অধিকতর উল্লাসে নন্দন-কাননের প্রান্ত কাঁপিয়ে তুলছে। তারা দুর্বার, তারা দুর্দান্ত, তারা দুর্মদ, তারা দুর্দমনেয়। তাদের স্রোত যদি প্রতিহত না করা যায় তা হ'লে তারা সমস্ত স্বর্গকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তারা গর্জন করতে করতে আসছে, বর্ষার নদীর মতো তারা পাক খেয়ে ফুলে ফুলে উঠছে।

ব্রহ্মা কম্পিত কণ্ঠে নারদকে বললেন, বাবা, এখনও হয় তো সময় আছে!

নারদ বললেন, নির্ভয়ে অপেক্ষা করুন, পিতঃ।

ইন্দ্র মাথা নিচু ক'রে রইলেন, উট পাখীর বিপদাশঙ্কায় বালিতে মাথা গুঁজে থাকার মতো।

ভয়ে তিনি অমৃতভাণ্ডের কথাও ভুললেন।

জম্বুদ্বীপের সম্মিলিত জলপ্রপাত মাথার উপর ভেঙে পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নারদ হাত তুলে বললেন, স্তব্ধ হও। আমরা আজ তোমাদের অমৃত দান করব বলেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি। এই নাও অমৃত।

নারদ অমৃতের ভাণ্ডটি তাদের সম্মুখে এগিয়ে দিলেন।

জলপ্রপাত মন্ত্রবলে যেন প্রস্তরীভূত হল।

আর পাথর হয়ে গেলেন ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং কামধেনু।

এই অপ্রত্যাশিত সম্প্রদান-এষণা দেখে জম্বুদ্বীপের লোকেরা কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না। এত বড় প্রতিক্রিয়া তাদের মনে আর কিছুতে এতদিন হয় নি। এ অভিজ্ঞতা তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন।

একজন মাত্র অমৃত ভাণ্ডটি দখল করার জন্য হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু মধ্যপথে তারও হাত থেমে গেল।

অমৃত তারা কেড়ে নিতে এসেছিল, কিন্তু এ যে দিতে চায়।

আরও একজন হাত বাড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু তারও মনে সন্দেহ জাগল, দিতে চায় কেন?

সবাই পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে শুধু বলে, এ কি হল। এ যে দিতে চায়।

সাহসী লোকটি বলল, সত্যিই দিতে চান, না প্রতারণা?

নারদ গম্ভীরভাবে বললেন, অমৃতভাণ্ড তোমাদের সামনেই।

ওরা এ কথায় আবার চমকিত হল, আবার ওদের মনে সন্দেহ জাগল।

একজন এগিয়ে এসে পরীক্ষা ক'রে বলল, অমৃতই বটে। এ রকম বর্ণ এবং গন্ধ আর কোনো বস্তুর হতেই পারে না। বনস্পতি মেশানো থাকলেও শতকরা পাঁচের বেশি নেই।

ওরা আরও কিছুক্ষণ পরস্পর মুখ-চাওয়া চাওয়ি ক'রে বলল, আমরা অমৃত নিতেই এসেছি, নিয়েই যাব, কিন্তু তার আগে নিজেদের মধ্যে একটুখানি পরামর্শ ক'রে নিই, কারণ অমৃত আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। ওর ফলাফল কি হতে পারে এতদিন বিস্তারিতভাবে ভাবার দরকার হয় নি, আজ সেটা বিশেষ দরকার মনে করছি।

দূরে একটি লতাকুঞ্জ দেখা যাচ্ছিল, গোপন পরামর্শের পক্ষে স্থানটি উত্তম বিবেচনা ক'রে ওদের দলপতিরা সেইখানেই গেল।

সেখানে স্বর্গের নর্তকীদল লুকিয়ে ছিল, তারা মানুষের শব্দ পেয়ে পিছন দিক দিয়ে লতাকুঞ্জ ভেঙে পালিয়ে গেল।

দলপতিদের পরামর্শ সভা বসল এইখানে। একঘণ্টা আলোচনার পর, অমৃত ভোগ করতে পারলে জম্বুদ্বীপের কি অবস্থা হবে, সে বিষয়ে ওরা সম্পূর্ণ একমত হল।

ওরা কল্পনা ক'রে খুশি হল যে—

(১) কারও কোনো দুঃখ থাকবে না।

(২) সবাই স্বাধীনভাবে সুস্থদেহে প্রফুল্লমনে বাঁচতে পারবে।

(৩) অকালমৃত্যু সম্পূর্ণ লোপ পাবে।

[৪] দেশে প্রচুর ফসল ফলবে।

[৫] কোনো অভাব না থাকাতে পরস্পরের মধ্যে অন্যায় প্রতিযোগিতাও থাকবে না।

[৬] পূব এবং পশ্চিম দুদিকেরই সম্পদ সমানভাবে বৃদ্ধি পাবে।

[৭] ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

আলোচনা শেষ ক'রে সবাই খুব খুশি হয়ে উঠল। সবাই বলল, এখন অমৃত নিশ্চিন্ত মনে দখল করা যেতে পারে, কোনো দিক দিয়েই আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না। অতএব অবিলম্বে অমৃতভাণ্ডটি হস্তগত হওয়া দরকার।

সভা ভঙ্গ হল, সবাই উঠল।

একজন কিন্তু উঠল না। সে বলল, মস্ত একটা সন্দেহ ঢুকেছে আমার মনে।

সন্দেহ! সন্দেহের কথায় সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। তাইতো সন্দেহ যখন আছে তখন তাদের মনেও তো তা জাগা উচিত। এত সহজে তা হ'লে মতের মিল হওয়া ঠিক হয়নি।

সন্দেহ যাদের মনে জাগেনি তারা নিজেদের নির্বোধ মনে করতে লাগল।

সন্দেহবাদী বলল, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা মানে কি জান?

ওর মধ্যে কি কোনো প্যাচ আছে না কি? ওরা সবাই প্রশ্ন করল।

সন্দেহবাদী বলল, আছে। ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা মানে হচ্ছে গিয়ে, পূব ইচ্ছে করলে পাগড়ী ব্যবহার করতে পারবে, পশ্চিম ইচ্ছে করলে ছাতা ব্যবহার করতে পারবে।

সবাই হতাশ ভাবে বসে পড়ল।

পূব অনেক চিন্তা ক'রে বলল, তাই তো, তা হ'লে অমৃত নিয়ে আমাদের লাভ কি ?

পশ্চিম বলল, আমরাও ভাবছি, লাভ কি ? অমৃতে তা হ'লে তো সমস্যা মিটছে না। বিরোধ বিরোধই থেকে যাচ্ছে, উপরন্তু আমাদের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে গেলে এবং মনে এবং দেহে নতুন শক্তি লাভ হলে আমাদের মধ্যে আগের চেয়েও বেশি ক'রে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবে।

পূব বলল, এটা সম্পূর্ণ ন্যায্য কথা।

একজন আপোষপন্থী ছিল, সে বলল, বেশির ভাগই যদি ভাল হয় তবে একটা বিষয়ের সুবিধা ছাড়লে ক্ষতি কি ?

পূব-পশ্চিম সমস্বরে বলল, ছাড়তে হয় তো অমৃতই ছাড়ব, ধর্ম ছাড়ব না।

দুপক্ষই উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে এলো লতাকুঞ্জ থেকে এবং এসেই নারদকে গিয়ে বলল, অমৃত স্বর্গেই থাক।

ব্রহ্মা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।"

৮

স্বর্গে বিরাট উৎসবের আয়োজন চলছে। দেবতারা আজ মুক্তি দিবস পালন করবেন, এই উপলক্ষে নারদকে মানপত্র দান করা হবে।

ব্রহ্মা নারদকে বলছেন, আমরা স্বর্গে বসে অনেক কিছু সৃষ্টি করেছি, কিন্তু বিভেদসৃষ্টিতে তুমি অদ্বিতীয়।

নারদ বিনীতভাবে বললেন, আপনাকে স্মরণ ক'রেই ধ্যানে বসেছিলাম। হঠাৎ এই সত্যটি মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যে, 'দেব না' বলে যদি অকৃতকার্য হয়ে থাকি, তা হ'লে 'দেব' বললে সফল হতে বাধ্য। পরীক্ষাতেও তার প্রমাণ হয়ে গেল, এখন আর আমাদের ভয় নেই। ওরা যখনই আসবে, বলতে হবে, এই নাও অমৃত। ওরা আর নিতে পারবে না। যদি নিতান্তই নেয় তা হ'লে দেখবে পাত্রটিই নিয়েছে, অমৃত তলার ফুটো দিয়ে বেরিয়ে গেছে, কারণ দেবার আগে পাত্রটি ফুটো ক'রেই দেব।

প্রায়শ্চিত্ত

সকালে পারিবারিক টেবিলে বসে চা কেক ইত্যাদি উপভোগ করাই স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু মিস্টার চক্রবর্তী চায়ের টেবিলে বসেও আজ যেন কেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। চা খেতে বিবেকে আটকাচ্ছে। থেকে থেকে পূর্বরাত্রের স্মৃতি মনে এসে ধাক্কা মারছে। সমাজ আক্রান্ত, লড়াই আসন্ন, কর্তব্য কঠিন। তা ফেলে চা খাওয়া?

পাশের বাড়ির মিস্টার ভট্টাচার্যের অবস্থাও প্রায় একই। তাঁর সমস্ত রাত ঘুম হয় নি। তাঁর স্ত্রীরও না। সামনে সাপ্তাহিক ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান খানা পড়ে আছে, মন লাগছে না। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।

পরবর্তী আর একটি বাড়িতেও ঐ একই ছবি। মিস্টার মুখার্জির সামনে চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। তাঁর স্ত্রীর মাথাও দপদপ করছে।

নিকটস্থ আরও অন্তত দশখানা বাড়িতে ঐ একই কারণে শান্তি ভঙ্গ হয়েছে। মাত্র একটি লোকের অনাচারে সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে যায় যায়।

সবার শত্রু সমাজদ্রোহী নটবর সান্যালকে নিয়ে কি করা যায়। তাঁর স্ত্রী দুর্গারাণী আরও অসহ্য।

গত রাত্রে উত্তেজনা চরমে উঠেছে। নটবর সান্যাল শাসিয়েছেন, তিনি যা করছেন তাই করবেন। রাত বারোটা পর্যন্ত দৃঢ়শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজকে অপমানিত ক'রে মাথা উঁচু ক'রে ফিরে গেছেন। তাঁর এই চ্যালেঞ্জ সমাজ পতিদের বুকে বজ্রের আঘাত হেনেছে। অতএব আর দেরি করা চলে না। নিজেদের কিছু দুর্বলতা আছে বলেই, অনাচার জেনেও, কোনো রকমে সান্যালকে এতদিন তো তাঁরা মেনে এসেছেন, কিন্তু অবস্থা চরমে উঠেছে, আর নয়।

নটবর সান্যাল ধনী, অতএব মাঝে মাঝে টাকা ধার পাওয়া যায়। এমন লোককে অকারণ কষ্ট দেবায় তাই কারো গা ছিল না এতদিন। কিন্তু বাইরের গণ্যমান্য লোকের সামনে তাঁকে নিজেদের একজন ব'লে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার হীনতা আর যে সহ্য করা যাচ্ছে না। তাই আগে যা ছিল অনুরোধ-উপরোধ তা এখন আক্রমণের পর্যায়ে উঠেছে নেহাৎ বাধ্য হয়েই। আর সেই কারণেই একা অনাচারীর বিরুদ্ধে তাঁরা সবাই এমন ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন। এবারে নটবর সান্যালকে সত্যই ভাবতে হচ্ছে, যদিও মৌখিক দাম্ভিকতা কমেনি।

মেয়ে মহলে লজ্জাটা হয়েছে আরও বেশি। দুর্গারাণীকে এতদিন তাঁরা আভাসে ইঙ্গিতে তাচ্ছিল্য ক'রে আসছিলেন, তাঁর ছোঁয়া লাগলে অপবিত্র বোধ করেছেন, রান্নাঘরে এলে রান্নাঘর ডিডিটি দিয়ে ধুয়েছেন, এবারে হাতেকলমে তাঁকে একঘরে করতে হবে, ভদ্রলোক বুঝুন—সত্যমেব জয়তে।

নটবর সান্যালের কানে এসেছে সব কথাই। সমাজসুদ্ধ সবাই একদিকে হলে শুধু টাকার জোরে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা কঠিন, একথা স্বামীস্ত্রী দুজনেই সমস্ত রাত জেগে আলোচনা করেছেন। দুজনে একমতও হয়েছেন এ বিষয়ে।

ক্রমে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে এলো।

দু'তিন দিন ধরে সমাজপতিরা ঘোরতর উত্তেজিতভাবে জটলা ক'রে অবশেষে দিন ঠিক ক'রে ফেললেন। নটবর সান্যালকে চরম পত্র দেওয়া হল তাঁদের সামাজিক বিচারালয়ে উপস্থিত হতে। অপরাধীকে তাঁরা যথেষ্ট-সময় এবং সুযোগ দেবেন—তাঁদের নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত যদি তিনি মেনে নেন। না মানলে তার ফল কি হবে তা তাঁকে শোনানো হবে। তিনি এ সমাজে যাতে বাস করতে না পারেন তার সফল এবং অব্যর্থ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে—শুধু একঘরে হবেন তাই নয়।

সভায় সবাই উপস্থিত হয়েছেন।

ঘড়ি দেখছেন সবাই, সময় হয়ে এসেছে। মুখার্জি ও চক্রবর্তী হয়েছেন মুখপাত্র। যা কিছু বলবার প্রথমে তাঁরাই বলবেন। নটবর সান্যাল রণসাজে সজ্জিত হয়েই আসবেন এটা তাঁরা এক রকম ধরেই নিয়েছেন।

কিন্তু এত আয়োজন বৃথা হল। এ কি ব্যাপার?

নটবর সান্যাল এলেন চোরের মতো।

ঘাবড়ে গেলেন সবাই। আক্রমণের জোর কমে এলো।

মিস্টার চক্রবর্তী সংক্ষেপে বললেন, "ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সামাজিক"—

মিস্টার মুখার্জি বাক্যটাকে আরও একটু এগিয়ে দিয়ে বললেন, "সমাজের দিকে থেকে"—

কথাটা আর শেষ করা হল না। নটবর বললেন, "যা হয় ব্যবস্থা করুন, আমি রাজি।"

সমাজপতিরা বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিছু মনঃক্ষুণ্ণও বটে, কিন্তু হঠাৎ বুঝতে পারলেন, এ তো তাঁদেরই জয়। নটবর সান্যাল তাঁদের সঙ্গে লড়াই করতে আসেন নি, পরাজয় স্বীকার করতে এসেছেন।

তখন আনন্দে এবং বিজয়গর্বে তাঁরা প্রায়শ্চিত্তের আগেই নটবরকে জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগলেন।

মিস্টার চক্রবর্তী বললেন, "দেখুন তো সামান্য বিলেত যাওয়া নিয়ে কি কাণ্ডটাই করলেন এত দিন। সবাই যাচ্ছে, শুধু আপনি জেদ ক'রে বসে আছেন!"

নটবর সান্যাল বললেন, "ব্যবস্থা করুন তবে। কি করতে হয় কিছুই তো জানি না।"

মিস্টার মুখার্জি বললেন, "কোনো ভাবনা নেই, পাসপোর্টের ব্যবস্থা, স্যুট তৈরি সব আমরা করিয়ে দিচ্ছি। টাকা আছে আপনার, বিলেত ঘুরে এসে জাতে উঠুন, মাথা উঁচু ক'রে চলুন, নইলে আমরা যে লজ্জায় মারা যাই।"

মিস্টার মিত্র বললেন, "এক সঙ্গে থাকতে হচ্ছে, অথচ আপনাকে বন্ধু বলে পরিচয় করাতে কি লজ্জাই পেয়েছি এতদিন।"

মিস্টার দত্ত বললেন, "স্বামী স্ত্রী মিলে মুরগী খাওয়াটা অভ্যাস ক'রে ফেলুন আজ থেকেই।"

একটা আনন্দ কোলাহলে বৈঠকখানা মুখরিত হয়ে উঠল। মিসেস্ মুখার্জি কোথেকে একটা মুরগীর কাটলেট এনে নটবরের হাতে দিয়ে বললেন, "খান।"

মিসেস্ চক্রবর্তী বললেন, "বিলেত ফেরৎ গোঁড়াদের সমাজে বাস ক'রে বিলেত যেতে রাজি না হওয়া একটা উচ্ছৃঙ্খলতা, একটা মস্ত বড় অফেন্স।"

মিস্টার দত্ত বললেন, "গোঁড়ামিটা থাকা ভাল সমাজের পক্ষে, ওটাই হল তার বাঁধন, কথাটা আশা করি আর ভুল হবে না নটবরবাবু।"

নটবর সান্যাল বিকৃত মুখে কাটলেট চিবোতে চিবোতে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন—ভুল হবে না।

বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ

নায়েবী আর নবাবীতে যে কালে কোনো তফাৎ ছিল না, সেই কালের মানুষ তারিণী রায়।

তারিণীও নায়েব ছিলেন এক জমিদারের, অথচ মাসিক বেতন ছিল মাত্র ত্রিশ টাকা। এই টাকায় তিনি দেশের গ্রামে মস্তবড় দোতলা বাড়ি করেছিলেন, অনেক টাকার মালিক হয়েছিলেন। এবং তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী নায়েবী আসলে নবাবীরই নামান্তর ছিল। পাল্কী অথবা ঘোড়া ভিন্ন চলতেন না, হুকুম ভিন্ন কণ্ঠে অন্য কোনো ধ্বনি ফুটত না, মদ ভিন্ন পাকস্থলীতে অন্য কোনো পানীয় নামত না। বুদ্ধি ছিল পাকা, এবং সে বুদ্ধির প্রায় ষোল আনাই শয়তানের কাছ থেকে পাওয়া। চিরজীবন কেবল নিয়েই এসেছেন, দেননি কাউকে কিছু। অবশ্য একটি জিনিষ দিয়েছেন তিনি অনেকবার—প্রজার ঘরে আগুন। প্রজাদের জন্য বাজনার ব্যবস্থাও করেছেন—নিলামের ডিক্রীজারীর সময়।

কিন্তু কালের এমনি গতি—এ হেন তারিণীকেও একদিন ঘোর দুর্দশায় পড়তে হল, আর সেও বয়স যখন সত্তরের কোঠায় সেই সময়। যে সূর্যের তাপে তিনি তপ্ত হয়েছিলেন, বাংলাদেশের সেই সুখসমাজের তেজ কালক্রমে নিবে যাওয়াতে তারিণীর তাপও দ্রুত কমে এলো। আধুনিক কালটাই বড় ভয়ানক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা যায় না। চোখ রাঙিয়ে কাজ চলত যখন, এখন সে যুগ অতীত।

তারিণীর নগদ টাকা যা ছিল তাও অতিলোভে পরহস্তগত, চক্রবৃদ্ধির চক্রটা হঠাৎ অচল হয়ে পড়ল, কোনোটাই আদায় হল না। শেষকালে জমি পুড়িয়ে পুড়িয়ে কৃত্রিম তাপ বজায় রাখতে হল কিছুকাল, তারপর তারিণী আর নায়েব নয়, নবাব নয়, একেবারে নবু হবুর মতো সাধারণ মানুষ। শুধু বুদ্ধিটিতে ছিল জীবনস্বত্ব, সেইটি রইল হাতে, যদিও তাঁর নিজের ধারণা বুদ্ধি থাকলে তাঁর এ দুর্দশা হত না।

দুর্দশা তাঁর সত্যিই হয়েছিল, খাওয়া জোটে না এমনি অবস্থা। একমাত্র পুত্রকে লেখাপড়া শেখাননি, পৈতৃক জুতোয় পা ঢুকিয়ে নবাবী করবে আশা ছিল। ভাগ্যক্রমে সেই পুত্রও এখন দায় স্বরূপ হল, উপরন্তু পুত্রের এক কন্যার বিয়ের বয়স হওয়ায় সমস্যা গুরুতর হয়ে দেখা দিল।

টাকা ভিন্ন সে মেয়ে অচল। যে কোনো উপার্জনক্ষম আধুনিক যুবক কিছু লেখাপড়া জানা মেয়ে চায়, টাকার প্রশ্ন তো আছেই। টাকার অভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূরণ করা চলে রূপের দ্বারা, গুণের দ্বারা, কিন্তু সেদিকে পথ বন্ধ। এদিকে মেয়ের বয়স চলেছে বেড়ে, ঘরে রাখা আর চলে না। কাছাকাছি ভাল ছেলে অনেক আছে, তারা নিঃস্বার্থ কাজ অনেক ক'রে থাকে, কিন্তু বিয়ের বেলায় কোনো ছেলে অকারণ বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে চায় না। এমন কি ভূতো নামক যে যুবকটি যে-কোনো দুঃসাহসিক কাজে সর্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সেও বিবাহ বিষয়ে স্বাধীন নয়। ছেলেটি ভাবপ্রবণ অত্যন্ত বেশি, ভাবের তারটি চড়া সুরে বেঁধে দিলে তার অসাধ্য কাজ নেই, একেবারে খাঁটি বাঙালী। অথচ সময় কালে দেখা যায় তারিণী রায়ের প্রায় পায়ে ধরাকেও সে বেশ এড়িয়ে যেতে পারে। তারিণীর নবাবী কণ্ঠে হয়তো মর্মস্পর্শী সুর বেরোয় না।

বছর খানেক ধরেই তারিণী এই ছেলেটিকে নানাভাবে ভজাতে চেষ্টা করে আসছেন, তার বাবার কাছে ব্যর্থ হয়ে তার কাছেই আবেদন জানাতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু কাছে গেলেই সে পালিয়ে যায়।

তারিণীর বুদ্ধি সত্যই ভেঙে পড়ার মুখে। অবশেষে আর কোনো উপায় না দেখে তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করলেন।

আত্মহত্যার জন্য নয়। যাদের তিনি এতকাল সামাজিক মর্যাদায় ছোট বলে জেনেছেন তাদের কাছে এই পরাজয় সত্যই মর্মান্তিক। সোজা পথে কাজ হবে না, অথচ বক্র পথটিও যে কি তা বুদ্ধির অতীত। মন গলানোর ভাষা তাঁর জানা নেই। বুদ্ধির পথেই আরও একবার চেষ্টা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই রুদ্ধদ্বারে রুদ্ধপথের প্রবেশ মুখ খুঁজতে তিনি সুদীর্ঘ বারোটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন। পরদিন সকাল বেলাই বিদেশ যাত্রা। হয়তো কোনো পথের সন্ধান তিনি পেয়েছেন।

তিনদিন পরে তারিণী রায় যখন ঘরে ফিরে এলেন তখন তাঁর এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল। যেন মুমূর্ষু লোকটি হঠাৎ নতুন জীবন লাভ ক'রে ফিরে এলেন। একেবারে শুভস্য শীঘ্রম যাকে বলে—বিয়ের নাকি আর মাত্র সাতদিন বাকী। খুব উৎসাহের সঙ্গেই তিনি সব জায়গায় প্রচার করতে লাগলেন নাতনীর বিয়ের কথা। কিন্তু পাত্রটি যে কে তা কেউ জানতে পারল না, বাড়ির লোকেও না। তবে এইটুকু জানা গেল পাত্রের বয়স একটু বেশি, কিন্তু উপায় কি ?

বয়স বেশি, কত বেশি ? সবাই প্রশ্ন করে।

তারিণী বলেন পঞ্চাশ পেরিয়েছে, তবে দেখতে চল্লিশ। ভাল পাত্র। তৃতীয় পক্ষ হলেও আগের দুপক্ষের মাত্র কয়েকটি মেয়ে আছে, ছেলে নেই। অবস্থা ভাল, দুবেলা দুটো খাওয়া জুটে যাবে, না খেয়ে মরবে না মেয়ে।

শুনে প্রবীণেরা মুখটিপে হাসেন, তরুণেরা উৎকর্ণ হয়, উত্তেজিত হয়।

বিয়ের দিন চলে এলো।

বর পূর্বদিন সন্ধ্যায় আসবে, দূরের গ্রাম্যপথ, একদিন হাতে থাকা ভাল। গ্রামের এক আত্মীয় তাঁর বাড়ির এক অংশ ছেড়ে দিলেন, এবং বর ও বরযাত্রীরা এসে পৌঁছল যথ সময়ে।

তারিণী রায় একটু হাতে রেখে বলেছিলেন, কারণ বরের বয়স খুব কম করেও পঁয়ষট্টি বছর, দাঁত নেই, চুল সমস্ত পাকা, লোলচর্ম, লাঠিতে ভর দিয়ে চলে, চোখ দুইটি যেন কাচের তৈরি, চশমাতেও ভাল দেখতে পায় না।

কিন্তু তবু বিয়ে বাড়িতে কি উৎসাহ, ছুটোছুটি আর হৈ হল্লা। কিন্তু সে উৎসাহ শুধু তারিণীর একার। বর দেখে সবাই দমে গেছে, প্রকাশ্যে বলাবলি করছে মেয়েকে বিষ দিলেই ভাল হত এর চেয়ে। তারিণী রায়ের উপর যাবা অত্যন্ত চটা ছিল, তারাও তার নাতনীর কথা ভেবে দুঃখ করতে লাগল।

তারিণী রায় সহাস্যে বলেন, তা বিয়ে আর মনের মত হয় ক'জনের ? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা না করলে চলবে কেন ? বরের বাইরেটা দেখেই বিচার কর কেন, মেয়ে সুখে থাকবে।

যুবক মহলে চাঞ্চল্য জাগে। তারা উত্তেজিত হয়, বলে, বুড়োকে এইখানেই সাবাড় করে দিই, কোথাকার এক মড়া ধরে এনেছে শ্মশান থেকে, তারিণী রায় পিশাচ—ইত্যাদি।

কিন্তু বিয়ের লগ্ন দ্রুত এগিয়ে আসে। ভূতো অন্তরালে দল পাকায়। এ বিয়ে ভাঙতে হবে যেমন ক'রে হোক।

এমন সময় শাঁখ বেজে ওঠে, উলুধ্বনিতে বিবাহসভা মুখরিত হয়, বর বিয়ের বেশে প্রস্তুত হয়ে আসে।

বিবাহ সভায় শুধু মেয়েদের আর বুড়োদের আনাগোনা, কাজের লোক, ছুটোছুটির লোক একটিও নেই, একটি যুবকেরও দেখা নেই, এক অস্বাভাবিক আবহাওয়া। প্রলয়ের আশঙ্কায় চারিদিকে যেমন শাঁখ বেজে ওঠে, তেমনি শাঁখ বাজছে মেয়েদের মুখে, করুণ সুরে। মেয়েটি কাঁপছে থর থর করে। মেয়ের বাবা ঘরে দরজা বন্ধ করেছে। মেয়ের মায়ের দুচোখ বেয়ে জল ঝরছে অবিরাম।

এমন সময় সত্যই প্রলয় নেমে এলো। এতক্ষণের অদৃশ্য যুবকেরা লাঠি হাতে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে এসে হাজির সভাস্থলে। ভীত তারিণী রায় এক লাফে গিয়ে বরকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে বাঁচাবার জন্য।

ভূতো বলল, এ বিয়ে হতে পারে না। আপনি ছাড়ুন বুড়োকে, ওকে খুন করব আমরা।—ভূতোর সঙ্গীরা সে কথার প্রতিধ্বনি করল।

মেয়ে বিধবা হবে?

বিয়ে এখনও হয় নি, চালাকি শুনব না।

তারিণী রায় বললেন, তার চেয়ে আমাকে মারো তোমরা।—বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন।

তারিণীর জীবনে বোধ হয় এই প্রথম কান্না, কিন্তু এর জন্য তিনি তৈরি ছিলেন আগে থাকতেই। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি বললেন, আমার সর্বনাশ করবে তোমরা? এ মেয়েকে এখন কে বিয়ে করবে?

ভূতো বলল, সে ব্যবস্থা আমরা করছি।

কানাই বলল, আপনি বুড়োকে দূর করুন। কিন্তু সেজন্য অপেক্ষা না ক'রে সমীর তারিণীকে ও বরকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ভূতোকে সেখানে দাঁড়াতে ইসারা করল।

কানাই চিৎকার ক'রে বলল, বিয়ের নিমন্ত্রণে বরের 'রামশরণ দত্ত' এই ভুল নাম বলা হয়েছিল, বরের নাম ভূতো—অর্থাৎ ভূতনাথ সরকার।

ভূতো কিন্তু চমকে উঠল এ কথা শুনে, কারণ সে এর ধ্বংসমূলক দিকটিই ভেবেছিল, গঠন মূলক দিকটি ভাববার সময় পায় নি, কিন্তু কানাই যথাসময়ে তার নামটি উচ্চারণ ক'রে তাকে আর অন্য কিছু ভাবতে দিল না। বর সেজে দাঁড়ানোর জন্য যতখানি উত্তেজনা দরকার, কানাই বুঝতে পেরেছিল ঠিক ততখানি উত্তেজনা ভূতোর মনে জেগেছে, তাই মন্ত্রের মতো কাজ হয়ে গেল। ভূতো লাঠি ফেলে এক লাফে এসে দাঁড়াল মেয়ের পাশে।

সেই মুহূর্তে সেই পরিত্যক্ত লাঠিখানা ভূতোর বাবা হস্তগত ক'রে পুত্রের শির লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে আসতে লাগলেন, কিন্তু ছেলেরা সহজেই তাঁর হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিল। এবং দলের আর কয়েকজন তাঁকে জাপটে ধরে রাখল, তিনি নিষ্ফল আক্রোশে গর্জাতে লাগলেন।

হঠাৎ বিবাহসভায় রোমাঞ্চ জাগল। একটা নাটকীয় চরম দৃশ্যের অনিশ্চিত পরিণামের জন্য সবাই দম বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগল। সবাই উন্মুখ, সবারই মুখ উজ্জ্বল।

পুরোহিত যুবকদের ইঙ্গিত পেয়ে মন্ত্র পড়াতে আরম্ভ করল। সভাস্থল সত্যকার আনন্দ কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল।

পরদিন তারিণী এবং রামশরণের মধ্যে নিভৃতে নিম্নলিখিতরূপ আলাপ হচ্ছিল—

রামশরণ। নাতনীর বিয়ের জন্য এই শ'খানেক টাকা যোগাড় ক'রে এনেছি, নে রেখে দে।

তারিণী গদগদভাবে টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে বললেন, উপযুক্ত বন্ধুর কাজ করেছিস তুই।

রামশরণ। কিন্তু ছোকরারা মেরে ফেলেছিল আর কি। তোর যতসব কাণ্ড, কিন্তু প্যাঁচটা ভগবানের আশীর্বাদে খেটে গেল তাই রক্ষে।

তারিণী। কিছু মনে করিসনে ভাই, নিরুপায়ের ঐ একটি মাত্র পথই ছিল।

রামশরণ। কিন্তু ছোকরারা যদি এগিয়ে না আসত?

তারিণী। সম্বন্ধে নাতনী, চলে যেত এক রকম, কি বলিস? কিন্তু আমি জানতাম ভূতো আসবে।

(১৯৫০)

আমাদের "জন্মস্বত্ব"

"বাঙালী কোনো দিন কোনো অন্যায় সহ্য করেছে ? করেনি। বাংলাদেশের অংশবিশেষ বিহারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল যখন, তখন বাঙালী তা সহ্য করেছিল, কারণ দেশ তখন ছিল ইংরেজের। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সেই অন্যায় সে আর মানতে প্রস্তুত নয়। তার আরও কারণ"—

প্রথম বক্তা কথা শেষ না করতেই দ্বিতীয় বক্তা বলল—"জানি, বিহারে থেকেও বাঙালী এতদিন বাংলা ভাষায় পড়াশোনা করতে পেরেছে, কথা বলতে পেরেছে, কিন্তু আর পারছে না। এখন তাদের উপর জোর ক'রে হিন্দিভাষা চাপানো হচ্ছে, এত বড অন্যায় বাংলাদেশ সহ্য করবে না।"

১৯৩৭ সনে বাংলাদেশ উত্তেজিত। সর্বত্র সভা বসছে এবং এই জাতীয় বক্তৃতা হচ্ছে। বই ছাপা হচ্ছে শত শত। বাঙালীদের মধ্যে এমন একতা ১৯০৫-এর পরে আর দেখা যায় নি। বাংলা ভাষার প্রতি সবার মমতা হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে। শিক্ষিত বাঙালী বলছে এমন ইন্‌জাস্টিস্ আমরা টলারেট করব না। নেভার। বাঙলা ভাষায় কথা বলা আমাদের বার্থরাইট, এই বার্থরাইটে হাত দেয় কে ?

কি উত্তেজনা এবং আবেগ। শুধু সভা নয়, তার সঙ্গে শোভাযাত্রা। শুধু যে দিন ভাল খেলা থাকে অথবা নতুন সিনেমা ছবি (বাঙলা অথবা হিন্দি) আরম্ভ হয়, শুধু সেই দিনটা শোভাযাত্রা বাদ যায়।

ওদিকে হিন্দি প্রচার দিনের পর দিন যত জোরালো হয়ে উঠতে লাগল, এ দিকের উত্তেজনা বাডতে লাগল ঠিক সেই পরিমাণে। দ্বিখণ্ডিত বাংলাদেশ। আশ্রয়প্রার্থীর জায়গা হয় না। আমরা আমাদের হারানো সীমা ফিরে পেতে চাই। আমরা যা চাই তা দিতেই হবে, এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছ বাছাধনরা ? বেদখল করলেই হল ?

দাবীর যেমন জোর, কলমের জোর তেমনি। পুস্তিকার সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। আশ্চর্য গবেষণা, নির্ভুল হিসাব। এই সব পুস্তিকা পড়লে জানা যাবে আমাদের কত বর্গমাইল জমি বিহার দখল ক'রে আছে, তাতে কত বাঙালীর বাস, শতকরা কত জন বাঙলা বলে এবং তাদের উপর জোর ক'রে হিন্দি চাপানোয় তাদের শতকরা কতজন এই ধর্মান্তর গ্রহণের দুঃখ ভোগ করছে।

এ সব অকাট্য সত্য কথা। প্রতিবাদ চলে না। মাতৃভাষা ভুলিয়ে দেওয়া পাপ।

কিন্তু কোনো প্রতিবাদ শোভাযাত্রাই আধ-মাইলের বেশি দীর্ঘ হয় না, তার গতিও কয়েক মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কলকাতা শহরের সীমা ছাড়িয়ে তা বিহার সীমানা স্পর্শ করে না। তাই বিক্ষোভের ধ্বনি শহরের হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, মুদ্রিত পুস্তিকা ঘরে জমতে থাকে, বিহার নিশ্চিন্ত থাকে, নতুন শক্তি লাভ করে। এমনি ক'রে কাটে বছরের পর বছর।

এলো ১৯৫০।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষ্য করছিল সব। কিছুদিন থেকেই সিণ্ডিকেটের গোপন সভা বসছিল। হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে ফেল করিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ধ্বংস আসন্ন হয়ে উঠেছে এইবারে তার পূরণ হতে পারবে এমন সম্ভাবনার কথা সভায় আলোচিত হল। এবং তার পরেই দেখা গেল বাংলার বাইরে বাঙালীর সংখ্যা, তাদের ভাষা, তাদের ইতিহাস, তাদের ভূগোল এবং মোট কত প্রবাসী বাঙালীর বাংলা ভাষায় পড়াশুনা করার অধিকার, এই বিষয়ে এম-এ পরীক্ষা নেবার জন্য পৃথক একটি পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ খোলা হয়ে গেছে। বিষয়ের নাম হয়েছে আর-এল-বি অর্থাৎ "রিক্ল্যামেশন অব লস্ট বেঙ্গল।" অন্যান্য এম-এ বিষয়ের মতো এরও প্রশ্নপত্র আটটি। যে সব পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে তাদের নাম—

"Fundamental Rights of the Bengalis outside Bengal" "What Bengal lost to Pakistan shall gain in Purnea and Manbhum" "Despite Partition we are still seven crores" ইত্যাদি।

এই বিষয়টি এম-এ পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শুধু যে লোকসান এড়িয়েছে তাই নয়, তার উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ এত হয়েছে যে সে পৃথক একটি ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবসা চালাবার আয়োজন করছে। আর শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, পুস্তক প্রকাশকদের ভাগ্য ফিরে গেছে এই সঙ্গে, বিশেষ ক'রে নোট প্রকাশকদের। কারণ রিক্ল্যামেশন অব লস্ট বেঙ্গল-এ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা লাখের কাছে। সমস্ত মারমুখী গ্র্যাজুয়েট দলে দলে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। এমন কি ছোট প্রকাশকেরাও "বেঙ্গল বাউণ্ডারি এক্সটেনশন মেড ঈজি" "বেঙ্গলী ফর দি বেঙ্গলীজ ইন ওয়ান আওয়ার" "আওয়ার বার্থরাইট অ্যাট এ গ্ল্যান্স" জাতীয় সব বাঁশের সাঁকো বাঁধছে পরীক্ষা বৈতরণী পারের যাত্রীদের জন্য।

১৯৫৫ সনের মধ্যেই বাংলাদেশের যাবতীয় লোক বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাংলার অংশ, বাঙালীর সংখ্যা এবং এ সম্পর্কে হাজার রকম তথ্য মুখস্থ ক'রে ফেলল। বাঙালী মাত্রেই এখন হয় এম-এ (আর-এল-বি), অথবা রিক্ল্যামেশন অব লস্ট বেঙ্গল" বিষয়ের জ্ঞানে তাদের সমান। এখন তারা শোভাযাত্রা বের করে না, কিন্তু আর-এল-বি বিষয়ে যাবতীয় তথ্য গড় গড় ক'রে মুখস্থ বলে যেতে পারে। এখন তারা তাদের সংস্কৃতি বৈঠকে (সংখ্যা অগণিত) বসে মাসে একবার ক'রে হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে আলোচনা করে। তার পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন ইতিহাস এই—

প্রথম পর্যায় ; ভাষার ভিত্তিতে দেশের সীমানা পুনঃস্থির নীতি কংগ্রেসেরই নীতি। অথচ যত দিন যাচ্ছে ততই দেখছি এই নীতির বিপরীতটাই ঘটছে। বিহারের যে ভাগে বাঙালীরাই বাস করে সেটা তো বাঙলাদেশরই অংশ, সেখানকার মাতৃভাষাও বাংলা। এই মাতৃভাষার উপর জোর ক'রে হিন্দি চাপানো আমরা সকল শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পযায় : (প্রতিবাদ সভা আরও বড) আমাদের ভ্রাতভাইদের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাদের উপর জোর ক'রে হিন্দি চাপালে সে হোবে না। এ অন্যায় আমরা মানবে না। যেমোন ক'রে হোক লোড়াই ক'রে হোক বাঙগালীর জন্ম সোত্বো বজায় রাখতে হোবে। প্রোভিনশিয়াল ঝগড়া হোবে, ভাই সাথ ভাই লোড়বে 'আপ্রাণ' লড়বে, তবভি ছোড়বে না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৃতীয় পযায়ের (১৯৭০ সনের) সভায় হঠাৎ ব্যতিক্রম দেখা গেল। যে সভা ঘরে চলছিল সেই সভা বসল ময়দানে মনুমেণ্টের নিচে। বিরাট সভা, বিরাট খরচ, কিন্তু এত টাকা বাঙালী কোথায় পেল ? আর এটাই হল তার শেষ পযায়। তারা বলল :

"কেঁও, কেঁও, কেঁও হাম হয়ে জবরস্তি বরদাস্ত করুঙ্গা ? আংরেজ নে ধোকবাজি করকে মেরা দেশ দুসরা কো দে দিয়া থা। লেকিন আজ যব আজাদি কি হাওয়া বহনা শুরু কী হায় তব কেঁও হামারা মুলুক মেরি মাতৃভূমি মেরা দখলমে নেহি আওগে ? হাম লড়ুংগা, জান কবুল লড়ুংগা, আওর যো যো হামারা দৌলত হজম করনা চাহতা হায় উনসে ছিন্ লুংগা। হাম বাংগালীওঁ জান কুরবান করুংগা পর দেশ কভি নেহি ছোড়ুংগা।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শত্রুরা রটাচ্ছে, বেহারের লোকেরাই বাঙালীদের এই আন্দোলনের সমস্ত খরচ জুগিয়ে চলেছে নিয়মিত।

(১৯৫০)

স্বর্গীয় সমস্যা

বিশ্বকর্মা সবিনয়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মার কাছে এসে নিবেদন করলেন, "স্বর্গে, সিমেণ্টের বড়ই অভাব ঘটেছে, এখন আর নবাগতদের জন্য নব উপনিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়, সাহিত্যিকদের উপনিবেশেই ওদের জায়গা করতে হবে।"

সিমেণ্টের সত্যই অভাব ঘটেছিল। দেব সেনাপতির আদেশে স্বর্গের সুবৃহৎ দেবস্থানের জন্য চীনের প্রাচীরের মতো একটি রক্ষীপ্রাচীর সম্প্রতি গড়তে হয়েছে। এর কারণ মানবাত্মাদের স্বর্গবাসের উপযুক্ততা আগে যেমন কঠোরভাবে বিচার করা হত এখন আর তা হচ্ছে না। নানা স্বার্থের লোক এখন স্বর্গে আসছে এবং এ বিষয়ে অনেকক্ষেত্রে মানুষের বিচারের উপরেই নির্ভর করা হচ্ছে। তাই আশঙ্কা, স্বর্গশাসনতন্ত্রে ডেমোক্রেসির দাবী প্রবল হলে হয় তো কালক্রমে দেবস্থান আক্রান্ত হতে পারে।

বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। চতুরানন তাঁর উত্তরদিকস্থ মুখে উত্তর দিলেন, "আমিও সেটা ভেবেছি। আর শুধু ভাবা নয়, কর্তব্যপথের বাধা যাতে দূর হয় সে চেষ্টাও অনেকখানি ক'রে ফেলেছি এর মধ্যে। সাহিত্যিকদের উপনিবেশেই ওদের স্থান হয়ে যাবে।"

এই একত্রবাসই বিশ্বকর্মার সাম্প্রতিক সমস্যা। সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই ব্রহ্মার সম্মতি নিতে চান। ব্রহ্মারও তাই ইচ্ছা জেনে তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, "প্রথম গণ্ডগোলটা কেটে গেলেই ওরা পরস্পরকে সহ্য করতে পারবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন, "যারা এসেছে তাদের সঙ্গে কি কি বস্তু আছে?"

বিশ্বকর্মা বললেন, "চালের বস্তা, চিনির বস্তা, সিমেণ্টের বস্তা, তেলের টিন, আরও কত কি। কিন্তু হিরন্যগর্ভ, কর্তব্যপথের বাধা দূর করা বিষয়ে কি ভেবেছেন শুনতে বাসনা।"

ব্রহ্মা বললেন, "শুনবে যদি তা হ'লে সরে এসো পশ্চিম দিকে। আমার উত্তরদিকস্থ মুখ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কদিন ক্রমাগত কথা বলে।"

বিশ্বকর্মা যথাদিষ্ট সরে এলে ব্রহ্মা পশ্চিমদিকের মুখে বলতে লাগলেন, "কিছুদিন ধরে একটা গুজব কানে আসছিল যে সাহিত্যিকরা তাদের সঙ্গে যে কীর্তি বহন ক'রে এনেছে তার মধ্যে ফাঁকি আছে। তাদের কীর্তির শতকরা আশী ভাগ না কি বাতিল হবার যোগ্য। সম্প্রতি আমি পৃথিবীতে দূত

পাঠিয়ে নিশ্চিত জানতে পেরেছি গুজব ভিত্তিহীন নয়, সত্য। সুতরাং তাদের বাতিল অংশ বাদ গেলে সাহিত্যিকদের উপনিবেশে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা হবে এবং সেখানে নবাগতদের জায়গা হয়ে যাবে।"

দেবশিল্পীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল একথা শুনে। তাঁর যেন একটা ফাঁড়া কেটে গেল। পৃথিবীর খবরের কাগজে চোরাকারবারীদের দুষ্কার্যকে 'কীর্তি' বলে প্রচার হবার পর থেকে যখনই চোরকারবারী মারা যাচ্ছে তখনই তাদের সূক্ষ্মদেহ তাদের কীর্তির বোঝা নিয়ে স্বর্গে চলে আসছে, তাই স্বর্গের গৃহ সমস্যা প্রবল হয়ে উঠছিল। বিশ্বকর্মা নিরুপায় হয়ে পড়ছিলেন নানা কারণে। সিমেণ্টের অভাবটাই তার মধ্যে প্রধান। কিন্তু ব্রহ্মার কথায় বোঝা গেল বিশ্বকর্মাকে আপাতত আর নতুন আশ্রয় শিবির গড়তে হবে না। তিনি খুশি ভাবে বললেন, "এখন সাহিত্যিকদের তোয়াজ টোয়াজ ক'রে রাজি করাতে পারলেই সব মীমাংসা হয়ে যায়, কিন্তু ওরা যে রকম অভিমানী!"

ব্রহ্মা বলিলেন "আমি ওদের ডেকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যদি বুঝতে পারে ওরা অন্যায়ভাবে অনেকখানি জায়গা দখল ক'রে আছে তা হ'লে আর গণ্ডগোল করবে না। তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, লোকটি যুক্তির পথে চলতে ভালবাসে, ওকেই সব বুঝিয়ে বলি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন। স্বর্গে বাস ক'রে তাঁর চেহারা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, হঠাৎ দেখে মনে হয় স্বর্গেরই স্থায়ী বাসিন্দা কোনো দেবতা।

রবীন্দ্রনাথ নমস্কারান্তে সবিনয়ে বললেন, "আদেশ করুন, প্রজাপতি।"

ব্রহ্মার পশ্চিম দিকের মুখও ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় দক্ষিণমুখে কথা শুরু করলেন। কবি বুঝতে পারলেন এটা দাক্ষিণ্যের মুখ, প্রসন্নতার মুখ, অতএব ভয়ের কারণ নেই কিছু।

ব্রহ্মা প্রশ্ন করলেন, "তুমি শাজাহান কবিতা লিখেছিলে মনে আছে?"

"অবশ্য আছে।"

"ওর মধ্যে এক জায়গায় লিখেছিলে—তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ, তাই তব জীবনের রথ পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার বারম্বার'— মনে আছে?"

"মনে আছে।"

"ভুল বুঝতে পেরেছ?"

"মর্ত্যবাসীর এত সৌভাগ্য আগে কল্পনা করতে পারি নি, ভেবেছিলাম

কীর্তিমান কীর্তিকে পিছনে ফেলে একা স্বর্গে আসে। কিন্তু এখানে এসেই সে ভুল ভেঙেছে। কারণ আসামাত্র শাজাহান আমাকে বললেন 'ঐ দেখ, আমার তাজমহলও আমার সঙ্গে এসেছে।' বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হওয়া গেল না, দেখি আমার কীর্তিও পিছনে পড়ে নেই। আমার প্রথম বই থেকে শেষ বই সবই আমার সঙ্গে এসেছে, এবং সবগুলো সংস্করণ। ওর মধ্যে আগেকার সচিত্র চয়নিকা, পকেট ক্ষণিকা, জাপানী শোভন সংস্করণ সব আছে।"

"শেক্সপিয়ারের ঘর দেখেছ ?"

"দেখেছি, পিতামহ। তাঁর সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন আলাপ হচ্ছে নাটক বিষয়ে। ভেরিওরাম এডিশনটা আমাকে তিনি দেখতে দিয়েছেন। কিন্তু আর বোধ হয় দেখা চলবে না, কারণ কয়েকজন চোর তাদের লটবহর নিয়ে আমাদের পল্লী দখল করতে চাইছে।"

ব্রহ্মা বললেন, "তাদের জয়গা দিতে হবে তো ? সুতরাং তোমাদের জায়গা কিছু ছাডতেই হবে। অনেকখানি জায়গা তোমরা অন্যায়ভাবে দখল ক'রে আছ। এতে অবশ্য তোমাদের ব্যক্তিগতভাবে কোনো দোষ নেই। তোমাদের কীর্তির মধ্যে যে এত ফাঁকি আছে তা আমিও আগে জানতাম না। সেই ফাঁকি সমেত সব চ'লে এসেছে তোমাদের সঙ্গে।"

কবি বললেন, "আমি তো আগেই বলেছি—'রাত্রের আঁধারে হায় কত সোনা হয়ে যায় মিছে, সে সব ফেলিয়া যাব পিছে।' স্বর্গে আসার পরে দেখছি ফেলে আসা যায় না।"

ব্রহ্মা বললেন, "জানি, আর সে জন্য তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে। তোমার কীর্তি যে তোমার সঙ্গে এসেছে সেজন্য তুমি অবশ্যই দায়ী নও, স্বর্গের বিধান দায়ী। কিন্তু সম্প্রতি আমি একটি সত্য আবিষ্কার করেছি এই যে তুমি এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের কীর্তি অতি সামান্য। যা সঙ্গে এসেছে এখন তার শতাংশও টেকাতে পারি কিনা বলা শক্ত।"

কবি বললেন, "কি ভাবে আবিষ্কার হল ?" বলে বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন চতুরাননের প্রতি।

চতুরানন বললেন, "বড় ক্লান্ত, পূব দিকে এসো।" অতঃপর তিনি পূবদিগের মুখ থেকে বললেন, "চাক্ষুষ প্রমাণ দেখাচ্ছি। দূত"—

দূত এসে প্রণাম জানাল।

"পৃথিবী থেকে কি এনেছ দেখাও।"

ইতিমধ্যে দেখা গেল কালিদাস, শেক্সপীয়ার, মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ,

ব্রাউনিং, শেলী, কীট্‌স্‌, এবং আরও অনেকে তাঁদের সাহিত্যিক উপনিবেশ থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন ব্রহ্মার দিকে। চোরদের সঙ্গে থাকতে কেউ রাজি নন।

ব্রহ্মা বললেন, "শান্ত হও তোমরা। জায়গা ছাড়তে হবে নবাগতদের জন্য। তোমরা এসে পড়েছ যখন, তখন সব প্রত্যক্ষ কর।"

দূত বিরাট এক বোঝা এনে নামাল তাঁদের সম্মুখে। বোঝাটি পুস্তকের।

ব্রহ্মা শেক্সপীয়ারকে বললেন, "তোমার যে কোনো একখানা বই এর মধ্য থেকে নিয়ে খুলে দেখ।"

শেক্সপীয়ার যেখানা তুলে নিলেন সেখানা ম্যাকবেথ। খুলে দেখলেন মাঝে মাঝে পেন্সিলে চিহ্ন আঁকা আছে, এবং চিহ্নের পাশে লেখা আছে IMPORTANT.

ব্রহ্মা বললেন, "যে সব জায়গায় ইম্পরট্যাণ্ট লেখা আছে, মাত্র সেই অংশগুলো তোমার কীর্তি। তোমার ঐ পাঁচ অঙ্কের নাটকখানায় মাত্র ঐ অংশগুলো লিখলেই চলত, বাকীটা স্রেফ ফাঁকি। অবশ্য এই আবিষ্কারের গৌরব আমার নয়, তোমাদেরই কলেজের অধ্যাপকদের।"

রবীন্দ্রনাথ ফস ক'রে তাঁর একখানা কাব্যগ্রন্থ তুলে নিয়ে দেখেন, সেখানেও ঐ একই চিহ্ন। প্রত্যেকটি কবিতার চার লাইন থেকে ছ'লাইন মাত্র ইম্পরট্যাণ্ট। এরপর কালিদাস, ব্রাউনিং, শেলী, কীটস, টেনিসন সবাই কৌতূহলী হয়ে নিজ নিজ বই খুলে দেখেন, ঐ একই ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হয়ে বললেন, "ভাব যেখানে গাঢ় হয়ে উঠেছে শুধু সেই স্থানটিই পৃথকভাবে কাব্য নয়, সমস্তটা মিলে একটা অখণ্ড কাব্য।"

শেক্সপীয়ার আত্মগতভাবে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

To-morrow and to-morrow and to morrow
Creeps in this petty pace from day to day...

ব্রহ্মা সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে রবীন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বললেন, "সমস্তটা মিলে অখণ্ড একটি কাব্য, ওটা তোমার কল্পনামাত্র। যারা পড়ায় এবং যারা পড়ে তারাই কাব্যের যথার্থ জহুরী। পরীক্ষার্থীরাও ঐটুকু মাত্র পড়েই পাস করে। অতএব ঐ খণ্ড অংশগুলোই তোমাদের কীর্তি। যে ফুল চায় সে গাছটাকে বাদ দেয়।"

রবীন্দ্রনাথ একটু চিন্তা ক'রে বললেন, "কিন্তু ফুল যে ফোটায় তার পক্ষে গাছটাকেও যে গড়ে তোলা দরকার। ফুলের ব্যবসায়ী ফুল ছিঁড়ে নেয় বটে,

কিন্তু যে ফুল উপভোগ করতে চায়, সে ফুলের সঙ্গে গাছও পালন করে, এবং ফুল ছেঁড়ে না।"

ব্রহ্মা স্বয়ং স্রষ্টা, তিনি ভাবতে লাগলেন কথাটা। তাঁর বিশ্বাস গাছটা সত্যই অবান্তর। শুধু ফুল সৃষ্টি করলে হত। বাংলাদেশের কলেজীয় প্রভাব আর কি।

এদিকে রবীন্দ্রনাথের বুকে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ঘনিয়ে এলো। তিনি মনে মনে বাল্যকালে লেখা কবিতাটি আবৃত্তি করতে লাগলেন—

" ...শত ঋতু আবর্তনে শতদল উঠিতেছে ফুটি
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ
দেখো তার সৌন্দর্য বিকাশ
মধু তার কর তুমি পান
চেয়ো না তাহারে।"

ব্রহ্মা আত্মগত ভাব থেকে জেগে উঠে বললেন, "ফুল গাছের কীর্তি, এ কথা মান তো?"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "প্রজাপতি, গাছই যেখানে স্রষ্টা, ফুল সেখানে তার কীর্তি। কিন্তু গাছকে যিনি সৃজন করেছেন তিনি ফুলের সঙ্গে গাছকে রাখতে বাধ্য। অতএব আপনার যুক্তিতে ভুল আছে।"

ব্রহ্মা সত্যই বুঝতে পারলেন কবির কথায় যুক্তি আছে। কারণ ঐ ইম্পরট্যাণ্ট লাইনগুলো কাব্য যদি নিজে সৃষ্টি করত, তা হ'লে, ঐ লাইনগুলো রেখে আর সব বাদ দেওয়া যেত। কিন্তু কবি হচ্ছেন সব খানির স্রষ্টা, তাই বাদ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাঁর গাছ বাদ দিয়ে ফুল ফোটানোর কল্পনাটা নষ্ট হয়ে গেল, তিনি উদাসভাবে ভাবতে লাগলেন।

লেখকদের ভিড়ের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়িয়ে ছিলেন বারনার্ড শ। এতক্ষণ কেউ তাঁকে লক্ষ্য করেন নি। তিনি এতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন একখানি বইও স্পর্শ না ক'রে, কিন্তু শান্তভাবে নয়, বদ্ধমুষ্টি অবস্থায়।

ব্রহ্মার দৃষ্টি পড়ল তাঁর দিকে। তিনিও তাঁর এই অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য ক'রে বললেন, "তুমি বই দেখছ না কেন? তোমার এ রকম হিংস্র মূর্তিই বা কেন?"

বারনার্ড শ বললেন, "আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

"কি প্রার্থনা?"

"আমি বাংলাদেশে ফিরে যাবার অনুমতি চাই। মাত্র এক সপ্তাহের জন্য। দেবেন অনুমতি ?"

ব্রহ্মা প্রশ্ন করলেন, "সেখানে কলম চালিয়ে কিছু হবে আশা করছ ?"

বারনার্ড শ বললেন, "না, কলম নয়, বজ্রমুষ্টি চালাতে চাই।"

ব্রহ্মা তাঁকে সস্নেহে বললেন, "তা আর দরকার নেই, এখানেই তোমরা শান্তিতে থাক, তোমাদের উপনিবেশের সীমানায় অন্যদের প্রবেশ নিষেধ ক'রে দিচ্ছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালী নিজেই এক অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করেছে, তাতে বাংলা দেশের কলেজেও মহা শান্তি বিরাজ করবে, কোনো গণ্ডগোল নেই, কোলাহল নেই, পাঠ নেই, পরীক্ষা নেই, ছাত্রও নেই, অধ্যাপকও নেই। কারণ শিক্ষা ওরা আর চায় না, ওরা পরস্পরকে শিক্ষা দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে, বোমার সাহায্যে। সুতরাং ইউরোপীয় মধ্যস্থতারও আর দরকার নেই।"

বারনার্ড শ কল্পনা করতে লাগলেন সেই অবস্থাটা। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং ধীরে ধীরে বদ্ধমুষ্টি খুলে গেল।

তখন সবাই মিলে ব্রহ্মাকে অভিনন্দন জানিয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেলেন।

(১৯৪৫)

বাহান্ন সালের পূজা-সংখ্যা

রাজেন্দ্র তরফদার নামক এক প্রধান ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা তাঁর বৈঠকখানায় বসে একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস পডছিলেন। ইনি কে এবং কেন ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছিলেন সে খোঁজে দরকার নেই। কিন্তু ইনি সহসা এক অপরিচিত যুবকের আবির্ভাবে বিস্মিত হলেন কেন, দেখা যাক।

যুবক বিনীতভাবে তরফদার মহাশয়কে নমস্কার ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

তরফদার প্রশ্ন করলেন, কোত্থেকে আসছ?

যুবক বলল, আসছি বালিগঞ্জ থেকে, একটি বিশেষ কাজে।

বিশেষ কাজটি কি?

আজ্ঞে সেটা ঠিক প্রকাশ ক'রে বলবার মতো নয়, কাজটি অত্যন্ত তুচ্ছ। আমাকে আপনি দয়া ক'রে একখানি সুপারিশ পত্র যদি দেন—

চাকরির?

আজ্ঞে না, শুনেছি যজ্ঞেশ্বর চাটুয্যে আপনার বন্ধু। তাঁর কাছে আপনার একখানি পরিচয়-পত্র চাই। তাঁর কাছে সোজা গিয়ে দেখা করা নাকি বড়ই কঠিন।

তোমাকে না চিনেই পরিচয় পত্র দেব কেমন ক'রে?

আমার পরিচয় আমিই দিচ্ছি। আমি কবি।

যজ্ঞেশ্বর কবিতা পছন্দ করে বলে তো জানি না।

আজ্ঞে, তিনি পছন্দ না করলেও ক্ষতি নেই। তাঁর কাছ থেকেও একখানা চিঠি নেব আপনার চিঠি দেখিয়ে।

তোমার কি মতলব বল তো?

যুবক একটু ইতস্তত ক'রে বলল, যজ্ঞেশ্বর বাবুর জামাই এবারে "দুঃখ নিশি ভোর" কাগজের পূজো সংখ্যার সম্পাদক। তাঁর কাগজে যদি আমার একটা কবিতার স্থান হয়।

কবিতা ছাপার জন্য এত কাণ্ড করতে হয় না কি?

আজ্ঞে আমরা উদীয়মান কবি, এ ছাড়া আর আমাদের গতি নেই।

সুপারিশ পত্র দেখালেও যদি না ছাপে?

এবারে শ' খানেক বিশেষ সংখ্যা কাগজ বের হচ্ছে পূজো উপলক্ষে—কোনো না কোনোটায় লেগে যেতে পারে।

একই সুপারিশ পত্রে ?

আজ্ঞে না। খান পঞ্চাশেক জোগাড় করেছি নানা কাগজের জন্য—যেখানে লেগে যায়।

তুমি কি বেকার ? সারা দিন এই ক'রে বেড়াচ্ছ ?

আজ্ঞে বেকার নই। আমি এক অফিসে কাজ করি। কিন্তু ঘোরাঘুরির জন্য এক মাস ছুটি নিয়েছি বিনা বেতনে।

বল কি !

আজ্ঞে আমি একা নই, শহরের নানা অফিস থেকে অন্ততঃ শ' পাঁচেক কবি আর গল্প লেখক আমারই মতো ছুটি নিয়েছে। না নিয়ে উপায় কি বলুন ?

রাজেন্দ্র তরফদার বিস্মিত দৃষ্টিতে যুবকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, তাঁর দয়া হল এবং কাগজ কলম সংগ্রহ ক'রে সুপারিশপত্র লিখতে বসলেন।

২

"সূর্যোদয়" কাগজের পূজা-সংখ্যার সম্পাদকের ঘর। কাগজ প্রকাশ হতে আর মাত্র তিন সপ্তাহ আছে, কিন্তু সম্পাদক বিচলিত। যাঁদের গল্প না হলে কাগজ বের করা বৃথা, তাঁদের অধিকাংশেরই খোঁজ নেই এখনও। কবিতা বহু সংগ্রহ হয়েছে, কিন্তু গল্প নেই। আর একটু পরেই উদীয়মান কথাসাহিত্যিক ও কবির ভিড় লেগে যাবে। তাদের ঠেকানো দুঃসাধ্য। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তারা এসে ভেঙে পড়ে। অধিকাংশের মুখেই ফেনা উঠে যায়, তারা সর্বত্র ঘুরে ঘুরে মাথা কুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোথায়ও তাদের স্থান নেই। সম্পাদক তাদের অনেকের লেখা পড়ে দেখেছেন—উৎকৃষ্ট সব লেখা। ভাল গল্পও অনেকে লেখে, ভাল কবিতাও লেখে, কিন্তু সেগুলো তো আর ছাপা যায় না। ছাপলে সেইগুলোতেই কাগজ ভর্তি হয়ে যায় এবং সে কাগজ পাঠ্য হিসাবে অবশ্য খারাপ হয় না। কিন্তু ছেপে লাভ কি ? কাগজ বিক্রি হবে না। পরিচিত লেখকের লেখা চাই। তাদেরও দাবী আছে পূজা-সংখ্যার উপর। বহু নিন্দা মাথায় বয়ে, বহু ঘা খেয়ে, বহু অপযশ সহ্য ক'রে, এতদিন তাঁরা শুধু স্বাস্থ্য ভাল বলে টিকে আছেন। যাঁদের স্বাস্থ্য ভাল নয়, ঘা খেয়ে যাঁরা বিচলিত হয়েছেন, তাঁরা ইহসংসারে আর নেই।

সুতরাং পরিচিত লেখকদের স্থান দিতেই হবে পূজা সংখ্যায়। এবং তাদের স্থান দিতে গেলে নবাগতদের পথ বন্ধ। নবাগতদের মধ্যে যাদের স্বাস্থ্য ভাল

তারাও একদিন স্থান পাবে, সম্পাদক এই ভরসা দিয়ে তাদের বিদায় ক'রে দিচ্ছেন। কিন্তু বিদায় করা সহজ নয়। প্রাণ অতিষ্ঠ হয়। পথে দেখা হলে দলে দলে অনুসরণ করে। বাজারে গেলে সেখানেও ক্রেতাদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ত্রিশজন কবি বা গল্প-লেখক বাজার ফেলে সম্পাদককে চেপে ধরে। রাত্রে ঘুমোলে এসে ঘুম ভাঙায়।

"সূর্যোদয়" সম্পাদকের হাতে আর সময় নেই। "দুঃখ নিশি ভোর" কাগজের সম্পাদকেরও ঐ একই অবস্থা। ক-কাগজ, খ-কাগজ, গ-কাগজ প্রত্যেকের এক অবস্থা।

এবারের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির অর্থ কি ?

বার বার চিঠি দিয়ে এবং দেখা ক'রেও কোনো পরিচিত গল্প-লেখক এবারে এতদিনও গল্প পাঠাচ্ছেন না কেন ?

সমস্ত পূজা-সংখ্যা সম্পাদক উন্মাদপ্রায়—এ রকম বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে তাঁদের কখনও হয় নি।

এক দিকে নতুন লেখকদের আক্রমণ, অন্যদিকে প্রার্থিত লেখকদের উদাসীনতা, এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে একশ পূজা-সংখ্যা সম্পাদকের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে উঠল। প্রতি গল্পের জন্য একশ টাকা দক্ষিণা কবুল ক'রেও লেখা পাওয়া যাচ্ছে না, এ কেমন কথা ?

অবশেষে আত্মরক্ষার শেষ পথই তাঁরা অবলম্বন করলেন। ঠিক করলেন, নিজেরাই লেখকদের বাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকবেন, এবং লেখা না নিয়ে উঠবেন না। এর পরিণাম হল অতি মারাত্মক। সে কথা বলতে হলে গোড়ার কথা কিছু বলা দরকার।

৩

এক মাস আগের কথা। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই সব বোঝা যাবে। আমরা সুবিধার জন্য একজন লেখকের কথাই উল্লেখ করব। পৃথকভাবে সবার দৃষ্টান্ত দেবার দরকার নেই, কারণ সম্পাদকদের মতো লেখকদেরও একই ইতিহাস।

গোবর্ধন তলাপাত্র পরিচিত গল্প লেখক।

রাত্রে তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

কিন্তু রাত তিনটের সময় কড়ানাড়ার শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

কে ?—গোবর্ধন নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

আমি ক-কাগজের লোক, একটি গল্প চাই আপনার কাছে,—পূজা-সংখ্যার জন্য।

গোবর্ধন দরজা খুলে বাইরে এসে প্রশ্ন করলেন, এই অসময়ে?

ক-কাগজের লোক বলল, গল্প এবারে একটু আগেই দরকার কি না—পঁচিশটি টাকা সঙ্গে করেই এনেছি। নানা জায়গায় ঘুরতে হবে, সময় পাব না, তাই একটু সকাল সকাল এসে পড়েছি। টাকাটা রেখে দিন, দিন সাতেক পরে এসে গল্প নিয়ে যাব।

কুড়ি টাকার বেশি একটি গল্পের জন্য কোথায়ও পাওয়া যায় নি, এবারে অযাচিতভাবে কিছু বেশি পাওয়াতে গোবর্ধনের মনে পুলক জাগল। বললেন, সাত দিন পরেই আসবেন।—গোবর্ধন আবার গিয়ে শুয়ে পড়লেন, কিন্তু ঘুম হল না।

আধ ঘণ্টা পরে পুনরায় কড়ানাড়া।

এবারে খ-কাগজের লোক। অগ্রিম ত্রিশ টাকা নিয়ে এসেছে।

গোবর্ধন আর শুতে পারলেন না।

আরও পরে গ-কাগজ থেকে লোক এসে জানাল তাদের লেখাটাও খুব জরুরি, অগ্রিম ত্রিশ টাকা।

ঘ-কাগজের লোক পঁয়ত্রিশ টাকার প্রস্তাব নিয়ে এলো।

ঙ-কাগজের লোক এসে বলল, তাদের সম্বল অতি কম, মাত্র কুড়িটি টাকা তারা দিতে পারে।

গোবর্ধন বললেন, পূজোর পরে আসবেন, পারি তো দেব।

চ-কাগজ থেকে চল্লিশ টাকার প্রস্তাব এলো।

গোবর্ধন গল্প লেখা বন্ধ ক'রে বসে বসে শিস দিতে লাগলেন।

গোবর্ধনের ইতিহাসই সব লেখকের ইতিহাস।

শিস দিতে দিতে গোবর্ধন ভাবতে লাগলেন, এতদিন আমরা কি নির্বোধই ছিলাম। বসে বসে এতদিন চোরাবাজার মুনাফা শিকারীদের বিরুদ্ধে লিখেছি, অথচ তাদের কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারিনি। এবারে পেয়েছি সুযোগ, এবারে চোখ খুলেছে। এ সুযোগ ছাড়া হবে না। এবারে শেষ দেখতে হবে।

'আর্থিক দুনিয়া'র সম্পাদক এসে প্রস্তাব দিলেন, আপনারা সব আমার আশ্রয়ে আসুন। শতকরা দশ টাকা কমিশন দেবেন, আমি বাজার দর আরও তেজি ক'রে দিচ্ছি।

গোবর্ধন এ প্রস্তাব খুশি হয়ে সমর্থন করলেন।

পরদিন থেকে গল্পের বাজার দর 'আর্থিক দুনিয়া'য় নিয়মিত ছাপা হতে লাগল। "অন্তকার গল্পের দর চল্লিশ।" "অন্তকার গল্পের দর আরম্ভ হয় চল্লিশে, বন্ধ হয় পঁয়তাল্লিশে।" "গল্পের বাজার দর আজ স্থির আছে।" "আজ গল্পের দর সহসা চড়িয়া পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, মনে হইতেছে আরও চড়িবে।" "আজ গল্পের দর ষাট টাকা।" "আজ গল্প বিক্রি বন্ধ আছে, মনে হয় দর আরও চড়িবে।"

এই ভাবে চলল 'আর্থিক দুনিয়া'র অভিযান। লেখকেরা এই কাগজের দিকে চেয়ে ফেঁপে রইলেন, গল্প কাউকে দিলেন না। ক্রমশ দর একশ টাকায় গিয়ে দাঁড়াল।

কোনো প্রবীণ ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে লেখকদের কাছে প্রস্তাব করেছিল, সব গল্প সে একা কিনে নেবে এবং ব্ল্যাকমার্কেট ক'রে দর আরও চড়িয়ে দেবে, কিন্তু 'আর্থিক দুনিয়া'র সম্পাদকের তাতে মত না থাকাতে উক্ত ব্যবসায়ী গল্পগুলো হাত করতে পারেনি।

৪

'আর্থিক দুনিয়া'য় গল্পের বাজার দর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকেরাও উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতিদিন সে দিকে লক্ষ্য ক'রে যেতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তাঁরা লেখকদের কাছে গিয়েছেন কিন্তু লেখকেরা কোনো মতেই গল্প হাত ছাড়া করেননি। তারপর যখন বাজার দর একশ টাকা উঠল, তখন সম্পাদকেরা আরও একবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তবু কিছু হল না। এর বেশি গেলে তাঁদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে।

অবশেষে তাঁদের যেতেই হল লেখকদের বাড়িতে। এইবার শেষ চেষ্টা।

ক-সম্পাদক প্রথমে গেলেন গোবর্ধনের কাছে। গিয়ে দেখেন তার আগে অন্তত পঞ্চাশ জন সম্পাদক সেখানে উপস্থিত হয়েছেন, এবং আরও সবাই আসছেন একে একে।

ক-সম্পাদক গিয়ে শুনতে পেলেন, গোবর্ধন ইতিমধ্যেই অন্য সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। তিনি বলছেন, এই যুদ্ধের সুযোগে গত ছ-বছর ধরে ব্যবসায়ীরা লাখ লাখ টাকা লাভ করেছে, অথচ আমরা ব্যবসায়ী হয়েও কিছুই করতে পারিনি। ভবিষ্যতেও কখনও পারব না।

খ-কাগজের সম্পাদক বলছেন, সে কথা ঠিক, কিন্তু আমরাও তো লেখার

দাম অসম্ভব রকম বাড়িয়ে দিয়েছি এ বারে, এখনও গল্প ছাড়তে আপত্তি করছেন কেন ?

আপত্তি করছি কেন ? যুদ্ধ কি আর কখনও হ'বে ? যুদ্ধ থেমে যাবার মুখে যে যেভাবে পারছে লুঠে নিচ্ছে। আমাদেরই এক টাকার বই বাজারে চার টাকা ক'রে বিক্রি হচ্ছে অথচ আমরা জানিনা। যে কোনো ব্যবসার দিকেই দেখুন, কেউ ছাড়ছে না কাউকে। এমন কি ডাক্তারেরাও যে-কোনো অসুখে অপারেশন চালাচ্ছে—ম্যালেরিয়া জ্বরেও চালাচ্ছে, সর্দিতেও চালাচ্ছে। আমরাই কি বাজারের একমাত্র ওঁছা ব্যবসায়ী যে দু-পয়সা লাভ করলেই অপরাধ ?

ক-সম্পাদক মরীয়া হয়ে এসেছেন। তাঁর গায়েও যেমন শক্তি, মনেও তেমনি সাহস। তিনি আজ আর কোনো যুক্তি শুনবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

খ-সম্পাদককে ঠেলে দিয়ে তিনি এগিয়ে গোবর্ধনের মুখের উপর গিয়ে বললেন, শুনুন আমি শেষবার জানতে এসেছি আজ আপনার গল্প পাব কিনা।

গোবর্ধন বললেন, আজকের বাজার দর না দেখে ছাড়ব না। একশ টাকার উপরেও কিছু আশা করছি এ-বেলা।

"আমি আশা করছি অন্য রকম", বলে ক-সম্পাদক গোবর্ধনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেন, এবং তাঁকে জাপটে ধরে চিৎ ক'রে ফেললেন। তা দেখে অন্যান্য সম্পাদকেরাও গোবর্ধনের উপরে গিয়ে পড়ে কেউ বা হাত কেউ বা পা ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। মনে হল যেন গোবর্ধনকে তাঁরা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলবেন।

আক্রান্ত গোবর্ধন আর্তনাদ ক'রে উঠলেন।

তিনি চিৎকার করতে করতে বললেন, গল্প এখুনি দিচ্ছি। আমাকে ছাড়ুন।

সবাই সমস্বরে বললেন, ছাড়ব না।

গোবর্ধন আবার বললেন, দর কমিয়ে দিচ্ছি।

সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করলেন, কত ?

এক হাতে যত আঙুল। ছাড়ুন আমাকে।

ছাড়ব না।

দু হাতে যত আঙুল।

তবু ছাড়ব না।

চার হাত-পায়ে যত আঙুল।

তবু ছাড়ব না।

অর্ধেক কমাব।

আরও কমান।

তা হ'লে মারা পড়ব। 'শক্' কাটিয়ে উঠতে পারব না।

আচ্ছা অর্ধেকেই রাজি।

গোবর্ধনকে সবাই ছেড়ে দিলেন। গোবর্ধন বড় একখানা নভেল লেখা শেষ করেছিলেন মাস দুই আগে। পূজোর চাহিদা দেখে তাড়াতাড়ি সেই নভেলকে একশো ভাগে ভাগ ক'রে একশটি ছোট গল্প তৈরি ক'রে রেখেছিলেন। একশ জন সম্পাদককে সেই একশটি গল্পই পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বিক্রি করতে বাধ্য হলেন। ১৩৫২ সালেই একশ টাকা ক'রে সেগুলো বেচে বাড়ি কেনার মতলব করেছিলেন তা আর হল না।

পরদিন শোনা গেল প্রত্যেকটি লেখকের কাছ থেকে প্রায় একই উপায়ে এঁরা লেখা সংগ্রহ করেছেন, এবং কেউ কেউ আরও কমে রাজি হয়েছেন, এবং কয়েকজন লেখককে হাসপাতালেও যেতে হয়েছে।

'আর্থিক দুনিয়া'র সম্পাদকের কাছেও এঁরা গিয়েছিলেন, কিন্তু লেখা সংগ্রহের জন্য নয়।

তিনি এখন হাসপাতালে।

(১৯৪৫)

কমন সেন্স

দাঁতের ব্যথাটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

ভেবেছিলাম ব্যথাটা ক দিন পরে আপনা থেকেই সেরে যাবে, সুতরাং অ্যাস্পিরিনের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। কিন্তু তিন দিন পরেও যখন কিছু কমল না, বরঞ্চ আরও অসহ্য হয়ে উঠল, তখন বাধ্য হয়েই আত্মচিকিৎসা ছেড়ে দন্ত-চিকিৎসকের দিকে আকৃষ্ট হলাম।

আগেই বলে রাখি আমার বয়স পঁচিশ বছর এবং আমি বাল্যকাল থেকেই দাঁতের যত্ন নিয়ে আসছি, সুতরাং এ বয়সে আমি যে আমার আবাল্য লালিত দৃঢ়সম্বদ্ধ দশনকুলের একটিকে অসুস্থ হতেই চিরকালের জন্য ত্যাগ করব এ কল্পনা স্বভাবতই আমার মনে আসে নি। আমি যাচ্ছিলাম চিকিৎসকের কাছে কিছু ওষুধের ব্যবস্থা আনতে।

পথে বন্ধু তারকের সঙ্গে দেখা।

"কোথায় চলেছিস সকাল বেলাই?"

"আর বলিস কেন, বড় বিপদে পড়েছি।"

"কি রকম?"

"দাঁতের ব্যথা।"

"তোর দাঁত তো চমৎকার, ব্যথা হল কেন?"

প্রশ্নটা অযৌক্তিক। কারণ দাঁতের যে অংশ দৃশ্য সে অংশ কুশলেই আছে। অসুস্থ হয়েছে অদৃশ্য অংশ, দাঁতের শিকড়, স্থানটি দন্তীর আয়ত্তের বাইরে। তাই যন্ত্রণা সত্ত্বেও তারকের ভুলটা দেখিয়ে দিলাম, বললাম—

"শ্রীমতী মালতীরও তো সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে, অথচ দিন সাতেক আগে তার অসুখ নিয়ে তুই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলি।"

তারক সবিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, "তোর অসুখটা যে মারাত্মক নয়, তা তোর এই মারাত্মক রসিকতা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।"

আমি বললাম "ঐ তোর আর একটা ভুল। সংসারে সকল রসিকতারই মূল উৎস ব্যথা।"

"দাঁতের ব্যথা নয়"—তারক গম্ভীর স্বরে বলল।

আমি বললাম, "যে-কোনো ব্যথা।"

"কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারবি তোর ব্যথা নিয়ে তোরই উপর রসিকতা করবে আর এক জন।"

"কে?"

"ডাক্তার।"

"কেমন ক'রে?"

"তোর রসিকতার উৎসের মূলোৎপাটন ক'রে।"

"আমি তো দাঁত তোলাব না।"

"কিন্তু ডাক্তার তুলবে।"

"জোর ক'রে?"

"জোর ক'রে নয়, তোকে সম্মোহিত ক'রে। তুই নিজেই বলবি তুলে দিন। কিন্তু রসিকতা থাক, আমার কথা হচ্ছে, তুই ডাক্তারের কাছে গিয়ে ভুল করছিস।"

"কিন্তু ব্যথা সত্যিই অসহ্য হয়ে উঠেছে যে—না গিয়ে উপায় কি?"

"যদি যেতেই হয়, তা হ'লে মনটা বেঁধে নে আগে। তার চেয়ে চল আমিই যাই তোর সঙ্গে, দাঁত তোলা এখন চলতে পারে না।"

"তুই সঙ্গে যাবি এ তো ভাল কথা, আমার দাঁতের রক্ষীর কাজ করবি। যদি ডাক্তার জোর করে, তুই প্রতিরোধ করবি।"

২

ডাক্তার দাঁত পরীক্ষা করলেন নানা ভাবে। তারপর আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললাম "একটা প্রেসক্রিপশন—"

ডাক্তার যন্ত্রের সাহায্যে মুখ হাঁ করিয়ে ভিতরে আলো ফেললেন এবং একখানা ছোট্ট আয়না মুখের ভিতর ধরে বললেন "নিজেই দেখুন।"

দেখলাম নিজেই, অর্থাৎ কিছুই দেখলাম না। কারণ উক্ত দাঁতের পিছন দিক কেমন তা আগে কখনো দেখিনি, তাই বুঝতে পারলাম না কিছু।

ডাক্তার বললেন, "রুট এক্সপোজ্‌ড্‌ হয়ে গেছে, পরিণাম অতি ভয়ানক।"

"কি রকম ভয়ানক?"

"দাঁতের গোড়া সেপটিক হয়ে মারা যেতে পারেন।"

"সে ভয় তো জীবনের প্রতি মুহূর্তেই আছে। মারা তো যে-কোনো উপলক্ষে যেতে পারি।"

তারক আমার কথা শুনে অসীম তৃপ্তিভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। ডাক্তার বললেন, "বুঝলাম আপনি দার্শনিক, কিন্তু আমরা তো ডাক্তারির বাইরে আর কিছু ভাবি না।—যদি কথাটার গুরুত্ব না বুঝতে চান তা হ'লে কোনো দার্শনিক পণ্ডিতের কাছে যান।"

তারক বলল "ডাক্তারের ব্যবস্থা নিতেই তো এসেছি।"

ডাক্তার বললেন "আমাদের একমাত্র ব্যবস্থাই আছে—দাঁত তুলব।"

"এ ভিন্ন আর কোনো উপায় নেই ?"

"আছে। সে হচ্ছে দাঁত না তোলা এবং আপনাকে মরতে দেওয়া।"

তারক শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল, পাছে আমি ডাক্তারের কথায় ভয়ে রাজি হয়ে যাই।

কথাটা শুনে ভয় পাইনি বললে মিথ্যা বলা হয়, তারক না থাকলে এতক্ষণ দাঁত তোলাও হয় তো আমার হয়ে যেত, কারণ ডাক্তারের খোঁচাখুঁচিতে ইতিমধ্যে ব্যথা সকল সীমা ছাড়িয়েছে, দাঁতের গোড়া দপ দপ করছে, মনে হচ্ছে এখুনি আপদ বিদায় করা ভাল। কিন্তু তারকের ভয়ে বললাম, "বেশ, দুটো দিন বাদে আসব আপনার কাছে, আজ প্রস্তুত হয়ে আসিনি, আজকের মতো একটা ওষুধের ব্যবস্থাই ক'রে দিন, দাঁত তোলাব আমি ঠিকই।"

৩

পথে বেরিয়ে তারক আমাকে বলতে লাগল, "দাঁতের গোড়া যখন শক্ত আছে, তখন দাঁত তোলা ভয়ানক অন্যায়। ব্যথা হয়েছে, দু চার দিন সহ্য ক'রে থাকলেই কমে যাবে। তার পর দাঁতের গোড়াও আপনা থেকেই শক্ত হয়ে যাবে, মাড়ি এসে ঢেকে দেবে, জুড়ে যাবে ক্ষতস্থান। দাঁতের ডাক্তারের কাছে সে জন্য সহজে আসতে নেই, ওরা দাঁত দেখলেই তুলে ফেলে।"

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করলাম, এবং মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলাম, বেদনার মেয়াদটা কোনো রকমে সহ্য করতেই হবে।

তারক উৎসাহের সঙ্গে বলল, "কমন সেন্স একটুখানি প্রয়োগ করলেই বুঝতে পারবি সব ভোগেরই একটা ভোগান্ত আছে। দাঁতের ব্যথা তোর কতদিন থাকতে পারে ? বড় জোর সাত দিন ? না হয় তো দশ দিন, বিশ দিন, এক মাস, এক বছর ? না হয় দশ বছর ?"

"দশ বছর ?"—আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

তারক বলল, "এই বুঝি কমন সেন্স ?—ম্যাক্সিমাম্ সাত দিন, তার বেশি থাকে তো আমরা দুজনেই গলাগলি ক'রে গিয়ে দাঁত তুলিয়ে আসব।"

বিকেলে রবি এলো দেখা করতে। এসে সব শুনে প্রায় ক্ষেপে গেল। বলল, "তুই অত্যন্ত অন্যায় করছিস দাঁত না তুলিয়ে। তোদের মতো লোকের একটু কমন সেন্স থাকা উচিত।"

কমন সেন্স! তারকও বলেছিল আমার ঐ জিনিসটির অভাব আছে। দাঁতের ব্যথা হ'লে মানুষের কমন সেন্স থাকে না।

রবি বলে চলল, "দাঁতের গোড়ার ঐ একটি ফোকাসের ভিতর দিয়ে সমস্ত জীবনীশক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে, বাইরের কতকগুলো মারাত্মক জীবাণু ওখানে আশ্রয় নিয়েছে, তারা চব্বিশ ঘণ্টা বিষ তৈরি করে তোর সর্বাঙ্গে ছড়াচ্ছে, আর তুই ভীরু, একটি দাঁতের মায়ায় এতগুলো শত্রু পুষছিস মুখের মধ্যে।"

রবি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে আমাকে লজ্জিত করল। দাঁতের ব্যথা বেড়েই চলছিল, তার উপর রবি অন্তরে ব্যথা দিল। আমার এই বন্ধুর মধ্যে এমন একটি দন্তোৎপাটনের সমর্থক পেয়ে আমি মনে মনে বড়ই তৃপ্তি পেলাম। বললাম, "কাল সকালেই দাঁত তুলিয়ে ফেলব, তুই ভাই, আমাকে নিয়ে যাস ডাক্তারের কাছে।"

"কাল ? কাল কেন, আজই তোলা উচিত, এই মুহূর্তে তোলা উচিত।"

আমি মিনতি ক'রে বললাম, "না, আজ থাক, আজই সকালে বেরিয়েছিলাম, এখন আর উঠতে পারছি না, জ্বরও রয়েছে বেশ।"

রবি একটু ভেবে বলল—"বেশ, আজ থাক, কাল সকালে এসে আমি তোকে নিয়ে যাব।"

রবি চলে গেল শিস দিতে দিতে।

সকল ব্যথার অবসান হবে সাঁড়াশির একটিমাত্র মোচড়ে, ভেবে বড়ই আরাম বোধ হল।

তারক এলো ঘণ্টাখানেক পরে। জিজ্ঞাসা করল "কেমন আছিস ?"

বললাম, "আর যে সহ্য করা যাচ্ছে না ভাই। দাঁত না তোলালে বোধ হয় মারা যাব।"

তারক আহত হল এ কথায়। সে রীতিমতো ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, "তোদের মতো লোকের কাছে একটু কমন সেন্স আশা করেছিলাম—ভেবেছিলাম সহজ কথা সহজ ভাবেই বুঝতে পারবি, তাই উপদেশ দিয়েছিলাম।"

তারকের মনে যে আঘাত লেগেছে সেটা স্পষ্ট বুঝলাম, কিন্তু দাঁতের ব্যথা

যে মনের ব্যথার চেয়ে অনেক বড়, তা এখন ওকে কি ক'রে বোঝাই। বললাম, "ভাই, যন্ত্রণায় হয় তো মাথার ঠিক নেই, তাই সম্ভব অসম্ভব যত সব কল্পনা আসছে মনে।"

"কিন্তু তাই বলে আত্মহত্যা করতে চাস?"

আমি কাতর কণ্ঠে বললাম, "চোখে সব অন্ধকার ঠেকছে, পথ দেখতে পাচ্ছি না, তুই আমাকে পথ দেখা।"

তারক শান্ত হল আমার আবেদনে। বলল, "দাঁত সহজে তুলতে নেই। পায়ে ফোড়া হলে আমরা পা কেটে ফেলি না, মাথা ধরলে শিরশ্ছেদ করি না, চোখে অসুখ করলে চোখ উৎপাটন করি না, সর্দি হলে নাক কাটি না, কেবল দাঁতে ব্যথা হ'লে দাঁত তুলি। এটা কি যুক্তি হল? আর কেন যেন দাঁত তোলার দিকে লোকের ঝোঁক দিন দিন বেড়েই চলেছে। চীনা মিস্ত্রীরা পর্যন্ত সেজন্য এদেশে বসে বেশ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।"

আমি বললাম, 'বেশ, আমি আর ওর মধ্যে নেই।"

তারক এবারে খুশি হয়ে বলল, "উত্তম। আমি কাল সকালে ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে আসব, ভাল ডাক্তার।"

কথাটা শুনে শিউরে উঠলাম। কারণ কাল সকালে রবি আমাকে দাঁত তোলাতে নিয়ে যাবে কথা আছে।

বললাম, "না, আবার ডাক্তার কেন, এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে সব।"

"সে তোকে ভাবতে হবে না, আমি যখন ভার নিলাম তখন ব্যথা সারানোর দায়িত্বও আমার।"

৮

শুয়ে শুয়ে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করছি। তারক যেমন একগুঁয়ে, ডাক্তার আনবেই। ওদিকে রবি আমাকে ভালবাসে, সে আমার জন্য কিছু করতে পারলে ছাড়ে না। সুতরাং সেও ঠিক আসবে। তার সঙ্গে যেতে রাজি না হলে সে ক্ষেপে যাবে। আবার তারক ডাক্তার নিয়ে এসে যদি আমাকে দেখতে না পায়, সেও হবে এক দারুণ ব্যাপার।

দাঁতের ভয়াবহ যন্ত্রণার উপর এই ভয়াবহ সমস্যা। কিন্তু আপাতত দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল জ্যোতিষ, শশাঙ্ক আর যতীন।

জ্যোতি বলল, "তোমার অসুখের কথা শুনলাম।"

শশাঙ্ক বলল, "দাঁতে আবার কি হল?"

যতীন বলল, "শুনছি তুমি না কি দাঁত তোলাবে ?"

বুঝলাম আমার অসুখের খবরটা পাখা মেলেছে। কিন্তু তাতে কেন যেন একটা অজানা ভয় মনকে ব্যাকুল ক'রে তুলল। আমার এই যন্ত্রণা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করা আমার পক্ষে কষ্টকর, তদুপরি অতি দ্রুত আমাকে এক গুরু পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে—সেটি ঝড়ের মেঘের মতো আমার কল্পনার উত্তর পশ্চিম কোণে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি তখন নিরুপায়।

যতীন বলল, "দাঁত যদি তোল, তা হ'লে ভয়ানক অন্যায় করবে।"

শশাঙ্ক বলল, "একটা দাঁত তুললে তার পাশের গুলোকেও আর ঠেকাতে পারবে না।"

জ্যোতি বলল, "এক একটা পাটিতে ষোলটি দাঁতের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে একটা তোলাও যা, ষোলটি তোলাও তাই। আর, একপাটি দাঁত অবশিষ্ট থাকা মানে গোরু হওয়া।"

যতীন জোরের সঙ্গে বলল, "দাঁত না নড়লে কখনো দাঁতকে নাড়া দিতে নেই।"

এই ভাবে আক্রমণ চলল নানা দিক থেকে।

আমি বহু কষ্টে বললাম, "দাঁত তোলাব মধ্যে আমি নেই।"

কথাটা শুনে তারা নিশ্চিন্ত হচ্ছিল, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়ল রবি, এবং এসেই খুব উত্তেজিত ভাবে আমাকে বলল, "শুনলাম দাঁত নাকি তোলাবি না ?"

আমি ইসারায় যন্ত্রণার দিকে দেখিয়ে তাদের সবাইকে বলতে চেষ্টা করলাম যে এখন আর কথা বলতে ভাল লাগছে না।

রবির প্রশ্নের উত্তর দিল শশাঙ্ক। বলল, "তুলতে দিচ্ছে কে ?"

রবির চোখে যেন আগুন জ্বলল এ কথায়, সে এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল যাতে আমি ভস্ম হয়ে যেতে পারি।

আমি বললাম, "একটুখানি বস ভাই, পরে সব বলছি।"

যতীন, শশাঙ্ক এবং জ্যোতি বিদায় নিয়ে উঠে গেল, বলল, "আমরা উঠি ভাই, তোমরা পরামর্শ কর।"

ওদের ভাষায় একটু বিদ্রূপের সুর ছিল, এবং সেটি আমার ভাল লাগল না।

ওরা চলে গেলে রবি বলল, "ওদের মতলবটা ভাল মনে হচ্ছে না। তোর সর্বনাশ হবে যদি ওদের পাল্লায় পড়িস। দেখছি তোর দুর্বলতার সুযোগ ওরা পুরোপুরিই নিচ্ছে। জানি আমি সবই।"

চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। সবই জানি মানে কি?—কিন্তু রবিই অনেকটা আশ্বস্ত করল, সে আমাকে বুঝিয়ে দিল—ওরা তারকের চর হিসেবে এসেছে, পাছে ব্যথা বেড়ে গিয়ে আমি দাত তুলতে চাই, তাই ওরা নাকি পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু রবিও সতর্ক আছে, সে তারকের মতলব হাসিল করতে দেবে না।

রবি প্রায় ঘণ্টাখানেক আমার কাছে বসে দাঁত তোলার ব্যবস্থা পাকা ক'রে ফেলল। বলল, "কাল সকালে আমার প্রথম কাজ হবে তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, তুই প্রস্তুত হয়ে থাকবি, আমি এসেই নিয়ে যাব।"

কোনো রকমে বললাম, "আচ্ছা, তাই হবে।"

আমার সমস্ত মনপ্রাণ ঐ দাঁতটির সমূল বিনাশ কামনা করছিল, ভালয় ভালয় কাজটি হয়ে গেলে এখন বাঁচি।

রবি বলল, "কিন্তু ওরা যদি এসে বাগড়া দেয়?"

"শুনব না ওদের কথা।"

"যদি জোর করে?"

"না না, জোর করবে কেন?"

"তুই জানিস না ওদের, তোর সর্বনাশ না ক'রে কি ওরা ছাড়বে?"

"না, তুই অকারণ ভয় পাচ্ছিস।"

"ভয় কি আর ইচ্ছে ক'রে পাচ্ছি?—দাত না তুললে কি পরিণাম হবে বুঝতে পারছি কি না।"

"আরে না না, আমি ঠিক আছি।"

"তবে কথা রইল, আমি সকালে আসব এবং তোকে নিয়ে যাব।"

রবি চলে গেল। কিন্তু তার ওঠবার আগেই আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একটি ছায়ামূর্তি জানলার পাশ থেকে যেন সরে গেল।

কে ঐ ছায়ামূর্তি? তারকের?—না ওর দলের কারো? কিছু বুঝতে না পেরে একটি অ্যাস্পিরিনের বড়ি খেয়ে শান্ত হবার চেষ্টা করলাম।

৫

রাত্রে ঘুম হয়েছিল ভালই, কারণ শোবার আগে আরও একটি বড়ি খেয়েছিলাম।

হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে জেগে উঠে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এখনও রাতের

অন্ধকার দূর হয় নি, কে কড়া নাড়ে এই শেষ রাত্রে? প্রশ্ন করতে চাপা কণ্ঠে উত্তর এলো, "আমি তারক।"

"এখন? এই অসময়ে?"

দরজা খুলে দিলাম। দেখি ওরা তিন জন এসেছে।

তারক বলল, "আর সময় নেই, ওরা রওনা হচ্ছে, তোকে এখনি এখান থেকে আমরা নিয়ে যেতে চাই, ওরা এসে পড়লে তোর যাওয়া অসম্ভব হবে।"

বিরক্ত বোধ করলাম এই প্রস্তাবে, কারণ জ্বর আছে, দেহ অত্যন্ত দুর্বল, এ অবস্থায় এখন যাওয়া অসম্ভব, আর যাবই বা কোথায় এই অন্ধকারে, এবং কেন যাব?"

"কিছু চিন্তা নেই, তুই মরে গেলেও তোকে আমরা এখান থেকে নিয়ে যাব, ডাকাতদের হাতে তোকে পড়তে দেব না, আর আজই যদি দাঁত তোলা হয়, তা হ'লে তোকে আর বাঁচাতে পারব না।"

এর পর ওরা আমার কোনো কথা বা মতামতের অপেক্ষা না ক'রে আমাকে চ্যাংদোলা ক'রে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। আমার প্রতি বিবেচনাবশত, এবং আমাকে হাঁটতে দেবে না বলেই ওরা এক সঙ্গে তিনজন এসেছে, বলল। এর পর আর আমার রাগ করা শোভা পায় না, নিজের অবস্থা স্মরণ ক'রে বরঞ্চ কৌতুক অনুভব করতে লাগলাম। মনে মনে সান্ত্বনা পেলাম এই ভেবে যে, খাটিয়ায় শুয়ে লোকের ঘাড়ে উঠে যাওয়ার চেয়ে এটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

সূর্যোদয়ের অনেক দেরি তখনও, ঘাড়ে উঠে হিমেল বাতাসে চলতে বেশ আরাম বোধ হচ্ছিল। কিন্তু সে আরাম মিনিট তিনেকের বেশি স্থায়ী হল না। এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল পথের মাঝখানে। নির্জন পথের ক্ষীণ আলোয় কর্কশ কণ্ঠে কে হাঁকল—

"কে যায়?"

রাজপথে এ প্রশ্ন করবার অধিকার একমাত্র পুলিসের। কিন্তু চেয়ে দেখলাম পুলিস নয়, একদল গুণ্ডা।

তারক, যতীন ও শশাঙ্ক কেউ কোনো কথা বলল না।

গুণ্ডারা এগিয়ে এসে বলল, "তারক। জানি সব, কিন্তু এখনো বলছি ক্ষান্ত হও।"

কণ্ঠস্বর রবির।

সংঘর্ষ আসন্ন বুঝে তিনজনে আমাকে তাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে পথের পাশে দাঁড় করিয়ে দিল।

রবি আদেশ দিল "একে নিয়ে যেতে পাবে না।"

তারক বলল, "হুকুম না কি ?"

"হাঁ, হুকুম।"

শশাঙ্ক বলল, "বটে।"

ইতিমধ্যে তারক, শশাঙ্ক, যতীন—তিনজনেই আস্তিন গুটিয়ে ফেলল।

রবিও আস্তিন গোটাল, এবং ওরা পরস্পর হিংস্র ভাষায় পরস্পরকে গাল দিয়ে নিজেদের উত্তেজিত করতে লাগল।

তারক বলল, "দাঁত তোলে কোন্ শালা।"

রবি বলল, "দাঁত তোলা ঠেকায় কোন্ শালা।"

তারক বলল "বটে।'

রবি বলল "মরদ কি বাৎ।"

রবির সঙ্গে ছিল আরও চারজন, তারা সবাই আমার পরিচিত। ওদের হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে গেল তড়িৎগতিতে।

আমি তখন দাঁত সম্পূর্ণ ভুলেছি। মনে হল যেন আমার কোনো অসুখই হয়নি। ছুটে চলে এলাম বাড়িতে এবং এসেই শুয়ে পড়লাম।

এতক্ষণের রুদ্ধ ব্যথা এইবার মাড়ির গুহা থেকে প্রবল স্রোতের মতো বেরিয়ে এসে আমাকে পাগল করে তুলল—আমি শুয়ে, বসে, পাইচারি ক'রে ঘণ্টা তিন চার কাটিয়ে কাছাকাছি এক দাঁত তোলা চীনা মিস্ত্রীর ঘরে ঢুকে পড়লাম।

তারপর যুধ্যমান বন্ধুদের কিছুদিন আর খোঁজ নেই। হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম ওরা প্রায় সবাই হাসপাতালে গিয়েছিল, এবং তারককে কয়েকদিন হাসপাতালেই থাকতে হয়েছিল। দুঃখের বিষয় থানা পর্যন্ত কাউকে যেতে হয়নি।

দিন দশেক পরে তারক এলো আমার কাছে। সে দুটি দাঁত হারিয়েছে রবির হাতে। তবু তার গর্ব এই যে নিজের দুটি সুস্থ দাঁতের বিনিময়েও সে আমার একটি দাঁতকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

এখনও সে সেকথা সুযোগ পেলেই সবাইকে খুব গর্বের সঙ্গে বলে বেড়ায়।

কিন্তু আমি তার সম্মুখে আর মুখ খুলতে পারি না, যদি দেখে ফেলে।

(১৯৪৬)

অমরত্বের পঁয়তাল্লিশ বৎসর

ব্রহ্মা তাঁর স্বর্গীয় আসনে ধ্যানমগ্ন। পাশে নারদ মধুর স্বরে বীণা বাজিয়ে চলেছেন। এমন সময় তাঁর শুভ্র শ্মশ্রু হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল।

নারদের চোখ ও মন বীণায় আবদ্ধ ছিল, তিনি চমকিত হয়ে বুঝতে পারলেন ব্রহ্মা তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। আজ বুঝতে পারলেন, কিন্তু তাঁর দাড়ি পাকার পর প্রথম যেদিন ব্রহ্মা সে দিকে তাকান সেদিন বুঝতে পারেন নি। সেদিন তাঁর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়েছিল। তিনি হঠাৎ দাড়িতে আগুন ধরে গেছে মনে করে চিৎকার ক'রে উঠেছিলেন, আর তা দেখে ব্রহ্মার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছিল। সেই থেকে নারদকে মাঝে মাঝে স্বর্গ ছেড়ে বাংলাদেশে এসে থাকতে হয়, এটি তাঁর পক্ষে এক প্রকার শাস্তি।

নারদ ব্রহ্মার দৃষ্টিপাতের অর্থ বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, পিতঃ, আমি এখনই চললাম বাংলাদেশে। সেখানে চিত্রগুপ্ত কিছুদিন আগেই গিয়েছেন, সুতরাং এ বারের বাংলা বাস আমার পক্ষে খুব কষ্টকর না হতে পারে।

এ ঘটনাটি পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বেকার। (অবশ্য এটি পার্থিব পঁয়তাল্লিশ বৎসর)। তার আগে তিনি যখন বাংলাদেশে আসেন সে প্রায় দু শ' বছর হয়ে গেল, সুতরাং এ বারে বাংলাদেশের রূপ তাঁর কাছে একেবারে নতুন, বিশেষ ক'রে কলকাতা শহরের। এ শহরই তখন ছিল না।

চিত্রগুপ্তই তাঁকে শহরের ইতিহাসটি মোটামুটি শুনিয়ে দিলেন, এমন কি কিপলিং-এর কবিতার কয়েকটি ছত্রও আবৃত্তি করলেন নারদের কাছে—

Chance directed chance erected, laid and built
On the silt.
Palace, byre, hovel, poverty and pride
Side by side...

চিত্রগুপ্ত আরও বললেন, আজ এই দেশে আর এক ইতিহাস রচিত হতে চলেছে। বাঙালী জাতির মধ্যে তিনি এমন একটি প্রাণের সাড়া দেখতে পেয়েছেন যাতে তাঁর আশা হয়েছে বাঙালী ইংরেজের অধীন হয়ে বেশি দিন আর থাকবে না।

নারদ বললেন, কি রকম সাড়া দেখলে? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

চিত্রগুপ্ত বললেন, আপনাকে সব দেখাব।

নারদকে তিনি নিয়ে এলেন শহরের এক অংশে। তখন গভীর রাত্রি। দুজনে চুপে চুপে একটি বাড়িতে গিয়ে দেখেন কিসের এক গোপন সভা বসেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই নারদ বুঝতে পারলেন এটি একটি বিশেষ ষড়যন্ত্র সভা। অনেক যুবক এসে এক সঙ্গে মিলেছে। তাদের মুখে দৃঢ়তার ছাপ, চোখে ব্যাকুলতা। তারা চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আর চুপে চুপে আলাপ করছে। পরামর্শের বিষয়টি শুনে নারদ বিস্মিত হলেন। আপাত-দৃষ্টিতে যারা ক্ষীণাঙ্গ তরুণ যুবক মাত্র, তারা নাকি দুর্ধর্ষ ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াবে। সেই উদ্দেশ্যেই কাকে কি করতে হবে তা ঠিক করছে। দেশময় একটা ত্রাসের সৃষ্টি করছে তারা, ইংরেজকে তারা এদেশে থাকতে দেবে না, যদি এর জন্য প্রাণ দিতে হয় দেবে, কিন্তু ছাড়বে না।

চিত্রগুপ্ত নারদকে আর এক পাশে নিয়ে গেলেন। দেখলেন সেখানে কয়েকজন যুবক নিবিষ্টমনে বোমা তৈরি করছে।

নারদ বললেন, এই কয়েকজন ছোকরার এত সাহস ?

চিত্রগুপ্ত বললেন, শুধু এরা ক'জন নয়, সমস্ত বাংলাদেশ আছে এদের পিছনে। তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ, সবাই। তবে তরুণ ও যুবকদের মধ্যেই উৎসাহ অতি প্রবল। তারাই প্রধান কর্মী, তাদের মনে স্বপ্ন।

স্বপ্ন ? কিসের স্বপ্ন ?

দেশের দুঃখ ঘোচাবে, দেশকে স্বাধীন করবে এই স্বপ্ন।

নারদ চিত্রগুপ্তের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বাঙালীর প্রতি চিত্রগুপ্তের এই অহেতুক প্রীতি কেন ? মনটা ওঁর বড়ই দুর্বল মনে হচ্ছে যেন। কিন্তু সন্দেহকে আমল না দিয়ে বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার।—তিনি শুধু এই কথাটি সংক্ষেপে উচ্চারণ করলেন। তিনি নিজের অনুমানের ভুল বুঝতে পারলেন ধীরে ধীরে।

ক্রমে দিন যায়, ক্রমে তাঁরা দেখতে পান, বাইরে তাদের যে একটা শান্তভাব ছিল তা দ্রুত দূর হয়ে যাচ্ছে। তারা ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠছে।

এক দিন সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন দিকে দিকে বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে। যত বিদেশী কাপড় সংগ্রহ ক'রে ছেলেরা তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, বিদেশী কাপড় আর তারা পরবে না। সবাই দেশী কাপড়ের মাহাত্ম্যে গান ধরেছে—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।"

তারপর দেখলেন, কবি এসেছে আগুনের বাণী নিয়ে, সাংবাদিকের কলম

চলছে নির্ভীক ভাবে, কর্মীরা অক্লান্তভাবে স্বদেশী প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাসবাদীরা গোপন অস্ত্রে শাণ দিচ্ছে, ইংরেজ মারা পড়ছে এখানে সেখানে। বালকেরা হাসিমুখে ফাঁসিতে ঝুলছে দেশ-মায়ের কল্যাণে।

নারদ মুগ্ধ হন, কিন্তু চিত্রগুপ্তের উপর তাঁর সন্দেহ বাড়তে থাকে। তবু মনের ভাব গোপন ক'রে বলেন, কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে পারবে এই সব ছেলেরা?

চিত্রগুপ্ত তাঁকে শুধু বললেন, দেখে যান সব। এর মধ্যেকার আসল কথাটা হচ্ছে, এরা জেগেছে। অপমানের আঘাতে জেগেছে। এরা দেহের শক্তিতে হয় তো দুর্বল, কিন্তু মনের শক্তিতে এরা অজেয়। আরও বড় কথা হচ্ছে, এরা একটা মহৎ আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছে। এই যে লক্ষ্য ধরে চলেছে এরা, এই চলাটাই আজ বড় কথা। এর মধ্যে অনেক ছেলেমি আছে, অনেক ভুলই এরা করছে, কিন্তু তা হোক, ভুলের ভিতর দিয়ে না গেলে সত্য শিক্ষা হয় না।

নারদ বললেন, অর্থাৎ আগুনে পুড়ে পুড়ে ওরা খাঁটি সোনা হচ্ছে।

চিত্রগুপ্ত বললেন, ঠিক তাই। এরা অনেকেই মারা পড়বে, আর কি দুঃখ যে এরা সহ্য করবে, কিন্তু তবু খুব আনন্দ হচ্ছে এদের দেখে।

নারদ বললেন, মৃত্যুর হিসাব নিয়ে ব্যস্ত তুমি, মৃত্যুর কথায় খুশি হওয়াই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক।

চিত্রগুপ্ত বললেন, ঠিক তার উল্টো। মানে, মৃত্যু নিয়ে কারবার বলেই এই জীবনের দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।

নারদের সহানুভূতি জাগে চিত্রগুপ্তের প্রতি। এতক্ষণে বুঝতে পারেন তাঁর অন্য কোনও মতলব নেই, জীবনের দৃশ্যে সত্যই তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। নারদ নিজেও মুগ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

এমন সময় একদল ছেলে হৈ হৈ করতে করতে এক বোঝা বিলিতি কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিল ঠিক তাঁদের পাশেই। নারদ চমকে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন।

চিত্রগুপ্ত বললেন, অদৃশ্য হয়ে না থাকলে আপনার কি বিপদই না হত এ সময়।

কেন?

আপনার সুদীর্ঘ দাড়িকে বিলিতি সুতো মনে ক'রে হয় তো তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। ওরা যে রকম মরীয়া হয়ে উঠেছে তাতে ওদের এখন আর কাণ্ডজ্ঞান নেই।

নারদ এ কথার উত্তর দিলেন না, তিনি কেমন যেন উদাসীন হয়ে পড়তে লাগলেন।

চিত্রগুপ্ত বললেন, বাংলা দেশের এই নবজীবনের দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারব না। জীবন যেখানে সত্যিই জেগেছে সেখানে তো মৃত্যু নেই, বাঙালী জাতিও মরবে না, কেননা এদের জীবন জেগেছে। এরা গুলির মুখে প্রাণ দিয়ে নতুন প্রাণ পাবে, ফাঁসিতে ঝুলে অমর প্রাণ ছড়িয়ে যাবে সকল দেশে।

নারদের মনের উপর চিত্রগুপ্তের ভাষার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল, দু'জনেই আত্মবিস্মৃত হয়ে চেয়ে রইলেন জনতার দিকে। দেখতে লাগলেন স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত বিচারালয়ের ব্যবহারাজীব রাজদ্রোহীকে মুক্ত করতে ছুটে চলেছে, বাগ্মীরা হাজার হাজার উৎসাহী শ্রোতার কানে স্বদেশপ্রেমের সুধাবর্ষণ করছে, ব্যবসায়ীরা দোকানে দোকানে স্বদেশী পণ্যের পসরা সাজাচ্ছে। দিকে দিকে কি চাঞ্চল্য, কি উত্তেজনা!

চিত্রগুপ্ত হঠাৎ লক্ষ্য করলেন নারদ কখন সেখান থেকে সরে গিয়ে বীণাটি পাশে নিয়ে বসেছেন। তাঁর অঙ্গুলি চঞ্চল হয়ে উঠল। সহসা তাঁর হাতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল এক অপূর্ব সঙ্গীত।

ঝঙ্কার ধাপে ধাপে চড়তে লাগল। বিশ্বসঙ্গীতের মর্ম যেন ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হতে লাগল তর্জনীর আঘাতে আঘাতে। যেন কোন্ অনাদিকালের সৃষ্টির ব্যাকুলতা বেজে উঠল সেই সুরে। সে সুর হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে চলল, সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল।

চিত্রগুপ্ত মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন, তারপর কখন্ চমকিত হয়ে উপলব্ধি করলেন সুর নেমে এসেছে পৃথিবীর সীমানায়। লয় আরও দ্রুত হয়েছে। তাতে ধ্বনিত হচ্ছে নবজীবনের গান। যে জীবনধারা তৃণে তৃণে, পল্লবে পল্লবে, ফুলে ফুলে, অযুত নিযুত কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, এই সুর সেই জীবনের সুরের সঙ্গে ঐকতান ধ্বনিত ক'রে তুলছে।

বহুক্ষণ পরে চিত্রগুপ্তের খেয়াল হল, তিনি কর্তব্য ভুলে একটা রোমান্টিক ভাবাবেশে বিগলিত হয়েছেন। বড়ই অন্যায়। সবাই যেন ষড়যন্ত্র করেছে তাঁর বিরুদ্ধে। সবাই তাঁকে শুধু জীবনের সঙ্গেই মুখোমুখী পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এই ভাবালুতা ভাল নয়। এর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে স্বর্গে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নারদের পক্ষে যা অসঙ্গত নয়, তাঁর পক্ষে তা অবশ্যই অসঙ্গত। না, এ রকম চলবে না। নারদ স্বর্গের স্বাদহীন দেশে জীবনের এমন জয়যাত্রা কখনো দেখেন নি, নারদ জীবনের গান নিয়ে থাকুন, তিনি কেন থাকবেন?

অর্থাৎ উল্টে চিত্রগুপ্ত এবারে নারদকে সন্দেহ করতে লাগলেন। নারদ বৃদ্ধ কিনা তাই মনটা বড়ই দুর্বল। কি ক'রে তাঁকে বাঁচানো যায় এই দুর্বলতা থেকে? তিনি নারদকে ডেকে বললেন, ছাড়ুন এসব। আমি যেমন কর্তব্য ভুলে একটা মুভমেণ্টের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলাম, আপনিও এখন তাই করছেন। আমরা দু'জনেই অপরাধী হচ্ছি এতে। বাস্তব কর্তব্য থেকে পালিয়ে মুক্তি খুঁজছি একটা তরল ভাবের মধ্যে। একেবারে রোমাণ্টিক হয়ে পড়ছি যে! উঠুন, চলুন, পালিয়ে যাই এই মোহের সীমানা থেকে। এই পার্থিব গজদন্ত মিনারে বসে এভাবে স্বর্গকে ভুলে থাকলে তো চলবে না। আমরা এস্‌কেপিস্ট হব না, উঠুন।—কিন্তু কে কার কথা শোনে? নারদ বধির হয়ে পড়েছেন—বধির বেটোফেনের মতো শুধু বাজিয়ে চলেছেন।

চিত্রগুপ্ত তাঁকে আর কিছু না বলে অগত্যা সেখান থেকে সরে গেলেন। সরে গিয়ে বাংলাদেশ ঘুরে নিজের অবহেলিত কর্তব্য শেষ করলেন, এবং ক'দিন পরে মন থেকে সব ভাবাবেশ ঝেড়ে ফেলে ফিরে এলেন নারদের কাছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! নারদ ঠিক একই ভাবে বীণা বাজিয়ে চলেছেন, কোনও দিকে কোনো চেতনা নেই, তাঁর যন্ত্রে শুধু ধ্বনিত হচ্ছে আনন্দম্। বিশ্বচরাচরে আর কিছু নেই—শুধু আনন্দম্।

না না, এ মোহে তিনি আর পড়বেন না। তিনি এ দৃশ্যে আর বিগলিত হবেন না। জগতে মৃত্যুই সত্য—আর কিছু সত্য নয়।

তিনি নারদকে তদ্গত অবস্থায় ফেলে স্বর্গে ফিরে গেলেন, এবং পিতা ব্রহ্মাকে সব নিবেদন করলেন। নারদের ভাবান্তরের কথা শুনে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মনে হয়?

চিত্রগুপ্ত বললেন, মনে হয় বাঙালী জাতি তার জাতীয় জীবনে যে বিরাট নাটকের অভিনয় করতে চলেছে নারদ তার আবহ সঙ্গীত রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন।

ব্রহ্মা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, নারদকে আর বাংলাদেশে পাঠাব না।

এর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ বৎসর কেটে গেছে বাংলাদেশে। স্বর্গের সেটি একটি নিশ্বাসমাত্র। চিত্রগুপ্ত আবার ফিরে এসেছেন কলকাতা শহরে। নারদকে খুঁজে বের করতে তাঁর দেরি হয় নি, কারণ তিনি এখনও ঠিক একই জায়গায় পড়ে আছেন। পড়েই আছেন প্রকৃতপক্ষে। তাঁর বীণার তার ছিঁড়ে গেছে, তিনি সেই ছিন্ন-তার বীণার উপর মূর্ছিত হয়ে শুয়ে আছেন।

কি হল নারদের ? কি দুর্ঘটনা ঘটল হঠাৎ ? নারদের বীণার তার তো সহজে ছিন্ন হবার নয়। চিত্রগুপ্ত চার দিকে চেয়ে দেখলেন। ইতিপূর্বে তিনি বাঙালীর মধ্যে যে বিরাট জাগরণের আভাস, যে কর্মচাঞ্চল্য, যে দুর্জ্জয় শক্তি, যে একতাবদ্ধ কর্মপ্রেরণা, যে ভাবোন্মাদনা দেখে গিয়েছিলেন তা যেন এত দিনে একটা বিপুল শক্তিলাভ ক'রে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো আকাশে মাথা তুলে মহৎ উল্লাসে ভেঙে পড়ছে। যে বিপুল শক্তির প্রথম স্পন্দন তিনি দেখে গিয়েছিলেন তা আজ যেন পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে। যে চাঞ্চল্য ইতিপূর্বে তিনি তরুণদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা আজ যুবক বৃদ্ধ সবার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, এমন কি বয়স্করাই যেন বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গতি ছন্দপূর্ণ হয়েছে, তাতে দ্বিধা নেই, জড়তা নেই। চিত্রগুপ্ত খুশি হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হল এমনি হওয়াই তো স্বাভাবিক। বাষ্পচালিত শকটশ্রেণীকে যখন ইঞ্জিন প্রথম টানতে যায়, তখন কত ফোঁস ফোঁস গর্জন, কত হাঁসফাঁস, কত ঘর্ঘর, ঝন্ ঝন্, এলোমেলো শব্দ, চাকায় টান পড়ে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঘুরতে চায় না; প্রথমে চলার আভাস ফোটে, স্পন্দন জাগে, গতি জাগে না, তার পর চাকা যখন একবার ঘুরে যায় তখন সেই চাকা ক্রমে গতিলাভ করতে থাকে, ইঞ্জিনের গর্জন থেমে যায়, চাকার শব্দে সুর লাগে, সকল দ্বিধা দূর হয়ে যায়, শকট চলতে থাকে সহজ ছন্দে।

চিত্রগুপ্ত পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে স্বস্তির আনন্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। নারদের মূর্ছিত অবস্থা দেখে প্রথমেই তাঁর যে ভয় হয়েছিল সে ভয় দূর হল, এবং তাঁর স্পষ্টই বোধ হল স্বর্গের মধুর সঙ্গীতে অভ্যস্ত নারদ সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে পারেন নি, শক্তির সঙ্গে মাধুর্য সমান্তরাল চলতে পারে নি, তারে বিষম টান পড়েছে, তাই তার ছিঁড়ে গেছে, তাই দুঃখে বেদনায় নারদ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। অতএব আশঙ্কার বিশেষ কোনো কারণ নেই। এখন ওঁকে জাগিয়ে সান্ত্বনা দিলেই ওঁর মনটা ভাল হয়ে যাবে, আর কিছুই করতে হবে না।

চিত্রগুপ্ত নারদের কাছে এগিয়ে গেলেন, এবং নারদও ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ মেলে উঠে বসলেন। প্রথম জেগে হঠাৎ সব ধাঁধার মতো লাগল তাঁর। ক্রমে পূর্ণ চেতনা ফিরে এলো, চোখ দুটি উজ্জ্বল হল এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে চিত্রগুপ্তকে পেয়ে আনন্দে তাঁকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। অবস্থাটা চিত্রগুপ্তের পক্ষে খুব সুখের হল না, কারণ নারদের মুখে শ্মশ্রুর অরণ্য, তার মধ্যে চিত্রগুপ্তের মাথাটি হারিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে তিনি বেশ কিছুক্ষণ হাঁচতে লাগলেন।

নারদ হো হো ক'রে হেসে উঠলেন—চিত্রগুপ্তের দুর্দশা দেখেই হয়তো।

চিত্রগুপ্ত বললেন, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, বেয়াদপি মাফ করবেন, কিন্তু বীণার ব্যর্থতা আপনার নিজের যে ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিচ্ছে, তা সত্তেও আপনি হাসছেন কি ক'রে ?

নারদ বললেন, একটা দুঃস্বপ্ন দেখার পর হঠাৎ যদি জেগে দেখি ওটা নিতান্তই স্বপ্ন, তা হ'লে কি আনন্দ হয় না ? প্রথমে যখন তার ছিঁড়ে বীণা স্তব্ধ হয়ে গেল, তখন মনে হয়েছিল ওটা আমার হৃদয়ের তার, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, তার ছেঁড়ায় আমার কোনো অপরাধ নেই, হৃদয়ের সঙ্গেও ও-তারের কোনো যোগ নেই।

চিত্রগুপ্ত বললেন, আমি অনুমান করি জীবনের সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে আপনার কষ্ট হয়েছে।

নারদ হেসে বললেন, জীবনের সুর কাকে বলছ ?

চিত্রগুপ্ত বিস্মিত হয়ে জনতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, বললেন ঐ যে একদল লোক চলেছে প্রৌঢ় বয়সের, গায়ে মোটা কাপড জামা, ঠিক যে মোটা কাপড়ের গান এক দিন ওরা গেয়েছিল, সেই গানের কথা আজ রূপ ধরেছে ওদের দেহে। দেশে আজ নিশ্চয় ওদের সম্মানীয় আসন। এখানে তরুণদের মধ্যে সেবারে যে উৎসাহ দেখেছিলাম, সেই উৎসাহ দেখছি ওদের মধ্যে। ওরাই হয়তো আগেকার সেই তরুণের দল। আজ ওদের স্বপ্ন সফল হয়েছে, ওরা দেশকে গডে তোলার জন্য হয় তো আরও বড রকমের আত্মত্যাগ করতে চলেছে। বাঙালীকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে চলেছে। দেশের দুঃখ-দৈন্য ঘুচিয়ে জনসাধারণকে টেনে তুলতে চলেছে উপরের ধাপে—

নারদ বাধা দিয়ে বললেন, এর আগে তুমি আমাকে এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে, আজ আমি তোমাকে এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ওরা দেশকে বড করতে যাচ্ছে না, ঐ লোকগুলো পারমিট সংগ্রহ করতে যাচ্ছে, কেউ বা ইস্পাতের, কেউ বা সিমেন্টের—

কেন ?

ওর সাহায্যে ব্যবসা ক'রে বড় হবে। দেশের জন্য ওদের বিশেষ ভাবনা নেই। দেশের জন্য এককালে ওরা কেউ বা জেল খেটেছে, কেউ বা শোভা-যাত্রায় যোগ দিয়েছে, তার দাম আজ ওরা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে চলেছে।

চিত্রগুপ্তর মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। তবে কি এই দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন ? এই দেখে নিজে প্রায় বাঙালী হয়ে পড়েছিলেন ?

নিজের নির্বুদ্ধিতা স্মরণ ক'রে তাঁর আরও বেশি লজ্জা হতে লাগল। কিন্তু নারদের কথাই যে অভ্রান্ত তার প্রমাণ কি ? না-ও তো হতে পারে। তিনি

যেন একটু উত্তেজিত ভাবেই বললেন, না না, আপনি ভুল করছেন—ঐ দেখুন দলে দলে মেয়েরাও বেরিয়ে এসেছে পথে। আগে তো এ রকম কখনও দেখি নি, খুব মহৎ কোনো লক্ষ্য না হলে এ রকম হতেই পারে না—

নারদ বললেন, ওরা সিনেমা দেখতে চলেছে।

চিত্রগুপ্ত বসে পড়লেন একথা শুনে।

নারদ বললেন, বীণার তার কেন ছিঁড়েছে এবারে আশা করি বুঝতে পেরেছ।

চিত্রগুপ্তের কানে সে কথা গেল না। কারণ তাঁর মনে হল এবারে তিনি আর ভুল দেখছেন না। ভুল দেখলে যে নিজের নির্বুদ্ধিতা দ্বিতীয় বার প্রমাণিত হয়ে যাবে। তিনি সত্য দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন—এবারে দলে দলে তরুণেরা বেরিয়ে এসেছে পথে, তাদের মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। তাদের এই উল্লাস এবং উৎসাহ পূর্বেকার তরুণদের উল্লাস ও উৎসাহকে স্মরণ করিয়ে দিল। চিত্রগুপ্তের চোখ মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে।

নারদ ততক্ষণে তাঁর বীণাটি তুলে নিয়েছেন। তিনি ঐ বীণার সাহায্যেই চিত্রগুপ্তের স্বপ্ন ভেঙে দিলেন পাঁজরে এক গুঁতো মেরে। বললেন, কি দেখছ?

দেখছি এরা অন্তত কোনো বড় লক্ষ্য ধরে চলেছে। তাই নয় কি। এদের এই সম্মিলিত শক্তি এই জাতির সম্মুখে কি কোনো আশার বাণী শোনাবে না?

নারদ মৃদু হেসে বললেন, না, চিত্রগুপ্ত, না। ওরা শোনাবে বোমার আওয়াজ—

জাতির সম্মুখে কোনো আদর্শ?

জাতির সম্মুখে মেয়ে সেজে টাকে নাচ দেখাবে—ভারী মজার সব নাচ। এর জন্য এরা অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে অর্ধাহারী লোকদের কাছ থেকে বহু টাকা চাঁদা আদায় করেছে। ওদের যে আজ বিদ্যাদেবী সরস্বতী বিসর্জনের দিন।

চিত্রগুপ্ত উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, যাক, বাঁচা গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তিত হলেন—কারণ এর পর একটা জাতির সর্বজনীন মৃত্যুর হিসাব লিখতে এই দুর্মূল্যের বাজারে আবার নতুন ক'রে খাতা বাঁধাতে হবে যে!

ইতিমধ্যে নারদ বীণার ছেঁড়া তারটি দ্রুত মেরামত ক'রে নিয়ে চিত্রগুপ্তের কানের কাছে শ্মশান-সঙ্গীত বাজাতে লাগলেন। চিত্রগুপ্ত পুনরায় ভগ্নমোহ অবস্থায় লাফিয়ে উঠে চিৎকার ক'রে বলতে লাগলেন—মরণমেব জয়তে।

(১৯৫০)

সর্বানন্দ পরিবারের কথা

সম্ভব অসম্ভব নানা রকম সংবাদ আমদানি ক'রে পাঁচকড়ি আড্ডা জমাতে খুব ওস্তাদ, তার কথা আমরা সব সময়েই উপভোগ করি।

এই খবরটাও পাঁচকড়ির কাছ থেকেই শুনলাম। বাংলা দেশের উত্তর-পূবে হিমালয়ের কোনো একটি খাড়া পাহাড়ের মাথায় নাকি এমন একটি বাঙালী পরিবার বাস করছেন, যাঁদের মধ্যে গত পাঁচ পুরুষ ধরে যত লোক জন্মেছেন তাঁরা সবাই বেঁচে আছেন, তাঁদের প্রত্যেক্যের স্বাস্থ্য ভাল, তাঁরা সবাই কোটি-পতি, অথচ বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। আরও আশ্চর্য এই যে, পরিবারের প্রত্যেকটি স্ত্রী এবং পুরুষ দেখতে প্রায় এক বয়সী এবং তাঁরা সবাই অটুট-যৌবন।

এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা যিনি তার নাম সর্বানন্দ, বয়স চুয়াত্তর বছর। তাঁর পিতা ঈশ্বরানন্দ এবং পিতামহ বরাদানন্দ, তাঁরাও এই পরিবারভুক্ত। সর্বানন্দের পুত্র এবং পৌত্র অগণিত, পুত্রী এবং পৌত্রীও অনেক।

বিরাট পরিবার, এঁদের কারও কখনও নাকি অসুখ করে না, এঁদের মৃত্যু নেই, এঁদের কোনো দিকেই কোনো অভাব নেই, দুঃখ নেই। এঁদের অর্থের, স্বাস্থ্যের এবং মানসিক শান্তির প্রাচুর্য অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, এবং অদৃষ্টপূর্ব। তাঁরা কৌতূহলী দর্শকের হাত থেকে বাঁচার জন্য এক খাড়া পাহাড়ের মাথায় আশ্রয় নিয়েছেন, সাধারণ লোকের পক্ষে সর্বদা সেখানে যাওয়া সুসাধ্য নয়।

পাঁচকড়ির অন্যান্য কথার মতো এ কথাটাও হেসে উড়িয়ে দিতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না।

পাঁচকড়ি উত্তেজিতভাবে বলল, তোমরা অপদার্থ, অভাগা এবং নাস্তিক। যে ঘটনা পৃথিবীর লোকে জানে, রয়টার যা প্রচার করেছে, তা জান না বলে তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু লজ্জা পাওয়া দূরের কথা, বিশ্বাসই করছ না! তোমাদের মরা উচিত।

বীরু আমাদের মুখপাত্র, সে বলল, বহু জিনিসই আমাদের উচিত অথচ তার একটাও না ক'রে দিন তো এক রকম সুখেই কেটে যাচ্ছে, অতএব তোমার ঐ পাঁচপুরুষী পরিবারটার অস্তিত্ব যদি অস্বীকারই করি তা হলেও সুখেই থাকব। ওটা ছেড়ে আর কি বলবার আছে বল।

পাঁচকড়ি ক্ষেপে গিয়ে যা-তা বলে আমাদের গাল দিতে আরম্ভ করল।

শেষে একখানা কাগজ বের ক'রে বীরুর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ।

পড়ে দেখলাম, সদ্য প্রকাশিত বিশেষ সংস্করণ খবরের কাগজ, এবং পাঁচকড়ি যে খবরের বাহক হয়ে এসেছে সেই খবর তাতে ছাপা আছে। স্তম্ভিত হলাম, কেননা এই খবরটার জন্যই বিকেলে বিশেষ সংস্করণটি বেরিয়েছে।

উচ্চ পাহাড়ের উপর অভাবনীয় আবিষ্কার! ঘটনাক্রমে এক ব্রিটিশ বিমান সেখানে নামতে বাধ্য হয়, ফলে এই অদ্ভুত বাঙালী পরিবারের কথা পৃথিবীর লোকে জানতে পেরেছে এবং এমনও শোনা যাচ্ছে এই যুদ্ধের নানা অসুবিধা উপেক্ষা ক'রেও অ্যামেরিকা এবং ব্রিটেনের সাংবাদিক এবং বৈজ্ঞানিক দল বিমানযোগে সেখানে আসতে উদ্যত হয়েছেন।

পাঁচকড়ির কাছে ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা চাইলাম।

পাঁচকড়ি বলল, নাও নাও, আর ইয়ার্কি করতে হবে না, এখন আসল যা করবার তাই কর। চল, আর কালবিলম্ব না ক'রে আজই সেখানে রওনা হয়ে যাই। এ কথায় সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। সবাই মানে বীরু, তারক, ছানু, পানু আর আমি।

রওনা হয়ে সেখানে পৌছতে কি কি অসুবিধা তা বিশেষভাবে আলোচনা ক'রে এবং তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আমরা পাঁচটি পুরুষ অজ্ঞাত-পরিচয় পাচপুরুষের ইতিহাস সংগ্রহ করতে রওনা হয়ে গেলাম।

কি ক'রে সেই পাহাড়ের নিচে গিয়ে উপস্থিত হলাম তা এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বাঘ ভালুকের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শুধু পাহাড়টিতে চড়তেই আমাদের সাত দিন লেগেছিল।

গিয়ে দেখলাম ঘটনাটা সত্য। পাহাড়ের মাথা সর্বানন্দ পরিবারের কৃপায় একটি স্বর্গীয় উদ্যানে পরিণত। সেখানকার সবাই প্রায় এক বয়সী, সবাই সমান স্বাস্থ্যবান, কেবল কয়েকজন মেয়েকে দেখা গেল, তাদের মুখে ঘাড়ে এবং হাতে লম্বা লম্বা চুল। বাঙালী পরিবার সন্দেহ রইল না, তাঁরা বাংলাতেই কথা বললেন।

আমাদের দেখে তাঁরা যে খুব খুশি হলেন তা নয়, তবে তাড়া ক'রেও এলেন না। সবারই মুখে কেমন যেন একটা উদাসীনতার ভাব।

একজন যুবক প্রশ্ন করলেন, এই দুর্গম পাহাড়ে তোমরা কেন এসেছ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি?

আমাদের মুখপাত্র বীরু বলল, খবরের কাগজে আপনাদের খবর ছাপা

হয়েছে, তাই পড়ে কৌতূহলবশত এসে পড়েছি। দেখতে এলাম সব সত্য কি না।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি সত্য কি না ?

বীরু বলল, পাঁচ পুরুষ ধরে আপনারা বেঁচে আছেন, আপনাদের জরা-মরণ নেই, রোগশোক অভাব-অভিযোগ নেই—এ রকম যে হতে পারে, তাই আমরা জানি না।

তোমরা বোধ হয় নাস্তিক কিংবা মূর্খ, তাই জান না ; এ রকম বেঁচে থাকা আর এ রকম সুখে থাকা সবার পক্ষেই সম্ভব।

কি ক'রে সম্ভব তা জানতে পারলে আমরাও চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। দয়া ক'রে যদি এ বিষয়ে কিছু বলেন! আপনারা এমন সৃষ্টিছাড়া জীবন কি ক'রে পেলেন, তাই জানবার জন্যই এত কষ্ট ক'রে পাহাড়ে উঠেছি।

ভদ্রলোক বললেন, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না, আমার বয়স মাত্র তিন বছর, কিছু বুঝিয়ে বলতে পারব না, চল আমার ঠাকুরদার কাছে তোমাদের নিয়ে যাই।

এক যুবক একটু দূরে একটা কলাগাছ থেকে পাকা কলা পেড়ে পেড়ে খাচ্ছিলেন, আমরা ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গেলাম। ঠাকুরদা কলা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি ?

তিন বছরের পৌত্রটি—যিনি লম্বায় পাঁচ ফুট—বললেন, এঁরা এসেছেন আমাদের সব খবর জানতে। শুনে ঠাকুরদা সর্বানন্দ একটু হাসলেন। এই ঠাকুরদাও যুবক।

বীরু বলল, দয়া ক'রে যদি—

ঠাকুরদা বললেন, বাবার অনুমতি ভিন্ন আমি কিছুই বলতে পারব না, চল তাঁর কাছে নিয়ে যাই। ঠাকুরদার বাবা বসে বসে তামাক টানছিলেন, তিনি নলটি পুত্রের হাতে দিয়ে সব শুনলেন এবং বললেন, বাবার অনুমতি নেওয়া দরকার। সৌভাগ্যক্রমে বাবার বাবা সেইখানেই আসছিলেন, তিনিও যুবক, তাঁর কাছে অনুমতি চাওয়া হল। তিনি সব শুনে তাঁর পৌত্র সর্বানন্দকে সব বলতে অনুমতি দিলেন।

সর্বানন্দ মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বললেন, তোমরা এখানে এসে বিরক্ত করবে ভয়েই এত উঁচুতে বাসা বেঁধেছি, তোমাদের হাত থেকে দেখছি কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই।

বীরু তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে ফস্ ক'রে তাঁর পা জড়িয়ে ধরল, এবং

এমন অভিনয় করল যাতে তাঁর হৃদয় দ্রব হয়। কিন্তু হৃদয় বলে তাঁর কিছুই নেই, যেটুকু ছিল তাও যেন আরও কঠিন হয়ে উঠল। তিনি বললেন ইংরেজরাও চেষ্টা করেছিল কথা বের ক'রে নিতে, কিন্তু পারেনি।

আমরা বললাম, ইংরেজেদের কাছে না বলে ভালই করেছেন। আমরা আপনাদেরই স্বজাতি, বাঙালী, আমাদের কাছে বলুন।

মনে হল আবেদনে কাজ হয়েছে। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সর্বানন্দ বলতে লাগলেন, আজ পঞ্চাশ বছর রয়েছি এইখানে, পরম সুখে, জীবনের উপর আর আকর্ষণ নেই, কেননা আমরা আর মরব না বলে বোধ হচ্ছে।

ভাগ্য যেন অনুকূল হল। বললাম, এ রকম হল কেন ?

সর্বানন্দ বললেন, আরম্ভ যখন করেছি, সবই বলি। ১৮৭০ সনে আমার জন্ম, বাংলা দেশেরই এক গ্রামে। বড় গরিব ছিলাম, স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না, কিন্তু মনে উৎসাহ ছিল খুব বেশি। দারিদ্র্য সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব হল।

ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়লাম গ্রাম ছেড়ে শহরে, কিন্তু শহরেও কিছু সুবিধা হল না; লেখাপড়া ভাল জানতাম না, দেখলাম অল্প বিদ্যায় কিছুই করা যায় না। তারপর নানারকম ঘা খেয়ে মনে বৈরাগ্যের উদয় হল, এবং কয়েক দিনের মধ্যেই এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে জুটে গেলাম। তার পর বহু দুঃখের ভিতর দিয়ে এসে পড়লাম হিমালয়ে। সন্ন্যাসীর জীবন আদৌ ভাল লাগছিল না, কেননা সন্ন্যাসীর মন আমার ছিল না। কি ক'রে কিছু পয়সা উপার্জন করা যায় সেই কথাটিই মাথার মধ্যে ঘুরছিল অনেক দিন, সেই পথই বেছে নিলাম।

এখানে এসে পাহাড়ীদের সাহায্যে চা বাগান তৈরির মতলব এলো মাথায়। দেখলাম বিদেশীরা এই কাজে বেশ সাফল্য লাভ করেছে, কিন্তু ইচ্ছা হলে কি হয়, স্বাস্থ্যও নেই শিক্ষাও নেই; কেবল কৌশল আর চাতুরির সাহায্যে চা বাগান তৈরি করা যায় না। সেজন্য অনেক টাকাও দরকার, টাকাই বা আমার কোথায় ?

তবু সাহস ক'রে কাজ আরম্ভ করলাম, পাহাড়ীদের বুঝিয়ে দিলাম তারাও বড়লোক হবে। সাহেবদের বাগান থেকে দুচারজন কুলিকে ভাগিয়ে আনা গেল, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল দুচার বছরের মধ্যে লাভজনক কিছুই হতে পারে না। কিছুদিনের মধ্যেই ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়তে হল, পাহাড়ীরা আমার উপর বিশ্বাস হারাল। ক্রমে দেখলাম তারা আমাকে মানতে চায় না। তারাই আমাকে এতদিন খাওয়াচ্ছিল, সে দিকেও তাদের মনোযোগ আর

রইল না। তারা ক্রমেই আমার কথা অমান্য করতে লাগল, এবং আমার খাওয়া বন্ধ ক'রে দিল।

আমার স্বাস্থ্য তখন একেবারে ভেঙে পড়েছে, বয়স তখন ত্রিশের কাছাকাছি, কিন্তু দেখতে একেবারে বুড়ো হয়ে পড়েছি। এ রকম অবস্থায় পাহাড়ীদের উপর প্রভুত্ব করা চলে না। তখন নিরুপায় হয়ে তাদের কাছে নিজেকে ছোট করলাম, বললাম তোমরাই প্রভু, আমি তোমাদের গোলাম। এই কৌশলে আমার খাওয়াটা কোনো রকমে চলতে লাগল, কিন্তু স্বাস্থ্যের আর উন্নতি হল না। ক্রমে মৃত্যুর দ্বারে এসে পৌঁছলাম, কাসির সঙ্গে তখন রক্ত পড়তে আরম্ভ করেছে। কি আর করি, হতাশ ভাবে শুয়ে শুয়ে শেষের দিনের অপেক্ষা করতে লাগলাম; কিন্তু শুয়ে শুয়ে সময় আর কাটে না, এক একটা দিনকে এক একটা বছর মনে হয়—সমস্ত রাত ঘুম হয় না।

পাহাড়ীরা পাহাড় থেকে নেমে নিচে যায় সপ্তাহে একবার, সেখানে একবার ক'রে হাট বসে। সেইখান থেকে আটা ছাতু ভুট্টা ইত্যাদি কিনে আনে। একদিন দৈবক্রমে তাদের আনা কোনো একটা মোড়কের এক টুকরো কাগজ আমার হাতে এসে পড়ল। তাতে একটা বিজ্ঞাপন ছিল, সেইটে পড়ে সময় কাটাতে লাগলাম। বড়ই ভাল লাগল। একটা কবচের বিজ্ঞাপন, বশীকরণ কবচের। লেখা আছে, ধারণ করলে যে কোনো লোক বশ হয়। পাহাড়ীদের হাতেপায়ে ধরে একখানা পোস্ট কার্ড সংগ্রহ করলাম। একটা ভাঙা পেন্সিল ছিল আমার, তারই সাহায্যে কবচের অর্ডার পাঠিয়ে দিলাম জলন্ধরে। সামান্য দাম, ভি-পি এলো এবং আমিও কবচ ধারণ করলাম।

হঠাৎ বীরুর মুখ থেকে বেরোল : ফল হল তাতে ?

সর্বানন্দ বললেন, ফল! ধারণের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ দেখি আমাদের পাহাড়ে যত পাহাড়ী ছিল তারা সবাই বুকে হেঁটে আসছে আমার দিকে—সবারই মুখে এক কথা : প্রভু, আমরা আপনার দাস, আদেশ করুন কি করতে হবে। ক্রমে দেখি অন্যান্য পাহাড় থেকেও দলে দলে লোক আসছে, মায় চা বাগানের সাহেব মেমরা পর্যন্ত। আধ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের যাবতীয় লোক আমার ক্রীতদাস হয়ে গেল। আমি যা বলি তারা তাই শোনে। কিন্তু আমার জন্য তারা আর কি করবে, মারাত্মক ব্যাধিতে আমি শয্যাশায়ী। জীবনের প্রতি মমতা ছিল আমার খুবই, কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি কোনো মায়াই যেন আর নেই, যে কটা দিন বাঁচি সেই কটা দিন আরামে কাটাতে পারলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সবাই মিলে আমার জন্য চিকিৎসক নিয়ে এলো,

কিন্তু চিকিৎসক তখন আর কি করবে, কেননা এ ব্যাধির কোনো চিকিৎসাই সে যুগে ছিল না। আমি বললাম, আমার জন্য আর কিছুই করতে হবে না, কেবল খানকত বাংলা বই আর কাগজ কিনে আন কলকাতা থেকে, তাই পড়ব শুয়ে শুয়ে।

বই এলো কলকাতা থেকে, কিন্তু সবই পুরনো সংবাদপত্র আর পঞ্জিকা। ভালই হল, কেননা আমার বিদ্যাতে ওর চেয়ে শক্ত কিছু বোঝার উপায় ছিল না। যারা এনেছে তারাও কিছু না বুঝেই কিনে এনেছে, বোধহয় কোনো জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিল।

যাই হোক, আমার কিন্তু ভাগ্য ফিরল ওতেই। পাঁজির বিজ্ঞাপন পড়তে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল ধনদা কবচের বিজ্ঞাপন। তৎক্ষণাৎ আনিয়ে ধারণ করলাম।

• জিজ্ঞাসা করলাম, ফল পেলেন?

ফল। সাতদিনে লক্ষপতি—পনেরো দিনে কোটিপতি হলাম। শুয়ে আছি, এমন সময় শোনা গেল চারদিকে টুং ঠাং টুং টাং ঝন ঝন শব্দ—চেয়ে দেখি চারদিক থেকে টাকা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। পাহাড় ঠেলে টাকার স্রোত বয়ে আসছে উপরে—কৈ মাছের মতো লাফাতে লাফাতে আসছে। মাথার উপর দিয়ে মেঘ উড়ে যাচ্ছে—এক এক পশলা টাকা ফেলে দিয়ে গেল পাহাড়ের উপর। বিছানার নিচে ছারপোকার মতো টাকা নড়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। আর সে বাজে টাকা নয়, চাঁদির টাকা, ভিক্টোরিয়া রাণীর ছাপ মারা, ঝকঝকে চকচকে সব টাকা। পাহাড়ীরা প্রথমে আনন্দে টাকার মতোই লাফাতে লাগল, কিন্তু দু তিন দিনের মধ্যে তাদেরও টাকায় বিতৃষ্ণা এলো। সে টাকা ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা গেল না, পাহাড়ের চারদিকে গাছের গুঁড়ি একটার পর একটা সাজিয়ে তাদের রোধ করা গেল না, সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে টাকার পাল এসে লুটিয়ে পড়তে লাগল আমার পায়ের কাছে, পোষা বিড়াল ছানার মতো পায়ে এসে তাদের গা ঘষতে লাগল, টাকার পাহাড় জমে গেল পাহাড়ের গায়ে।

আমার সে কি আনন্দ আর উত্তেজনা। সেই উত্তেজনায় শরীর আবার ভেঙে পড়ল। কত চিকিৎসা করানো গেল, বড় বড় ডাক্তার যে যেখানে ছিল সব শেষ হয়ে গেল।

তখন আবার পাঁজির শরণাপন্ন হয়ে উন্মাদের মতো পাতা ওল্টাতে লাগলাম। পেলাম একটা মনের মতো বিজ্ঞাপন। মনে হল এইতে যদি ফল

পাই তো পাব, নইলে আর কোনো আশা নেই। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে তিন ঘণ্টায় যৌবন লাভ।

এক সাহেবকে ধরে টেলিগ্রাম লিখিয়ে নিলাম এবং তাকেই পাঠালাম টেলিগ্রাম করতে। ওষুধ এলো। সে কি সাংঘাতিক ওষুধ! খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহটা ফুটবলের মতো এক ধাক্কা খেয়ে পনেরো হাত শূন্যে উঠে গেল।

বীরু প্রশ্ন করল, আবার ফুটবলের মতোই নিচে পড়লেন?

সর্বানন্দ গম্ভীরভাবে বললেন, না, হাল্কা, ব্যাধিমুক্ত, সর্ব উদ্বেগশূন্য, যৌবনের উন্মাদনায় উচ্ছল এক পরম বিস্ময়কর টেনিস বলের মতো এসে নিচে পড়ে লাফাতে লাগলাম। যৌবনলাভ করতে তিন ঘণ্টা লাগল না, লাগল মাত্র তিন মিনিট। হিমালয়ের ধূলিকণা-বিরল আবহাওয়ার জন্যই বোধহয় দ্রুত কাজ হল।

আমরা সবিস্ময়ে শুনতে লাগলাম এবং মাঝে মাঝে প্রশ্ন ক'রে তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগলাম।

সর্বানন্দ বলতে লাগলেন, এত টাকা, এমন স্বাস্থ্য, আর সবার উপর এমন প্রভুত্ব নিয়ে মন বড় অশান্ত হয়ে উঠল, তখনই ইচ্ছে হল বিয়ে করি। ইচ্ছা হওয়া মাত্র বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কন্যার পিতাকে বশীকরণ কবচের সাহায্যে স্মরণ করলাম। অবশ্য সে জন্য মহাবশীকরণ কবচ আনাতে হয়েছিল, কেননা কন্যার পিতার দূরত্ব ছিল তিন শ মাইল, আর আমার কবচের ক্রিয়া হচ্ছিল মাত্র পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধ জুড়ে। ইতিমধ্যে আমার পিতা এবং পিতামহকে আনিয়ে তাঁদেরও তিন ঘণ্টায় যৌবন বটিকা একটি ক'রে খাইয়ে দিলাম। তাঁরা তৎক্ষণাৎ যৌবন লাভ ক'রে পাহাড়ে সর্বত্র লাফালাফি ক'রে বেড়াতে লাগলেন। অতঃপর তাঁরা দুজনেই এখানকার দুই পাহাড়ী কন্যাকে বিয়ে ক'রে বসেছেন, কারণ আমার মা এবং ঠাকুমা দুজনে পূর্বেই মারা গিয়েছিলেন।

বীরু বলল, অদ্ভুত আপনার কাহিনী।

সর্বানন্দ বললেন, এখনও শেষ হয়নি। এরপর সকল কবচের সেরা কবচ—সকল মাদুলীর শিরোমণি—সর্বসিদ্ধি মাদুলী আনিয়ে ধারণ করলাম। এর গুণ পরীক্ষার জন্য ধারণ ক'রেই ইচ্ছা করলাম এই পাহাড়ে চিরবসন্ত বিরাজ করুক। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের যত কাক এবং অন্যান্য পাখী ছিল তারা সবাই সমস্বরে কুহু কুহু ক'রে ডেকে উঠল—শাল গাছে, কলাগাছে, ধুতুরা গাছে। আমের মুকুল ধরল। সামনে তাকিয়ে দেখ। দেখ, নাম না জানা ফুলও ফুটেছে কত।

দেখলাম সত্যিই তাই, এই অসম্ভব জিনিসটা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি।

সর্বানন্দ বললেন, সর্বসিদ্ধি মাদুলীতে আমার এমন বিশ্বাস জন্মেছে যে এর একটা ধারণ করলে যা ইচ্ছে করা যায়। ধরনা কেন, মেয়েদের মাথায় চুল উঠে যাচ্ছিল, মনে করেছিলাম এই মাদুলী ওদের দেব। কিন্তু ওরা ভুল ক'রে কেশোদ্গম তেল এনে কাল মাথায় মাখতে গিয়ে বিপদে পড়েছে, যেখানে তেল লেগেছে সেই সব জায়গায় চার পাঁচ হাত ক'রে চুল গজিয়ে গেছে। আমি মজাটা দেখছি, দুদিন অসুবিধা ভোগ করুক, তারপর সর্বসিদ্ধি মাদুলী দেব একটা ক'রে।

বীরু জিজ্ঞাসা করল, আপনার পৌত্রের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছে, শুনলাম তাঁর বয়স তিন বছর। এটা কি ক'রে সম্ভব হল?

সর্বানন্দ বললেন, বোঝা উচিত ছিল। 'তিন ঘণ্টায় যৌবন' বটিকা খাইয়েছি সব শিশুদের—একপাল শিশুর উপদ্রবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এখন মহা শান্তিতে আছি। শিশুরা যৌবন লাভ ক'রে অকালপক্ক হয়েছে বটে, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

আমি লক্ষ্য করলাম সর্বানন্দ কবচের এত প্রশংসা করছেন, কিন্তু তাঁর নিজের হাতে বা গলায় কোনো কবচই নেই। এর কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলাম, কবচের এমন গুণ যে একদিন মাত্র ধারণ করলেই তার ফল বরাবর স্থায়ী হয়, কবচ শেষে ফেলে দিলেও তার কাজ চলতে থাকে। এ যেন দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, আগুন জ্বলতে শুরু করলে কাঠিটি আর রাখার দরকার হয় না।

এই চিরবসন্তময় গগনস্পর্শী বাঙালী উপনিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নতুন জ্ঞান, নতুন অভিজ্ঞতা এবং নতুন দৃষ্টি লাভ ক'রে মুগ্ধ হলাম, পাঁচকড়িকেও অজস্র ধন্যবাদ দিলাম। আমাদের বিদায় নেবার সময় উপস্থিত হল। সর্বানন্দ আমাদের রাজকীয় ভোজে পরিতৃপ্ত করালেন। তারপর তাঁর পরিবারের সবাই আমাদের চেহারা, স্বাস্থ্য এবং দুঃখ সহ্য করবার উৎসাহ দেখে সবিদ্রূপ দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমরা যে অতি নির্বোধ সে রকম মন্তব্যও প্রকাশ করলেন কেউ কেউ।

বীরু পকেট থেকে অটোগ্রাফের খাতা বের ক'রে সর্বানন্দের সম্মুখে ধরে বলল, আপনার একটি অটোগ্রাফ দিন, ছানু ক্যামেরা নিয়ে বলল একটি ফোটোগ্রাফও নিচ্ছি। সর্বানন্দ ফোটোগ্রাফে আপত্তি করলেন না, কিন্তু অটোগ্রাফে করলেন। বললেন, লেখাপড়ার মধ্যে আর আমাকে টেনো না,

ওসব প্রায় ভুলেই গিয়েছি। বীরু হতাশ হয়ে বলল, তা হ'লে আশীর্বাদ দিন।

সর্বানন্দ বললেন, তা অবশ্য দেব। আশীর্বাদ করি, তোমরা দেশে ফিরে গিয়ে তোমাদের আধুনিক চিকিৎসা বিত্যার উচ্ছেদে এবং চিকিৎসকদের মুণ্ডপাতে সাফল্যলাভ কর। আধুনিক বিজ্ঞানকেও ধ্বংস কর, আর মাদুলীর মহিমা প্রচার করতে থাক। ওষুধ যদি কিছু খেতেই হয়, একমাত্র দৈবপ্রাপ্ত বা স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত ওষুধ খাবে।

বীরু প্রশ্ন করল, এতে কি আমরা অমর হব?

সর্বানন্দ বললেন, ও ছাড়া অমর হবার আর কোনো পথ নেই। আমাদের দেখেও যদি এ শিক্ষা না পেয়ে থাক তা হ'লে আর কি বলি! যাও আর বিরক্ত ক'রো না, আমার অনেক সময় তোমরা নষ্ট করেছ—বলে তিনি উঠে পড়লেন, আমরাও তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে তৎক্ষণাৎ পাহাড় থেকে নামতে আরম্ভ করলাম।

এর পর কতদিন কেটে গেল, জলন্ধরে টাকা পাঠিয়ে পাঠিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি, কিন্তু কোনো ফল পাইনি। মনে হচ্ছে নিচু জমিতে কোনো ফলই হয় না। আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে, গলায় এবং কোমরে মোট প্রায় পঞ্চাশটি ক'রে মাদুলী আছে, আজই সব ফেলে দেব ভাবছি।

(১৯৪৫)

প্রথম দৃশ্য

বিচারক সভা বসেছে—আমাদের তিনজনের বিচার হবে। খুব বেশি দেরি হবে না মনে হয়, কারণ আজ আমাদের কৃতকর্মের সামান্য একটুখানি অংশ বিচার ক'রেই আমাদের সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত করা হবে এই রকম কথা পেয়েছি।

ব্যাপারটা খুব গুরুতর হয় তো মনে হবে না, এবং খুব যে লঘু তাও নয়, কেননা এর উপরে অন্তত আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আমরা তিনজন কর্মপ্রার্থী—সিনেমা মহলে। তিন জনেই লেখক এবং শুধু তাই নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন লেখক। সেটা অবশ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কারণ সাধারণ লেখক হলে গল্প লিখেই জীবন কাটত, সিনেমা নাট্য অথবা সিনারিও লেখার দুরাশা ঘটত না। এই দুরাশা প্রায় গ্যাম্‌লিংএর পর্যায়ে পড়ে। লেগে গেল তো সাতদিনে বাড়ি এবং গাড়ি।

আমি তিনজনের কথা বলছি বটে কিন্তু আমরা পরস্পর অপরিচিত। আমরা সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে এগিয়ে দৈববশত একসঙ্গে জুটেছি এবং একসঙ্গে অপরাধী শ্রেণীভুক্ত হয়েছি।

ঘটনাটা খুলেই বলি। একটি অপরাধমূলক গল্প সিনেমাকার হাতে পেয়েছেন, সেটিকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করতে হবে এই রকম আয়োজন চলছিল, এমন সময় বহু আবেদনকারী। নিজ নিজ গল্প চালাবার আবেদন) থেকে আমাদের তিন জনকে বেছে নেওয়া হল। সিনেমাকার যে আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন সে কথা বলা বাহুল্য।

তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে গল্পটি মোটামোটি আমাদের কাছে দিন সাতেক আগে বলেছেন।

তিনি চান, আমরা তিনজন পৃথক ভাবে, এর আরম্ভের দৃশ্যটি কি রকম হওয়া উচিত তার একটা সিনেমাসঙ্গত খসড়া তৈরি করে আনি। যারটি তাঁর মতে ভাল হবে তাকেই তিনি সমস্ত গল্পটির সিনারিও লেখার ভার দেবেন। তিনি আরও বলে দিয়েছেন যে তিনি গল্পের নায়ককে ছুরি হাতে প্রথম দৃশ্যে দেখাতে চান।

আমরা সেই অনুসারে সাতদিন পরে সিনেমাকারের কাছে এসেছি। এসে দেখি তিনি একা নন, আরও চার পাঁচ জন কর্তৃপক্ষীয় অথবা বিচারপটু ব্যক্তি

তাঁর পাশে উপবিষ্ট। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল ওঁদের একজন পরিচালক, একজন সহকারী পরিচালক, একজন ক্যামেরাম্যান, একজন তস্য সহকারী, আর একজন শব্দযন্ত্রী। আরও জানা গেল—এঁদের মধ্যেকার দু'তিনজনের রীতিমতো বম্বের অভিজ্ঞতা আছে। আগে কখনও এতগুলো গুণী লোককে একসঙ্গে দেখিনি। দেখে শ্রদ্ধা, বিস্ময় এবং কিছু ভয়ও হল। নিজের ক্ষুদ্রত্ব বড় হয়ে দেখা দিল—পরীক্ষাটা দেখা দিল বিভীষিকারূপে। জীবনে এত বড পরীক্ষাই দিইনি কখনো। বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটাতিনেক পরীক্ষা তো জলীয় ব্যাপার। জীবনের একটা বড় পরীক্ষা বিবাহ, সেটিতেও ভয় পেয়েছি। তা ভিন্ন সিনেমাই আমার ধ্যান এবং সিনেমাতেই জীবনটা কাটাব ভেবে বিয়ে ব্যাপারটা আরও ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল। কিন্তু সে সব কথা থাক। আপাতত বিষম পরীক্ষা সামনে, এতদূর এগিয়ে এ পরীক্ষা আর এড়াবার উপায় নেই।

সিনেমাকার বললেন, তোমার স্ক্রিপটটা পড।

আমি বললাম, না, থাক। কিছুই বিশেষ লিখিনি।

তা হোক, যা লিখেছ তা থেকেই ধারণা হবে।

আমি খাতাখানা খুলে আমার লেখাটা সসঙ্কোচে শোনাতে লাগলাম। সেটি এই: "অস্পষ্ট আলোয় প্রথম দেখা যাবে একখানা ছোরার ছায়া—ক্রমশঃ ছোরাধারীর হাতের ছায়া, তারপর ছোরাসুদ্ধ হাত এবং হাতের মালিক। দ্বিধাজড়িত অথচ দৃঢ় পায়ে, মুখে দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ নিয়ে নায়ক এক পাশ থেকে আর একপাশে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তার চলা দেখে মনে হবে যেন সে অবিলম্বে ভয়ঙ্কর কিছু করতে যাচ্ছে। তার অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতর আলোয় দৃশ্য, হৈ-হৈ, নৃত্যগীত এবং উৎসব।"

বলা বাহুল্য দৃশ্যটি আমি একটি বিদেশী ছবি থেকে চুরি করেছিলাম, কিন্তু এমন নিপুণভাবে—যে ধরবার উপায় ছিল না।

পরিচালক খুব সংক্ষেপে বললেন, চারশ' ফুট হয়ে গেল—অথচ একটি গান নেই, কথা নেই, দর্শক নেবে না।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রার্থী তাঁর লেখাটি শোনালেন: "প্রথমে অন্ধকার। অন্ধকারে অদৃশ্য কণ্ঠে গান: 'ভেবেছিস তুই ভবের হাটে ফাঁকি দিয়ে যাবি বেঁচে'—গান চলতে চলতে ক্রমশঃ আলো ফুটবে। দেখা যাবে নায়ক ছোরা হাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে। ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে, ঐ গানের সাহায্যে তাকে সতর্ক করা হচ্ছে না, তার অদৃশ্য শত্রুকে সতর্ক করা হচ্ছে। সে কথা সে স্বগত বলবে, যাতে দর্শক বুঝতে

পারে। তারপর গানের তালে তালে পা ফেলে সে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে।"

পরিচালক সহকারীর দিকে চাইলেন, সহকারী পরিচালকের দিকে চাইলেন। হঠাৎ পরিচালক বলে উঠলেন—আচ্ছা তৃতীয় স্ক্রিপটখানা শোনা যাক।

তৃতীয় প্রার্থী পড়তে লাগলেন: "দৃশ্য আরম্ভ হতেই দেখা যাবে নায়ক ছোরা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ বড়ই বিষণ্ণ। কি যেন সে বলতে চায় অথচ বলতে পারে না। ভ্রূ কুঁচকে যাচ্ছে—মুখের পেশী কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঠোঁট নড়ছে—অবশেষে কথা ফুটল—

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে
ধন নয় মান নয়, শুধু ভালবাসা
করেছিনু আশা।

আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নায়কের জড়তা কেটে গেল, সে ছোরা ঘোরাতে ঘোরাতে ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে পায়চারী করতে লাগল এবং থেকে থেকে চিৎকার করে বলতে লাগল—'To be or not to be—That's the question।' এমন সময় হঠাৎ অদৃশ্য সঙ্গীত—'মাধবী দ্বিধা কেন?'

গান চলেছে—নায়ক আবার চিৎকার ক'রে বলছে—

'Arise black vengeance, from
the hollow hell!
Yield up O love, thy crown and
hearted throne
To tyrannous hate'......

'মাধব দ্বিধা কেন' গান শেষ হয়েছে। হঠাৎ বজ্র বিদ্যুৎ এবং ঝড় উঠে এলো, নায়ক আবৃত্তি করছে 'দিই লাফ? দেব লাফ?' বলতে বলতে ফেড-আউট।"

শুনতে শুনতে ক্যামেরা-ম্যানের হাত নিশপিশ করছিল, পরিচালকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, অন্যান্য সহকারীরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। পাঠ শেষ হতে না হতে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, ওয়াণ্ডারফুল!

পরিচালক বললেন, দু'নম্বর স্ক্রিপটাও মন্দ নয়, কিন্তু একাক্টিং এমনি একটি

দৃশ্যের অপেক্ষা করছিলাম এতদিন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, বর্তমান কালটা এমন কম্‌প্লেক্স হয়ে পড়েছে যে তোমার ঐ সরল দৃশ্য একেবারে অচল। পাখী সব করে রব—এখন চলে না। এখন দৃশ্য যত জটিল কর, মনে হবে যেন যথেষ্ট জটিল হচ্ছে না। তাই এই তিন নম্বর স্ক্রিপটের লেখককেই আমরা নিচ্ছি। ওপেনিং সীনে যা উনি ঘটিয়েছেন তা চমৎকার—আমরা ওর সঙ্গে দুয়ে একটি শ্মশান দৃশ্য বা ঐ রকম আর কিছু যোগ করে দেব, দেখবেন সাক্‌সেসটা।

আমার আর বলবার কিছু ছিল না। শুধু সংক্ষেপে বললাম, একখানা ফ্রী পাস দেবেন সে সময়।

(১৯৫১)

বাস্তুহারা

একটি শহর এই কাহিনীর রঙ্গস্থল, কিন্তু কোন্ শহর তার পরিচয় নেই, চেনাও যাবে না গল্প পড়ে। তদুপরি এর নায়ক-নায়িকা কোন্ সমাজের তাও লেখককে বার বার বলে দিতে হয়েছে, চেনা যাবে না ভয়ে। সে জন্য পাঠকের মনে হতে পারে কাহিনীটি আমি সিনেমার জন্য রচনা করেছি, কিন্তু আমার নিজের তা উদ্দেশ্য নয়। তবে আমার সন্দেহ নেই যে অনেক সিনেমাকার এটি পড়ে প্রলুব্ধ হতে পারেন। এ গল্পের এইটুকুই মাত্র ভূমিকা। আসল গল্পটি এই :

মস্ত বড় বাড়ি। সে এক বিরাট ব্যাপার। ধারণা করা শক্ত। আগাগোড়া মার্বেলের কাজ। কিন্তু এ বাড়ির সব চেয়ে আকর্ষণীয় এর সিঁড়ি। অতি প্রশস্ত, চারখানা ফোর-সীটার পাশাপাশি চলতে পারে অবশ্য যদি সে রকম ব্যবস্থা করা যায়। সিঁড়ি মূল্যবান কার্পেটে মোড়া। দোতলায় উঠতে সিঁড়ির মাঝখানে বিশ্রামের জায়গা। সেখান থেকে ডান ধারে বেঁকে আটটি মাত্র ধাপ পার হলেই দোতলা। নিচে, সিঁড়ি যেখানে শুরু হল, সেখানটা হচ্ছে অভ্যাগতদের অপেক্ষা করবার জায়গা। বহু আসন চক্রকারে সাজানো, মাঝখানে বড় গোল টেবিল। দূরে দূরে আরও সব বিচিত্র আসবাবপত্র। এক কোণে প্রকাণ্ড এক পিয়ানো—গ্র্যাণ্ড আপরাইট।

এত বড় বাড়ি, এত পরিপাটি, কিন্তু মানুষ মাত্র একটি—ত্রিশ বছরের একটি মাত্র যুবক, নাম রাজেন্দ্রকুমার। গায়ে সর্বদা ড্রেসিং গাউন।

রাজেন্দ্র স্বভাবতই বেকার। কাজ পায়নি বলে নয়, কাজ তার দরকার নেই। কি যে সে চায় তা সে জানে না, অথচ কিছু যে চায় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কখনো একখানা বই খুলে বসে (দশটি আলমারি বইতে বোঝাই), কখনো আয়নার সামনে (মানুষ-সমান কত যে আয়না যেখানে-সেখানে) চুল ব্রাশ করে, কখনো ছবি আঁকতে বসে, কিন্তু কোনোটাতেই তার মন বসে না। চেক-বই পকেটে নিয়ে ঘোরে, যখন-তখন চেক লেখে, সই করে, কিন্তু তখনই সেটা ছিঁড়ে ফেলে। কাকে দেবে চেক ? বই সামনে নিয়ে গান গায়, আয়নার সামনে দাড়ি কামাতে-কামাতে নাচে পিয়ানো বাজাতে-বাজাতে সিগারেট খায়। কখনো ডাকে ভজাকে। ভজা পরিচারক। বুড়ো মানুষ, ফতুয়া গায়ে, খাটো ধুতি পরা, কাঁধে গামছা, সর্বদা একটা গার্জিয়ান গার্জিয়ান ভাব।

আর একটি দৃশ্য : রাজেন্দ্র-ভবন থেকে কিছু দূরে একটি দোকানে নতুন সাইনবোর্ড টাঙানো হচ্ছে—তাতে ইংরেজীতে লেখা "ওয়াইনস অ্যাণ্ড ফুড।" পথচারী কেউ কেউ সেদিকে চেয়ে দেখছে, কিন্তু এ জন্য কারো কোনো ভাবনা নেই মনে হচ্ছে। কিন্তু দোকানের ভিতরে এক কক্ষে দোকানের ইহুদি মালিক জুডা সম্পূর্ণ ভাবনাশূন্য নয়। এ পাড়ায় মদ খাবার লোক আছে কি না সে জানে না, মাত্র সহজাত সংস্কার ও সাম্প্রতিক কিছু অভিজ্ঞতা তার ভরসা। বাপ-মা-হারা এলিজা জুডার সহকারিণী। জুডার বড় ভাইয়ের মেয়ে। সে বলছে, "এখানে দোকান খোলা এক বিরাট গ্যাম্‌লিং হল, হয় তো দু'দিনেই বন্ধ ক'রে পালাতে হবে।"

জুডা বলছে, "এ বুড়োর মন কিন্তু তা বলে না। আমার গণৎকারি যদি ঠিক হয় তা হলে দেখবি দোকান ভাল ভাবেই চলবে।"

মুখে বলছে বটে কিন্তু তবু জুডার মনে কিছু সন্দেহ আছে, সে খুব নিশ্চিত নয়। তবে পরীক্ষা করতে বাধা কি, এটাই তার মনের ভাব। এখন এলিজা যদি একটু উৎসাহ দেয় তবেই বৃদ্ধ জুডার মনে ভরসা জাগে। এলিজা উৎসাহ দেবে কি না সে কথা এখন থাক। এখন আমরা আবার ফিরে যাই রাজেন্দ্র-ভবনে।

দুদিন পার হয়ে গেছে এর মধ্যে। যথারীতি ড্রেসিং গাউন সজ্জিত রাজেন্দ্র দোতলার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো মাঝপথে, সেখান থেকে সিঁড়ির দ্বিতীয় পর্যায়। মনে যখন একটু স্ফূর্তি উদয় হয় তখন সে আর এই দ্বিতীয় পর্যায়ে সিঁড়ির ধাপে পা দেয় না, ঝকঝকে পালিশ রেলিং-এর উপর ঘোড়ার মতো চেপে সড়াং করে নিচে নেমে আসে। আজ অকারণ একটা আনন্দে নেমে আসছিল সেইভাবে—কিন্তু নিচে পৌঁছেই এমন এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হল যে লজ্জায়, সঙ্কোচে, বিস্ময়ে এবং সম্ভবত কিছু পরিমাণ ভয়ে, একেবারে কেঁচোর মত হয়ে গেল। একটি ভদ্র যুবক সিঁড়ির রেলিংএ স্লিপ ক'রে একটি ছোট বালকের মতো নিচে নেমে আসছে এ দৃশ্য আর যাকেই হোক একজন অপরিচিত যুবতীকে দেখাতে হবে তা সে কল্পনাই করতে পারে নি। তার মুখখানা হঠাৎ লজ্জায় বোকার মতো দেখাতে লাগল। কিন্তু এ কোন্ রাজকন্যার আবির্ভাব ঘটল তার সম্মুখে? সবুজ রঙের সিল্কের শাড়ীর পর্ণপুটে শিশিরভেজা লাবণ্য নিয়ে এ কোন্ বসরার গোলাপ ফুটে উঠল তার আঙিনায়?

রাজকন্যার মুখে মৃদু হাসি। মধুর ভঙ্গীতে মাথা হেলিয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, "আমি বাস্তহারা, আমার নাম হানা, হাসনু হানা।"

রাজেন্দ্র ঢোঁক গিলে বলল, "আপনি বা-বা-স্ত—"

হানা হেসে বলল, "বিশ্বাস হয় না বুঝি? অবশ্য আপনার দোষ নেই, সবাই বাস্তহারার মাত্র একটি চেহারাই জানে, অর্থাৎ বাইরের দিক দিয়ে যে সর্বহারা। কিন্তু সে কথা যাক, কেননা হঠাৎ এখন সব বুঝিয়ে বলা শক্ত, হয়তো আপনি এখন কাজে বেরিয়ে যাচ্ছেন।"

রাজেন্দ্র এতক্ষণে কিছু প্রকৃতিস্থ হয়েছে, সে সে-কথার ঘোর প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "না আপনি বসুন। বাস্তহারা কথাটার যে দু'মুখো অর্থ থাকতে পারে তা আমি আগে ভাবিনি।"

রাজেন্দ্রের এই অভিজ্ঞতার পথে হানা সহজেই তার অন্তরে প্রবেশ ক'রে গেল। তার মনের অন্ধকার কক্ষে কক্ষে হানা যেন আলো জ্বালাতে লাগল তার মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত কথার ঝলকে। রাজেন্দ্র যত বিস্মিত হতে লাগল, তত তার চেহারা ক্রমে বোকার মতো দেখাতে লাগল। আলাপ শেষে রাজেন্দ্র বুঝতে পারল মনের ভিতরেও একটা বাস্তু আছে এবং সেই বাস্তু থেকে চ্যুত হলেও বাস্তহারা হওয়া যায়। এই সংজ্ঞা অনুসারেই হানা বাস্তহারা, এবং মনের দিক দিয়ে কোথায়ও কোনো আশ্রয় না থাকাতে সেও বাস্তহারা। রাজেন্দ্র খুব খুশি হয়ে পকেট থেকে চেক-বই নিয়ে লিখতে শুরু করল—বলল, "আপাতত কত পেলে আপনি খুশি হবেন?"

হানা বলল, "টাকা চাই কে বলেছে? টাকা চাই না, মানুষ চাই। টাকা দেওয়ার লোক যথেষ্ট আছে। আমি এসেছি মানুষ খুঁজতে। সংসারে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাস্তহারা নামক এক বিরাট সম্প্রদায় আছে, তাদের তো টাকা দিয়ে কিছু করা যায় না। ধরুন আপনার তো যথেষ্ট টাকা আছে, কিন্তু তবু আপনি বাস্তহারা। তাই বলছিলাম আসুন আমরা এমন একটা প্ল্যান করি যাতে সত্যই এদের জন্য কিছু করা যায়। লক্ষ্মীটি, আমার কথাটা ভাবতে থাকুন, আমি আবার কাল আসব। কেমন?"

হানা বিদায় নিয়ে গেছে কখন রাজেন্দ্রের খেয়াল নেই। সমস্ত আবহাওয়া যেন একটা মধুর মাদকতায় ভরে উঠেছে। রাজেন্দ্র স্বপ্ন দেখছে: তার মন দেহ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, সে তার দিকেই চেয়ে আছে। মনের মাথায় বোঁঝা, পিঠে বোঝা, ঘরছাড়া আশ্রয়প্রার্থীর মতো সে প্রান্তর-পথ পার হয়ে চলেছে। আশ্রয় চাই, কিন্তু কে দেবে?

ভজা দূর থেকে এতক্ষণ সব লক্ষ্য করছিল, এবারে ধীরে-ধীরে কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, "বাস্তুহারা কে খোকাবাবু? কথাটা কানে এলো।"

রাজেন্দ্র চমকিত হল ভজার গলা শুনে। বলল, "আমি রে, আমি।"

"তিন-পুরুষের বাস্তু থাকতে বাস্তুহারা? ও মেয়ে তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে বলে দিচ্ছি। সাবধান থেকো। আর কখনো ওকে এখানে ঢুকতে দেব না।"

রাজেন্দ্র বলল, "না রে, না—ভয় নেই। আমি বাস্তুহারা, হানা বাস্তুহারা, তুই বাস্তুহারা—দুনিয়ায় যে যেখানে আছে সবাই বাস্তুহারা! আজ কি আনন্দ, কি যে ঘটে গেল রে ভজা, তুই নিতান্তই ভজা, তাই বুঝতে পারছিস না, বুঝতে চেষ্টাও করিস না।"—বলতে বলতে রাজেন্দ্র ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল এবং রেলিং-এর উপর দিয়ে সড়াৎ করে নিচে নেমে এসে পাগলের মতো পিয়ানো বাজাতে লাগল।

পরদিন আবার ওদের দেখা হল। এখন ওরা কথা বলার চেয়ে গান গাওয়াই বেশি পছন্দ করে। যখন-তখন গায়। ফুলগাছের ডাল ধরে ধরে গান গায়। সিঁড়ি ও আসবাবপত্রের আড়ালে-আড়ালে লুকোচুরি খেলার ভঙ্গিতে গান গায়। তার পর যখন হানা বিদায় নেয় তখন সিঁড়ির রেলিং বেয়ে যথারীতি নিচে নামতে থাকে।

দিন সাতেকের মধ্যে রাজেন্দ্রের জীবনে এবং মনোজগতে কি যে বিপর্যয় ঘটে গেল! হানা টাকা চায় না (যদিও এখন মাঝে-মাঝে নেয়), চেক লিখতে গেলেই থামিয়ে দেয় (সর্বদা ক্যাশ নেয়)—হানা মানুষ চায়। রাজেন্দ্রই কি সেই মানুষ? আগে ছিল না, এখন অবশ্যই হয়েছে। তার বাস্তুহারা সত্তাটি আবিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মানুষ হয়েছে।

রাজেন্দ্র যথাসম্ভব শক্তি সংগ্রহ করতে লাগল, আত্মসমর্পণের প্রস্তাব সে আজই করবে। একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, কিন্তু উপায় কি? তা ভিন্ন সময়ের কৃত্রিম বিস্তার একটা সংস্কার মাত্র, অন্তরের রাজ্যে এক মুহূর্তে এক বছর পার হওয়া যায়, সে কথা কি মিথ্যা? কোনো অপরিচিত ছেলে ও মেয়ের দেখা হল। ছেলে বলল, 'তোমাকে আমার ভাল লাগছে', মেয়ে বলল, 'আমারও লাগছে'—ছেলে তৎক্ষণাৎ বলল, 'তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই', মেয়ে বলল, 'চল।' এতে অন্যায় কিছু নেই। তবু এক জনের পছন্দ হলে অন্য জন যদি রাজি না হয়, সংসারে মারাত্মক বিষ, দড়ি-কলসী অথবা চলন্ত গাড়ির চাকা যথেষ্ট আছে। অতএব আজই সন্ধ্যায়।

সন্ধ্যায় যথারীতি ড্রেসিং গাউনে সজ্জিত রাজেন্দ্র হানার অপেক্ষায় রেলিং বেয়ে নিচে নেমে এলো। প্রতিদিন সে ঘড়ি ধরে ছটায় আসে। রাজেন্দ্রও ঠিক ছটার সময় নিচে নেমেছে, কিন্তু হানা কোথায়?

ভজা একখানা চিঠি এনে দিল তার হাতে। সে খাম ছিঁড়ে যা পড়ল তাতে তৎক্ষণাৎ তার হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হল না, কারণ কাহিনী এখানে শেষ হতে পারে না। চিঠিতে লেখা ছিল, "ক্ষমা চাই; কারণ, অসম্ভব। আমি চিরবিদায় নিচ্ছি। প্রিয়তম, আবার ক্ষমা চাই।"

রাজেন্দ্রকে উন্মাদ করার পক্ষে ঠিক এতখানি নিষ্ঠুরতার কোনো দরকার ছিল না। তবে মাত্রা কম হলেও প্রতিক্রিয়াটা একই হত সে কথা বলা বাহুল্য। মাত্রাধিক্যটা আমাদের চোখেই বেশি লাগছে।

রাজেন্দ্র চিঠি পড়ে ক্ষণকাল স্তম্ভিতবৎ দাঁড়িয়ে রইল, তার হাত-পা কাঁপতে লাগল, তার পর টলতে-টলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে গেছে। এমনি অবস্থায় পথে পথে পাগলের মতো ঘুরল কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ তার চোখে পড়ল মদের দোকানের সাইনবোর্ড। সে এর মধ্যে যেন একটা ইঙ্গিত পেয়ে গেল, যেন তার জন্যই এ দোকান এখানে অপেক্ষা করছে।

রাজেন্দ্রকে যখন কয়েক জন লোক ধরাধরি ক'রে এনে বাড়িতে পৌঁছে দিল তখন রাত বারোটা। ভজা ভয় পেয়ে গেল। রাজেন্দ্র জ্ঞানহারা মাতাল! এইবার ভজার জ্ঞান হারাবার পালা।

পরদিন সন্ধ্যায় তার জ্ঞান হল বহু চেষ্টার পর। সে বুঝতে পারল তার নিজের ঘরেই শুয়ে আছে সে। সব যেন স্বপ্ন, সব মরীচিকা। মদের তো আশ্চর্য শক্তি। সব ভুলিয়ে দেয়! তবে এসো সুরা দেবী, তুমিই আমাকে আশ্রয় দাও।

মদের দোকানের এই ইঙ্গিত পাঠক গোড়াতেই পেয়েছেন, রাজেন্দ্র পেল একটু দেরিতে। এক মরীচিকা-মরু পার হয়ে সে আর এক মরীচিকা-মরুতে প্রবেশ করল। এখন সে সর্বদা মদ খায়, নাচে, গায়, পিয়ানো বাজায়— যেমন সে আগে করত, কিন্তু তবু কত তফাৎ! এখন সে মৃত্যুপথযাত্রী। ডজন-ডজন বোতল আসে তার বাড়িতে। বন্ধুরা যারা খাব-খাব করছিল, এখন নিয়মিত এসে খায়, যারা গোপনে খেত, কেউ জানত না, তারা সবাই এসে জোটে রাজেন্দ্রের কাছে। তবু তারা কত তফাৎ! তারা কেউ ব্যর্থ প্রেমিক নয়। রাজেন্দ্র কখনো দোকানে ঢোকে, বন্ধুরাও যায় তার সঙ্গে, কিন্তু

বন্ধুরা অকম্পিত পায়ে যথাসময়ে স'রে পড়ে, রাজেন্দ্রকে চ্যাংদোলায় ঘরে ফিরতে হয়। বন্ধুত্বের অকৃত্রিম দলিল স্বাক্ষরিত হয় সুরাদেবীর সঙ্গে। দোকানের চেহারা ফিরে যায় ক'দিনের মধ্যে।

সেদিন সন্ধ্যায় দোকানেই বসেছে রাজেন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে। বন্ধুরা একে একে উঠে গেছে, এখন সে একা। তার এখনও অনেক বাকী। সম্পূর্ণ পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে মদ খাবে। মাঝে মাঝে জড়িত স্বরে 'হানা—হানা' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। হঠাৎ তার কানে এলো তার পাশের কেবিনে তারই দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনি। কে যেন সেখানেও 'হানা—হানা' ক'রে কাঁদছে। শেষে চার দিকের সকল কেবিন থেকে ঐ একই কান্না শোনা যেতে লাগল। নিজ নিজ কক্ষ থেকে সবাই বেরিয়ে এলো টলতে টলতে। সমবেদনায় বিগলিত হয়ে সবাই পরস্পর গলাগলি ক'রে বসে পড়ল মেঝের উপর, এবং হানাকে ওরা প্রত্যেকেই কেন চায়, কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা না ক'রে (করবার ক্ষমতা ছিল না) সবাই সমস্বরে কাঁদতে লাগল। তার পর সবাই একই দুঃখে দুঃখী, এটা অন্তর থেকে বুঝতে পেরে সবাই একসঙ্গে মদ খেতে লাগল।

প্রতিদিনের পৌনঃপুনিক এই ইতিহাস রাজেন্দ্রের একই, এর আর বর্ণনা ক'রে লাভ নেই, কিন্তু এর পর আর একটি দৃশ্য এখানে উন্মোচন করা আবশ্যক।

মদের দোকানের মালিক জুডার কক্ষ। রাত একটা। জুডা ও এলিজার মধ্যে আলাপ চলছে।

জুডা। "কেমন, বলেছিলাম না আমার মন্ত্র খাটবে? তুই আমাকে বোকা ভেবেছিলি, বলেছিলি এখানে দোকান চলবে না। তবে এতে তোর বাহাদুরিও কম নয়। যে দশ জনকে এনেছিস, তারা ও তাদের বন্ধু-বান্ধব মিলিয়ে দিন প্রায় দু'হাজার টাকা বিক্রি হচ্ছে। তোর বাংলা শেখা সার্থক, অভিনয় সার্থক।"

এলিজা। "কিন্তু কি ক'রে বুঝেছিলে যে এই সব বাঙালী যুবক প্রেমে ব্যর্থ হলেই মদ খাবে?"

জুডা। "আমি অনেক বাংলা সিনেমা দেখেছি কি না, ভাল ভাল সব শিক্ষিত ছেলেদের যদি একবার প্রেমে ব্যর্থ করানো যায় তা হলে মদ তারা খাবেই।"

এলিজা। "তা এক রকম সত্যিই। তুমি আরও খুশি হবে দেখে—আমি তোমার দোকানের মূলধনও অনেকখানি সংগ্রহ ক'রে ফেলেছি এর মধ্যে।"

এলিজা দশ হাজার টাকার নোট জুডার হাতে তুলে দিল। জুডা আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল, "তোর হানা নামটিও বেশ সার্থক হয়েছে বলতে হবে।"

এলিজা বলল, "কেন? বহু জায়গায় হানা দিয়েছি বলে?"

জুডা হাসতে হাসতে বলল, "তা এক রকম বটে। এইবার তুই সিনেমায় নামতে পারিস, আর আমার আপত্তি নেই। তোর বোম্বাই যাত্রা আজই ভোরের প্লেনে—টিকিট কেনা হয়ে গেছে।"

এর পর আরও একটি দৃশ্য বাকী আছে। এ দৃশ্যটি রাজেন্দ্রভবনে। রাজেন্দ্রের মৃতদেহের পাশে ডক্টর ভার্টিব্রেট এক্স-রে সরঞ্জাম নিয়ে বসে আছেন। তিনি ফিজিও-সাইকোলজি এবং সাইকো-ফিজিওলজি বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন বহু কাল। বর্তমানে তিনি বাঙালী যুবকদের অকালমৃত্যুর কথা শুনলেই সেখানে এসে তাঁর পরীক্ষা চালান। সঙ্গে বহনযোগ্য এক্স-রে সেট থাকে। এক্স-রে ফোটো তোলা হয়ে গেছে, এবারে তিনি অদৃশ্য আলোর ছবি স্ক্রীনে প্রতিফলিত ক'রে উপস্থিত ডাক্তারদের সামনে রাজেন্দ্রের মেরুদণ্ডের ছবি দেখাচ্ছেন। বলছেন, "এই দেখুন এর মেরুদণ্ড নেই, সম্পূর্ণ গলে গেছে। অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু সত্য। কারণ জন্ম থেকেই এর মেরুদণ্ড শক্ত ছিল না, হাড়ের উপাদানগুলো জেলির মতো নরম ছিল, তার উপরে সামান্য শক্ত একটি আবরণ ছিল মাত্র। কিছুদিন ধরে এক জাতীয় বাঙালী ছেলেকে লক্ষ্য করছি, তাদের মেরুদণ্ড জন্মাবধি ঠিক এমনি নরম। বাংলা সিনেমার নায়ক হবার ঝোঁক তাদের অত্যন্ত বেশি। সিনেমার নায়করূপে যদি সে প্রেমে ব্যর্থ হয় এবং মদ খায় (সবাই বলে উঠলেন "যদি" নেই, খাবেই) তা হলে আর তাকে বাঁচানো যাবে না, কেননা বেশি মাত্রার অ্যালকহলে এই জাতীয় মেরুদণ্ড ধীরে ধীরে গলে যেতে থাকে, ঠিক যেমন উগ্র অ্যাসিডে শক্ত ধাতু গলতে থাকে। অবশ্য এ ছেলেটি সিনেমায় যায় নি, তবে যাবার সম্ভাবনা ছিল ষোল আনা, দেখবেন অন্তত এর জীবনকাহিনীটি সিনেমার হাত থেকে বাঁচানো শক্ত হবে।"

কথাটি মিথ্যা বলেননি তিনি। কারণ ডক্টর ভার্টিব্রেট ডাক্তারদের সঙ্গে বেরিয়ে আসতেই দেখেন সিঁড়ির গোড়ায় ডজন খানেক সিনেমা ডাইরেক্টর রাজেন্দ্রের জীবন-কাহিনীর কপিরাইট কিনবেন বলে এসে জড়ো হয়েছেন।

(১৯৫০)

মার্কিন সিনেমা-সার

নিচের গল্পটি পড়িয়াই পাঠকের মনে হইবে কোনো ইংরেজি বই হইতে চুরি। কিন্তু কোন্ বই হইতে, তাহা বলিতে পারিবেন না। কারণ, কোনো পাঠকই ইংরেজি সকল বই পড়েন নাই। আবার যাঁহারা ইংরেজি বই মোটেই পড়েন না, কেবল সিনেমা দেখেন তাঁহারা মনে করিবেন, গল্পটি কোনো সিনেমা-ছবি হইতে চুরি, কিন্তু কোন্ সিনেমা-ছবি তাহা বলিতে পারিবেন না।

আমি নিজে কিছুই বলিতে চাহি না, অথচ পাঠকদিগকে ঠকাইবার প্রবৃত্তিও নাই। চুরি করিয়াছি বটে, কিন্তু কোনো একখানা বই বা ছবি হইতে নহে। বই হইতে বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে, আমি সিনেমা-ছবি হইতেই গল্পটি সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু কোন্ কোন্ ছবি হইতে তাহা আমার স্মরণ নাই।

পাঠকেরা অনেকেই অঙ্কশাস্ত্রে এইচ সী. এফ. করিয়াছেন, এবং আশা করি কেহ কেহ তাহা অদ্যাবধি মনেও রাখিয়াছেন। আমার এই গল্পটিও যাবতীয় সিনেমা-গল্পের এইচ. সী. এফ.। ইহাতে প্রায় সবই আছে। সকল সিনেমা-ছবিতেই যে একটি কমন ফ্যাক্টর থাকে তাহা ইহাতে আছে, কেবল গল্পটি নাই। কিন্তু গল্প দেখিতে তো আমরা সিনেমায় যাই না। দেখিতে যাই ঘাত এবং প্রতিঘাত। সিনেমায় যদি বিবাহ আগে হয় তাহা হইলে সে বিবাহ সুখের হয় না। আবার যদি বিবাহ পরে হয় তাহা হইলে ছবিখানি মিলনান্ত হইয়া পড়ে, সমঝদার খুশি হয় না। বিবাহ মোটেই হয় না অথচ চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হইয়া গেল, এই ধরণের গল্পে দর্শকের চোখে জল আসে। দেড় ঘণ্টার ছবির মধ্যে আধ ঘণ্টা যদি নায়ক-নায়িকার চুম্বনেই কাটে তাহা হইলে তো কথাই নাই। কেননা চুম্বন কোনো অবস্থাতেই মিলনের ইঙ্গিত নহে, উহা একটি রহস্যময় ঘটনা। উহা যে কিসের ইঙ্গিত তাহা বুঝা যায় না। নায়কের আকর্ষণে নায়িকা কাছে আসে, উভয়ে উভয়ের জন্য উন্মাদ হয়, নায়িকা যথারীতি ঘাড় উঁচু করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেয়, কিন্তু নায়ক যে মুহূর্তে নায়িকাকে চুম্বন করে সেই মুহূর্তে নায়িকার যাবতীয় স্মৃতিমূলক দুঃখ বুকের ভিতর উথলিয়া উঠে; তখন হয় সে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে, না হয় বলে, "How dare you?" নায়ক তখন নির্বোধের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার দিকে তাকায়, সাধ্যসাধনা করে, কিন্তু নায়িকা ততক্ষণে পাথর

হইয়া গিয়াছে, কোনো সাড়া দেয় না। নায়ক হতাশ হইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু চলিয়া যাইবামাত্র নায়িকার স্বপ্নভঙ্গ হয়। নায়ককে পাইবার জন্য তখন সে অস্থির হইয়া ওঠে, এবং তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু চুম্বনের পূর্বেই যদি দৈবক্রমে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ হইয়া যায় তাহা হইলে নায়ককে আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট অপরাধী হিসাবে কিংবা শত্রুহস্তে বন্দী অবস্থায় দেখি। গভর্ণমেণ্ট যখন ভুল বুঝিতে পারে তখনই গল্প শেষ হইয়া যায়। শেষ দৃশ্যের চুম্বন গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে।

দুষ্ট লোকের শত্রুতাও গল্পকে বিশেষ পুষ্ট করে। নায়ক শত্রুর হস্তে পড়িয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কতকগুলি লোক ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া নায়ককে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু এগুলি শুধু বৈচিত্র্য হিসাবেই দেখি, গল্পের মূলে পৌঁছিতে হইলে এসব অগ্রাহ্য করিতে হইবে। নায়ক-নায়িকা উভয়ে যতক্ষণ উভয়কে পাইবার জন্য ব্যাকুল, অর্থাৎ আকর্ষণ যতক্ষণ প্রবল ততক্ষণ প্রকৃতির কোন্ অলঙ্ঘ্য নিয়মে উভয়ের মধ্যে বিকর্ষণ চলিতে থাকে তাহা বুঝা যায় না। এবং বুঝা যায় না বলিয়াই সিনেমার আকর্ষণ ক্রমশ বাড়িতেছে। আকর্ষণের একটি বিশেষ কারণ এই যে সিনেমায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে যে ঘটনা-পারম্পর্য থাকে তাহাকে এরূপ অবশ্যম্ভাবী বা inevitable করিয়া তোলা হয় যে মানুষের জীবনে সিনেমাসুলভ ঘটনাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বোধ হয়। টাইপিস্ট বা পরিচারিকা এই সিনেমার অনিবার্য রীতিতে পড়িয়া লক্ষপতির গৃহিণী হইতেছে, পথের ভিখারী রাজা হইতেছে, অপরিচিত নায়ক-নায়িকা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবামাত্র গভীর প্রেমে পড়িয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে, অথবা হতাশ হইয়া তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিতেছে। ইহাই তো সত্যকার জীবন।

জীবনে যে ঘটনা আজ আরম্ভ হইল তাহার পরিণতি কত দিনে দেখা যাইবে তাহা কেহ জানে না। আবার যে পরিণতি দেখা যাইতেছে তাহার আরম্ভ কবে হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া রাখা দায়। সত্যকার জীবনে জীবনকে জানিবার এই অসুবিধা সিনেমা দূর করিয়াছে। সন্ধ্যা ছয়টায় যাহা আরম্ভ হইল রাত্রি আটটায় তাহার পরিণতি অবশ্যই দেখা যাইবে; এতটা নির্ভরতা আমরা প্রিয়তমের নিকট হইতেও আশা করি না।

প্রথম জীবনে সিনেমার সুখে সুখী হইয়াছি এবং সিনেমার দুঃখে বহু অশ্রুপাত করিয়াছি। এখনও অভ্যাসবশত সিনেমায় যাই বটে, কিন্তু তাহা সুখ বা দুঃখ অনুভব করিবার জন্য নহে, সন্ধ্যাটা কাটাইবার জন্য। জীবন-সন্ধ্যা যেমন

মানুষের মনে একটা নৈরাশ্য আনিয়া দেয়, দিন-শেষের সন্ধ্যাও তেমনি মনের উপর নিরাশার ছায়াপাত করে। ইহাই ত ছায়াচিত্র দেখিবার উপযুক্ত সময়। সমস্ত দিনের হিসাব মিলিয়া গেলে সময়ের উপর আর কোনো মায়া থাকে না। বৃদ্ধেরা পশ্চাৎ দিকে চাহিলেই সমস্ত জীবনটা একসঙ্গে দেখিতে পায়। কিন্তু জীবনে যদি কিছু অদৃশ্য অংশ না থাকে তাহা হইলে আশা করিবার, বিশ্বাস করিবার কিছুই থাকে না, অর্থাৎ জীবনের রহস্যটাই চলিয়া যায়; থাকে শুধু হরিনাম। সিনেমা দিন-শেষের হরিনাম।

অর্থাৎ ইহাতে সুখও নাই দুঃখও নাই, যদি কিছু থাকে তবে তাহা বিরক্তি। কিন্তু বিরক্তি হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি। মনের রহস্য যাহাদের আর ভাল লাগে না, তাহারা সাইকো-অ্যানালিসিস করে, বিশ্ব-পৃথিবীকে যাহারা ভালবাসিতে পারিতেছে না তাহারাই ইহাকে ধাঁধা আখ্যা দিয়া ধাঁধার উত্তর দিবার কাজে লাগিয়াছে। ইহারাই বৈজ্ঞানিক। আমিও এখন সিনেমার টেকনিক বিশ্লেষণ করিতেছি। এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়াই নিম্নলিখিত গল্পটি প্রস্তুত করিয়াছি। গল্পটি Made in India, কিন্তু ইহার অংশগুলি হলিউড হইতে সংগৃহীত। আমি assemble করিযাছি। একই গল্প বিভিন্ন পোষাকে আজ সাত বৎসর ধরিয়া দেখিতেছি। আমার গল্পে এই সাত বৎসরের দেখা গল্পসমূহের সার প্রস্তুত করিয়াছি মাত্র। বলা বাহুল্য, গল্প সম্পর্কে ইহা নিতান্তই অসার।

গল্প

বেলিংহাম গ্রামের লোকদের মধ্যে অস্বাভাবিক চঞ্চলতা দেখা যাইতেছে। গ্রামের যে কয়েকটি যুবক যুদ্ধে গিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশেরই মৃত্যু হইয়াছে, মাত্র একজন কি দুইজন এখনও জীবিত আছে।

বেলিংহাম ইংলণ্ডের উত্তরে নর্দাম্বারল্যাণ্ড জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রস্তুত একটি গির্জা আজিও এই গ্রামে বিরাজ করিতেছে। এই গির্জাঘরে গ্রামের বৃদ্ধেরা জুটিয়া যাহাতে জীবিতেরা জীবিত থাকে, মৃতেরা সদগতিলাভ করে এবং শত্রুপক্ষ হারিয়া যায় সেই মর্মে প্রত্যহ প্রার্থনা করে।

এই গ্রাম হইতে হ্যারি নামক তেইশ বৎসরের একটি দরিদ্র যুবক ১৯১৪ সালে যুদ্ধে গিয়াছে, আজ তাহার বয়স প্রায় সাতাশ বৎসর হইয়াছে,

আজিও সে ফেরে নাই, এখনও তাহাকে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইতেছে।

বেলিংহামের নামকরা কয়লার ব্যবসায়ী উইলিয়াম কেম্প তাঁহার দুই পুত্রকে মহাযুদ্ধে হারাইয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা লুসিকে লইয়া শোক প্রকাশ করিতেছেন। এই লুসির সঙ্গে হ্যারির কিঞ্চিৎ বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু লুসির পিতা দরিদ্র হ্যারিকে আমল দেন নাই, এবং কন্যাকে তাহার সহিত মিশিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু নদীর বেগ কেহ বাঁধ দিয়া ঠেকাইতে পারে না। বাধা পাইলে নদী সেখানে প্রথমত ঘোর আবর্ত সৃষ্টি করে, পরে হয় সে বাধা ভাঙিয়া ফেলে, না হয় অন্য পথ কাটিয়া চলে। লুসিও পিতার দিক হইতে বাধা পাইয়া থামিয়া থাকে নাই। সে তাহার তরুণী হৃদয়ের সমস্ত আবেগ লইয়া নূতন পথে প্রতিবেশী রবিন্‌সনের দিকে ছুটিয়াছিল। কিন্তু রবিন্‌সনও যুদ্ধে চলিয়া গেল। মহাযুদ্ধের আহ্বান, মহাকালের আহ্বান, মানুষের ক্ষমতা তাহার কাছে হার মানিতে বাধ্য।

এই সময় দেশের মধ্যে একটা নূতন ভাবের স্রোত বহিতেছিল। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেকার ব্যবধানবোধ সকলের মন হইতেই ঘুচিতে আরম্ভ করিয়াছে। জগৎ অনিত্য, কিছুই স্থির নহে, সমস্ত মায়া, এই সত্যটি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মনকেই আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। যখন তখন আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিতেছে, দলে দলে নূতন লোক যুদ্ধে যাইবার জন্য নাম লিখাইতেছে, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া জীবনটাকে ফানুসের মত আকাশে উড়াইয়া দিতেছে। জীবন লইয়া খেলা ; লক্ষ লক্ষ প্রাণ হাওয়ায় ছড়াইয়া দেওয়ার খেলা।

রবিন্‌সনের মৃত্যুসংবাদ আসিল। মৃত্যুসংবাদে নূতনত্ব নাই। একটি সন্তানের মৃত্যুর জন্য একটি পিতা বা একটি মাতার পৃথক ভাবে কাঁদিবার দরকার হয় নাই। য়ুরোপের সকল সন্তানের জন্য সকল পিতামাতা সমগ্রভাবে কাঁদিতেছে।

রবিন্‌সন মরিল। লুসিও তৎক্ষণাৎ হ্যারির স্মৃতিটি নূতন করিয়া মনের মধ্যে ঝালাইয়া লইল। হ্যারির পরিত্যক্ত ফোটোখানা লকেটের ভিতর আশ্রয় পাইয়া আবার তাহার বুকে দুলিল। যুদ্ধের কঠিন ধাক্কায় ধনীদরিদ্র-বোধ সকলের মন হইতেই ঘুচিয়া গিয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধশেষে যদি হ্যারি প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে তবে লুসির সঙ্গে তাহার মিলন ঘটিতে অন্তত লুসির পিতার দিক হইতে আর কোনো বাধা থাকিবে না। হ্যারি নিরাপদে ফিরিয়া আসুক, তাঁহার মন দিবারাত্র এই প্রার্থনাই করিতেছিল। না আসিলে

কি উপায় হইবে? বহু বর্গমাইলের মধ্যে লুসিকে বিবাহ করিতে পারে এরূপ যুবক কেহ জীবিত ছিল না।

ইতিমধ্যে আমরা মহাযুদ্ধের শেষ অধ্যায় দেখিতেছি। ফ্লাণ্ডার্স হইতে জার্মানগণ ছটিয়া যাইতেছে। হ্যারি প্রকৃত বীরের মত যুদ্ধ করিতেছে। চারিদিকে সৈন্যগণ কেহ মরিতেছে, কেহ আহত হইতেছে, কেহ আর্তনাদ করিতেছে, কিন্তু হ্যারি অক্ষতদেহে দৃঢ়চিত্তে দাঁতে দাঁত চাপিয়া মেশীন গান ছুঁড়িতেছে। চারিদিকে অন্ধকার, বজ্রের ন্যায় কামানের গোলা শূন্যে ফাটিয়া মাঝে মাঝে সেই অন্ধকারের বুক আলোকিত করিতেছে। সেই আলোর দীপ্তিতে আমরা হ্যারির অমানুষিক বীরত্ব উপভোগ করিতেছি। জার্মানগণ বিরামহীন মেশীন গানের সম্মুখে টিকিতে পারিল না, এবং এই পরাজয়ের ফলে তাহারা **St. Quentin** ফরাসীদিগকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল।

আমরা গল্পের প্রারম্ভে দেখিয়াছিলাম, লুসি হ্যারির ফোটো আবার লকেটে স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে কত কি পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা দেখিবার অবসর পাই নাই। য়ুরোপ এমন একটি অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যখন প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে এক একটি যুগান্তর ঘটিয়া যাইতেছে। লুসিকে আমরা বেলজিয়ামের একটি গ্রামে নার্স অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি। একা উদ্বেগপূর্ণ মনে চতুর্দ্দিকের একটা অস্থিরতার মধ্যে প্রতিনিয়ত বাস করার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া নার্সের কাজ করা ঢের সহজ। লুসি, মনের সহিত এবং পিতামাতার সহিত অনেক দ্বন্দ্ব করিয়া রিক্রুটিং অফিসারের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত সেবাধর্মই গ্রহণ করিল। রবিন্‌সন নাই। দেশে আর কেহই নাই। লুসি কাহার আশায় থাকিবে? হ্যারি এখনও জীবিত। হ্যারি দরিদ্র কিন্তু সে শুধু লুসির পিতার কাছে। তবে হ্যারির যুদ্ধখ্যাতি লুসির পিতার কাছেও পৌঁছিয়াছিল, এবং তিনিও শেষে হ্যারির প্রশংসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই প্রশংসাই লুসির মনে সহসা নূতন করিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। বিশেষত যুদ্ধক্ষেত্রে ধনীদরিদ্র ভেদ নাই, সকলেরই এক পোশাক, এক কর্তব্য।

লুসি সত্যিই সিষ্টার হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার চেহারার মধ্যে একটা স্বর্গীয় দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। একান্ত নিষ্ঠার সহিত সে আহত সৈনিকগণকে সেবা করিতেছে; সে যেন বহুকালের অভ্যস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধা, কে বলিবে সে মাত্র পনেরো দিন হইল নূতন জীবন গ্রহণ করিয়াছে। বহিরাবরণ শুভ্র হইলেও লুসির অন্তরে উদ্দীপনার রাক্তমা। এই উদ্দীপনা না থাকিলে কেহ কোনো প্রেরণা লাভ করে না। নার্সের কাজ সহজ নহে। নির্বিকার

চিত্তে আহতের আর্তনাদ সহ্য করিতে হয়। চারিদিকে বিকৃত এবং বিকলাঙ্গ মানুষের মধ্যে সর্বদা বাস করিতে হয়, মনকে কঠিন করিয়া না রাখিলে চলে না।

লুসি অবসর পাইলেই হ্যারির ফোটোর লকেটখানা খুলিয়া দেখে, আপনার মনে কি ভাবে, ছবিটাকে চুম্বন করে, একবার লকেট বন্ধ করে কিন্তু আবার খোলে, আবার চোখের জলে লকেট ভিজিয়া যায়, আবার তখনই চোখ মুছিয়া রোগীকে ঔষধ খাওয়াইতে যায়।

হ্যারিদের দলের একটি যুদ্ধ শেষ হইয়া তাহারা একটি শহরে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। ফরাসী হোটেল। মদ আর স্ত্রীলোকের মধ্যে সৈন্যগণ বেপরোয়া স্ফূর্তি চালাইতেছে। নাচিতেছে, গাহিতেছে, মারামারি করিতেছে। হ্যারি যে মেয়েটির সঙ্গে বসিয়া মদ খাইতেছে, সে মেয়েটি অল্প ইংরেজি জানে। তাহার মুখে একটা লাবণ্য এবং একটা বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার নাম লী। অদূরে বাজনা বাজিতেছে। কি একটা সুর বাজিতেই লী হ্যারির হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। সুরের সঙ্গে তাহার নাচিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। লী হ্যারিকে লইয়া নাচিতে লাগিল।

হ্যারি লীর মুখের দিকে চাহিয়া নাচিতেছে এমন সময় হঠাৎ তাহার নাচ থামিয়া গেল। সে লীর চোখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। লী সে দৃষ্টির প্রভাব সহ্য করিতে পারিল না। দুইজনে একটা মাদকতায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দুইজনেই দুইজনের মধ্যে যেন একটা জন্মান্তরের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিল। যেন উভয়ে বহু জন্ম ধরিয়া উভয়কে চেনে। এই উপলব্ধির মুহূর্তে বাহিরের জগৎ তাহাদের কাছে লুপ্ত হইয়া গেল। দুইজনে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া চুম্বনের মধ্যে সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ ডুবাইয়া দিল। সমস্ত চঞ্চল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দুইটি স্তব্ধ প্রাণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—সে কি মহিমময় দৃশ্য!

কিন্তু স্ত্রীলোকের মন রহস্যময়। এই মুহূর্তে তাহার কি এক স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এত দিন নাচ গান ও আত্মবিক্রয়ের সহস্র মুহূর্তগুলি অবলীলাক্রমে পার হইয়া যাইবার সময় তো এই স্মৃতি তাহার মনে জাগে নাই! এখন কেন জাগিল? তাহার উত্তর লী দিতে পারে না, কিন্তু তাহার চোখে জল আসিল। হ্যারি টেবিল হইতে মদের গ্লাসটি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, লী, আমাকে ক্ষমা কর, আমি কি অজ্ঞাতসারে তোমাকে আঘাত দিয়াছি? কোনো অতীত দুঃখ কি তোমার মনে জাগিয়াছে? বল, লী, বল—আমি যে আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।

কিন্তু লী কোনো কথাই বলিল না। টপ টপ করিয়া তাহার অশ্রু মদের গ্লাসে পড়িতে লাগিল। তারপর হঠাৎ গ্লাসটি টেবিলের উপর রাখিয়া লী বাহির হইয়া গেল। হ্যারি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল সেখানে অপেক্ষা করিয়া পরক্ষণেই লীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া হ্যারি লীকে ধরিয়া ফেলিল, এবং আবেগভরে বলিল, লী, আমাকে কঠিন শাস্তি দাও, কিন্তু এরূপ ভাবে কথা না বলিয়া চলিয়া যাইও না।

লী তথাপি নিরুত্তর। হ্যারির সহ্যের সীমা ভাঙিল। সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এমন সময় দূরে সৈন্যদের স্থানত্যাগের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। হ্যারির বুক সেই বাদ্যের তালে তালে ফুলিতে লাগিল। আর মাত্র এক মিনিট সময়। হ্যারি ঘড়ি দেখিল। ঘর হইতে সৈন্যগণ বাহির হইতেছে। তাহাদের হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকেরাও বাহিরে আসিয়াছে, সকলেই বিদায় চুম্বনে মত্ত হইয়াছে, কিন্তু হ্যারির জীবন মরুভূমি। লী এখনও তাহার নীরবতা ভঙ্গ করে নাই। পাশেই একটা ছোট গাছ ছিল, অগত্যা হ্যারি তাহার পাতাগুলি টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, কিন্তু তথাপি লীর মৌনব্রত ভঙ্গ হইল না। হ্যারি গাছের শেষ পাতাটি ছিঁড়িয়া চিৎকার করিয়া বলিল, নিষ্ঠুর।—তার পরই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

লীর যেন হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গ হইল। চারিদিকে উন্মত্তের মতো চাহিল, দেখিল হ্যারি নাই। সেখান হইতে সৈন্যদের লাইন ধরিয়া ছুটিতে লাগিল, প্রত্যেক সৈনিকের মুখের দিকে ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে ছুটিতে লাগিল, কিন্তু কোথায় হ্যারি

মার্চ সঙ্গীত বাজিতেছে। লীর যেন মনে হইতেছে তাহারই অন্তর ভেদ করিয়া বিদায়-বাদ্য বাজিতেছে। স্ত্রীলোক হইয়া সে কত সহ্য করিবে। লী আর দৌড়াইতে পারিল না, পথের ধারে বসিয়া পড়িল। তাহার বুকের মধ্যে তখন মহাসমুদ্রের ঢেউ ভাঙিতেছে। কতক্ষণ লী সেখানে বসিয়া ছিল তাহা তাহার খেয়াল নাই। যখন উঠিল তখন চারিধারে কেহ নাই, লী একা সেই জন-বিরল মাঠে রাত্রির অন্ধকারের মতোই অন্ধকার দৃষ্টি লইয়া পথ চলিতে লাগিল।

লী এক পা এক পা করিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিল। বেদনাভারে মাথা নিচু হইয়া গিয়াছে, চোখ হইতে অশ্রুর স্রোত বহিতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া যে টেবিলটিতে তাহারা কিছুক্ষণ পূর্বে বসিয়াছিল সেইখানে আসিয়া লী কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে মদের গ্লাসটি তুলিয়া

লইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর সেটাকে চুম্বন করিল, তারপর সেটাকে লইয়া ধীরে ধীরে ঘরে গেল। লী হোটেলেই থাকে, হোটেলের ক্রেতাকে সে গান গাহিয়া খুশি করে, মাহিনা পায় একশত ফ্রাঁ।

ইহারই মধ্যে আমরা এক মাস পার হইয়া আসিলাম। পার হইতে মুহূর্তকাল লাগিল। কিন্তু এই মুহূর্তকালের মধ্যে কি আমরা অন্য কিছুতে দৃষ্টিপাত করি নাই? করিয়াছি। আমরা ইত্যবসরে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা দেখিয়াছি। অবিশ্রান্ত কামানের গর্জন, ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া, জল, পাঁক, কাঁটা তার, মেশীন গানের গুলি, এয়ারোপ্লেন হইতে বোমা নিক্ষেপ উপেক্ষা করিয়া সৈন্যদের যুদ্ধ কৌশল দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথে বিদ্যুতের ঝলকের মতো ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; দলে দলে লোকের প্রাণ বিসর্জন দেখিয়াছি, মৃত্যুযন্ত্রণার মর্মভেদী হাহাকার শুনিয়াছি, তারপর হঠাৎ যুদ্ধের সমস্ত কোলাহল এবং দৃশ্য চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া দিনের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দেখা গেল, প্রকাণ্ড একটা বাড়িকে সাময়িক ভাবে হাসপাতালে পরিণত করা হইয়াছে। রোগীর শয্যাগুলি পর পর চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। যুদ্ধের আহত সৈনিকগণ, কাহারো হাতে কাহারো পায়ে কাহারো মাথায় কাহারো বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। পর পর শুইয়া আছে। নার্সগণ অতি তৎপরতার সহিত রোগীদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি রোগী আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তাহার প্রবল জ্বর ও বিকার, খুব সম্ভব ক্ষতস্থান সেপটিক হইয়াছে। পাশে নার্স তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছে, ইহারই মধ্যে নার্স একবার তাহার উত্তপ্ত কপালে নিজের মুখখানি রাখিল, কিন্তু অসহ্য উত্তাপে বেশিক্ষণ রাখিতে পারিল না। বলা বাহুল্য রোগীটি হ্যারি এবং নার্সটি লুসি। লুসির চোখে ক্ষণে ক্ষণে জল দেখা যাইতে লাগিল। শত শত আর্ত রোগীর সান্ত্বনা লুসি, সেই লুসির আজ সান্ত্বনা নাই। লুসি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল। মনে মনেই বলিল, হ্যারি, হ্যারি, তোমারই জন্য আমি আজ পিতামাতাকে, দেশকে, ত্যাগ করিয়া অপরিচিত দেশে অপরিচিত লোকজনের মধ্যে বাস করিতে আসিয়াছি—তুমি ফিরিয়া চাও। তোমারই জন্য আজ আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী—

হঠাৎ লুসির মনে স্বর্গীয় আলো জলিয়া উঠিল। সে সন্ন্যাসিনী এই কথাটি স্মরণ করিতেই তাহার বিবেক তাহাকে কশাঘাত করিল। সন্ন্যাসিনী?—তাহা

হইলে এই মোহ কেন? মায়া কেন? না—ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। সন্ন্যাসিনী, লুসি সন্ন্যাসিনী। ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। লুসি সন্ন্যাসিনীই হইবে, মায়া, মোহ, আসক্তি মন হইতে দূর করিয়া দিবে। লুসির মনে জোর আসিল, তাহার নয়নকোণে স্বর্গীয় হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল। লুসির চোখে হ্যারিতে আর অন্য রোগীতে কোনো ভেদ রহিল না। সে প্রাণপণে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিল।

আহত সৈনিকদের মধ্যে কেহ মরিল, কেহ আরোগ্য লাভ করিল; হ্যারিও যথাসময়ে আরোগ্য লাভ করিল। প্রথম জ্ঞান হইতেই সে সেবা-রতা লুসিকে দেখিল কিন্তু চিনিতে পারিল না। তাহার পাঁচ বৎসরের স্মৃতি যেন অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। আর, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের হাসপাতালে তাহারই বাল্যসখী লুসি আসিতে পারে ইহা তাহার কল্পনার অতীত। হ্যারি বিহ্বলনেত্রে লুসির দিকে চাহিয়া থাকে। লুসি তাহার দৃষ্টিপথ হইতে নিজেকে সরাইয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। কিন্তু কতক্ষণ? কর্তব্য তাহাকে করিতেই হয়—তাহাকে সকলের নিকটেই যাইতে হয়।

হ্যারি লুসিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, তুমি কে? লুসি গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, বেশি কথা বলিও না, ঔষধটি খাও। কিন্তু হঠাৎ হ্যারি তাহাকে চিনিতে পারিল। বলিল, তুমি লুসি—তোমাকে চিনিয়াছি। লুসি বলিল, আমি সন্ন্যাসিনী।

হ্যারি নাছোড়; সে তথাপি বলিল, না-না, তুমি লুসি, আমার লুসি।

এখন আর নই, এখন আমি সন্ন্যাসিনী।

হ্যারি আনন্দে প্রায় বিছানায় উঠিয়া বসিল। তারপর লুসির হাত ধরিয়া বলিল, লুসি, যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে তুমি আমার।

লুসি হাত ছাড়াইয়া লইল। আবার দ্বন্দ্ব! মনের সঙ্গে হৃদয়ের, বিবেকের সঙ্গে প্রবৃত্তির। লুসি নিরপেক্ষ দর্শক। যে জয়লাভ করে, লুসি তাহাকেই আত্মসমর্পণ করিবে। লুসি হ্যারিকে জোর করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। তিন দিন দ্বন্দ্ব চলিল, চতুর্থ দিনে দেখা গেল বিবেকই জয়লাভ করিয়াছে। লুসি স্থির করিল, ভগবানের আদেশে' তাহাকে সন্ন্যাসিনী থাকিতে হইবে, অন্য পথ নাই।

এই চারদিনের মধ্যে হ্যারিও সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে। সন্ধ্যাবেলা হাসপাতালের বাহিরে লুসি ও হ্যারির সাক্ষাৎ হইয়াছে। হ্যারি বলিতেছে, লুসি, লুসি, তুমি আমাকে মৃত্যুর হাত হইতে ফিরাইয়া

আনিয়াছ, আবার কি আমাকে মৃত্যুর পথে ফেলিয়া যাইবে ? চল আমরা দেশে ফিরিয়া যাই ; আমরা নূতন সংসার পাতিয়া নবজীবনের উদ্বোধন করি।

লুসি নিরুত্তর। তাহার মুখ এতক্ষণ নিচের দিকে ছিল, এখন তাহা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। হ্যারি শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

হ্যারি মাটিতে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাটি খুঁড়িতে লাগিল। তাহার উত্তেজনা চরমে উঠিয়াছে। উত্তেজনায় ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিতেছে না। তবু দুই হাতের মুঠায় খানিকটা করিয়া মাটি প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বল, লুসি, একটা কথা বল।

লুসির মুখ সম্পূর্ণ আকাশের দিকে ফিরিল। অন্ধকার আকাশ হইতে একটা জ্যোতি লুসির মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে স্বর্গের দেবী বলিয়া ভ্রম হইতেছে। কিন্তু হ্যারি এত সহজে পৃথিবীর ধর্ম ছাড়িতে পারে না। সে তাহার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা লইয়া দুঃখে এবং ক্ষোভে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর হাতের মুঠা হইতে মাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উত্তেজিত ভাবে হাসপাতালের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

লুসি একই ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার সমস্ত দেহ মন ঝিম ঝিম করিতেছে -নড়িবার শক্তিও যেন নাই। হঠাৎ তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বপৃথিবী তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

পরদিনই লুসি অসুস্থতার জন্য ছুটির আবেদন করিয়াছে। তাহার দেহ মন ভাঙিয়া পড়িয়াছে—কোনো কাজই সে আর করিতে পারে না, কেবল ভগবানের আদেশে বাঁচিয়া আছে মাত্র। এই হাসপাতালে থাকিলে যে তাহার আর উদ্ধার নাই ইহাও সে বুঝিয়াছে—সুতরাং তাহাকে স্থান ত্যাগ করিতেই হইবে। যথাসময়ে ছুটি মঞ্জুর হইল। তাহার স্থানে নূতন নার্স আসিল। লুসি তাহাকে কার্যভার অর্পণ করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহার এখনও সকল কাজ শেষ হয় নাই। তাহার ইচ্ছা হইল যাইবার সময় একবার সে হ্যারিকে দেখিবে এবং তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে। মনকে দৃঢ় করিয়া, ভগবানকে বার বার স্মরণ করিয়া সন্ধ্যায় সে হ্যারির নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। প্রথমে ভাবিয়াছিল, তাহাকে না দেখিয়া যাইবে, কিন্তু বিবেক কিছুতেই তাহা করিতে দিল না।

লুসি বুঝিতে পারিয়াছিল সে যাহা করিতে যাইতেছে তাহা সহজ নহে।

হ্যারির পরিচয় সে জানে। যে তাহাকে সাধ্যসাধনা করিয়া পায় নাই তাহারই নিকট সে বিদায় লইতে যাইতেছে! ইহা হ্যারির পক্ষেও যেমন অসহ্য, লুসির পক্ষেও তেমনি! কিন্তু তবু লুসি হ্যারির কথা ভুলিয়া নিজের কর্তব্যবোধটাকেই বড় করিয়া দেখিতে চায়। নিজের ক্ষমতার প্রতি তাহার যে একটা অসীম বিশ্বাস ছিল তাহা তো সেদিন ভাঙিয়া গিয়াছে। হ্যারিকে অগ্রাহ্য করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সে তো স্থির থাকিতে পারে নাই, মাথা ঘুরিয়াছিল, পা কাঁপিয়াছিল, মূর্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তবু লুসি নিজেকে বার বার কঠিন পরীক্ষা করিতে চায়। ইহা তাহার একটি দাম্ভিকতা।

ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে লুসি হ্যারির নিকট রওনা হইল। কিন্তু সেখানে পৌছিবামাত্র তাহার এ কি হইল? মনের জগতে যে একটা প্রচণ্ড প্রলয় ঘটিয়া গেল! ইহার জন্য তো লুসি আদৌ প্রস্তুত ছিল না। লুসি দেখিল, নূতন নার্স হ্যারিকে চুম্বন করিতেছে, আর বলিতেছে, প্রিয়তম, তোমারই জন্য এতকাল আমি সন্ন্যাসিনীর মত পথে পথে ঘুরিয়াছি।

হ্যারি লুসিকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, লুসি, এখনও বল—কিন্তু লুসি কিছুই বলিল না, তাহার বিবেক তাহাকে বলিতে দিল না। বলিতে দিল না বটে কিন্তু তাহার হাতের উপর বিবেকের কোনো প্রভাব ছিল না—লুসি বিদ্যুৎবেগে টেবিল হইতে মালিসের ঔষধের শিশিটি লইয়া ঢক ঢক করিয়া খানিকটা বিষ গিলিয়া ফেলিল। হ্যারি বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া লুসি লুসি করিয়া চিৎকার করিতে করিতে তাহার হাত হইতে বিষের শিশিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের মুখে খানিকটা ঢালিয়া-দিল।

সমস্ত হাসপাতালময় কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তৎপূর্বেই নূতন নার্স, হ্যারি হ্যারি, বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার হাত হইতে শিশিটি ছিনাইয়া লইয়া বাকী বিষটুকু মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিল।

মুহূর্তের মধ্যে কি একটা প্রলয় ঘটিয়া গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ শোচনীয় মৃত্যু কেহ দেখে না, সে জন্য সকলেই ইহা দেখিয়া ভীত হইল। কিন্তু যথারীতি চেষ্টা সত্ত্বেও উহাদের কেহ বাঁচিল না।

ক্ষণকাল পরেই দেখা গেল, তিনটি প্রেতাত্মা শূন্যপথে চলিতেছে। প্রথম চলিতেছে লুসি। তাহার দুইখানা হাত এবং দৃষ্টি স্বর্গের দিকে, মুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছে—ঈশ্বর—ঈশ্বর। লুসির পশ্চাতে চলিতেছে হ্যারি।

তাহার দুইখানা হাত ও দৃষ্টি লুসির দিকে—মুখ হইতে ক্রমাগত লুসি লুসি ধ্বনি বাহির হইতেছে। হ্যারির পশ্চাতে চলিতেছে নূতন নার্স। সে অবিরাম হ্যারি হ্যারি করিতেছে। বহুদূরে আর একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখা যাইতেছে, সেটা রবিনসনের।

বলা বাহুল্য রবিনসনের মুখ হইতে কোনো শব্দই বাহির হইতেছে না, এবং বাহুল্য হইলেও বলা প্রয়োজন যে নূতন নার্স আর কেহই নহে, হোটেলের সেই নী।

(১৯৩৪)

সেকাল ও একাল

বারো বছর বয়স হয়ে গেল রন্টুর, কিন্তু পড়াশোনায় এখনও মন বসল না। আর বসবেই বা কি ক'রে, বই খুলতে না খুলতেই দূরে ফটকের বাইরে একে একে দেখা যায় বন্ধুদের মাথা, রন্টু তখনই হঠাৎ বই ফেলে পালিয়ে যায় তাদের সঙ্গে। বুড়ো দাদু তার সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠেন না।

তাই একদিন তিনি ঠিক করলেন রন্টুকে ভাল ক'রে বোঝাবেন, বলবেন, যে দিনকাল পড়েছে তাতে মূর্খ হয়ে থাকলে আর চলবে না। না খেয়ে মরতে হবে যে। তাই পড়াশোনা করা অত্যন্ত দরকার।

কিন্তু এ রকম সামান্য দু'কথার উপদেশ দিলে কিছুই হবে না, তা তিনি জানতেন। তাই তিনি ভাবলেন, ওকে আজ সেকালের সঙ্গে একালের তফাৎটা কোথায় তা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে।

অবশ্য একদিনে বোঝানো শেষ হবে না, রোজ একটু একটু ক'রে বোঝাবেন।

আগের দিনের লোকের অবস্থা কত ভাল ছিল, লোকে কম পরিশ্রম ক'রে আরামে থাকত, সেই দিনের সঙ্গে আজকের দিনের তুলনাটা যখন ওর মনে গেঁথে যাবে, ও তখন হয়তো নিজে থেকেই বুঝতে পারবে পড়াশোনাটা কত দরকার।

সকালেই সেদিন দাদু রন্টুকে ডাকলেন, বললেন, আয় তো ভাই, একটা কথা শোন।

রন্টু তখন সামনে বই খুলে বাইরের দিকে কান পেতে আছে কখন বন্ধুদের পায়ের শব্দ শোনা যাবে। দাদুর ডাক শুনে বই ছেড়ে আসতে তার ভালই লাগল।

দাদু কি ভাবে যে কথাটা আরম্ভ করবেন ভেবে পেলেন না। বড় শক্ত কাজ। বহু কৌশলে একটু একটু ক'রে বলতে হবে। তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন কি সুখের দিনই না ছিল আমাদের—

রন্টু কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল তার দাদুর মুখের দিকে।

দাদু বলতে লাগলেন, কি দিন ছিল রে এদেশে! চাল ছিল এক টাকা

মণ—এক টাকায় কি না চল্লিশ সের! আর সে কি চাল! রান্নাঘরে ভাত রাঁধা হচ্ছে, সমস্ত বাড়ি সুগন্ধে ভরে উঠেছে!

—মাসে মাত্র তিন টাকার চাল, তাইতেই আমাদের বাড়িসুদ্ধ লোকের চলে যেত, আমরা তো পেট ভরে খেতামই, কত যে অতিথি আর আত্মীয়-কুটুম খেত তার সংখ্যা নেই।

—আর শুধুই কি চাল? সব জিনিসেরই ছিল মাটির দর। একটা পরিবারের জন্য মাসে পাঁচটি টাকার বেশি খরচ করতে পারতাম না।

বলতে বলতে দাদুর আবেগ বেড়ে গেল, যেন তিনি তাঁর চোখের সামনে তাঁর ছেলেবেলার সমস্ত ছবিখানি দেখতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, পদ্মানদীর ধারে ছিল বাড়ি, ভাবতে পারিস্ যে আটটি ইলিশ মাছও কিনেছি এক পয়সায়? সে কি ছড়াছড়ি মাছের! আমরা তো বর্ষাকালে মাছের শুধু ডিম খেতাম মাছ ফেলে দিয়ে। আর তরকারী? বাজারে গিয়ে আধ পয়সার বেগুন পটল লঙ্কা কিনলে বয়ে নেবার জন্য লোক ডাকতে হত। পয়সায় পাঁচটি লাউ, দুটো কুমড়ো, তিন সের বেগুন, পাঁচ সের লঙ্কা! খরচ করব কিসে? দুধ এক পয়সায় দু'সের, রসগোল্লার সের তিন আনা। কান্না পায় ভাই সে-দিনের কথা মনে হলে।—বলতে বলতে দাদুর গলাটা ধরে এলো, তাঁর চোখ দুটি ছলছল ক'রে উঠল। রন্টুও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

দাদু খুব খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার দুঃখটা তা হ'লে তুই বুঝতে পেরেছিস্ রে ভাই?

তোমার কথা ভাবছি না দাদু!– বলে রন্টু আরও একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

দাদু বেদনার সুরে বললেন, তবে?

রন্টু বলল, ভাবছি আমাদের সেকালের কথা।

—সে কি রে? তোদের আবার সেকাল?

—হ্যাঁ দাদু, যুদ্ধের আগে। সে কি কালটাই ছিল আমাদের! চাল ছিল চার টাকা মণ, মাছ ছিল ছ'আনা সের, মাংস দশ আনা, দুধ চার আনা! তরিতরকারী কত সস্তা ছিল, দাদু! আর কাপড়? দু'টাকা এক জোড়া ধুতি, আড়াই টাকা শাড়ী। ওঃ, সে কি সুখের কালটাই না ছিল!

বলতে বলতে রন্টুর গলাটা ধরে এলো, তার চোখে জল দেখা দিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, আর আজ মাছ পাঁচ টাকা সের, মাংস তিন টাকা, চাল পঁচিশ টাকা মণ!

দুই হাতে চোখ ঢেকে রন্থু কাঁদতে লাগল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে চোখ দুটি তার ফটকের দিকে ফেরানো। ইতিমধ্যে সেদিকে দু-একজন বন্ধুর মাথা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একে একে।

বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত দাদু রন্থুর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, যা খেলতে যা, তোকে বোধ হয় ওরা ডাকছে।

রন্থু চোখ মুছে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল ফটকের পথে।

(১৯৪৯)

নতুন দাওয়াই

সেলুন গাড়ি।

ক্ষণবিলাসের রাজকীয় আয়োজন।

দিনে আরাম ক'রে বসে এবং রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাক, হৈ হল্লা নেই, দমবন্ধ করা ভিড় নেই, অভিজাত সুলভ চাপা সুরে সংক্ষিপ্ত কথা ভিন্ন অন্য কোন শব্দ নেই।

দিনে কোমল আসনে বসে যাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চপ ক'রে বসে থাক বাইরের বিপরীতগামী ছুটন্ত দৃশ্যের প্রতি। চোখ খোলা রইবে, কিন্তু মন পড়বে ঘুমিয়ে। মনে স্বপ্ন জেগে উঠবে একের পর এক, দৃষ্টি রইবে উদাস। রাত্রে প্রশস্ত কোমল বিছানায় ঘুমিয়ে পড়বে স্বপ্নহীন গভীর ঘুম।···

সেলুন গাড়ি ছুটে চলেছে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে।

সেই গাড়ির মধ্যে অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে এক অভিজাত দম্পতি, পাশাপাশি বসে। স্বামীটি খুবই স্বাস্থ্যবান, বয়স পয়তাল্লিশ হবে। প্রকৃতি বড়ই গম্ভীর, স্ত্রীটি আশ্চর্য সুন্দরী।

অভিজাত ইংরেজ মহিলা ও তাঁর স্বামী। মূল কাহিনীটিও ইংরেজী।

স্বামী স্ত্রীর বিপরীত দিকের আসনে বসে এক যুবক। দেখলে মনে হয় যেন কোনো লর্ড বংশের বিলাসী পুত্র। চেহারায় যেমন আভিজাত্য, পোষাকে তেমনি জাঁক---বয়স ত্রিশের বেশি হবে না।

কিন্তু মহিলাটির সৌন্দর্য তাকেও যেন ম্লান ক'রে দিয়েছে।

গাড়ি ছুটে চলেছে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে। কারো মুখে কথা নেই।

মহিলার স্বামী যুবককে একটুখানি লক্ষ্য করলেন, তারপর তাঁর হাতের কাগজখানা তাকে দিয়ে বললেন "পড়ুন না এইখানা, উত্তেজক সব খবর আছে এতে।"

যুবকটি একটু চমকিত হয়ে ধন্যবাদ সহ কাগজখানা নিয়ে পড়তে লাগল।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। পাঠান্তে যুবক কাগজখানা ফিরিয়ে দিতেই স্বামীভদ্রলোক পুনরায় তাকে একখানা জনপ্রিয় মাসিকপত্র দিয়ে বললেন, "ওটা শেষ হয়েছে তো এইবার এইখানা পড়ুন।"

যুবক মাসিকপত্রখানা মনোযোগের সঙ্গে উল্টে পাল্টে দেখল ঘণ্টাখানেক ধরে। ভদ্রলোক লক্ষ্য করলেন বই দেখা তার শেষ হয়েছে। তখন তিনি

একটি মূল্যবান চুরুট দিলেন তাকে, দিয়ে বললেন, "অতি দুর্লভ হাভানা, আপনার ভাল লাগবে।"

ধন্যবাদ দিয়ে যুবকটি সিগার গ্রহণ করল এবং ধূমপানের কামরায় উঠে গেল।

প্রায় একঘণ্টা পরে ফিরে এল যুবক। কিন্তু আসামাত্র ভদ্রলোক একখানা ছোট্ট উপন্যাস তার হাতে দিয়ে বললেন, "এবারে এইখানা পড়ুন, অদ্ভুত ভাল বই। নতুন বেরিয়েছে, লেখক জনপ্রিয়, পড়তে শুরু করলে শেষ না ক'রে পারবেন না।"

যুবক পড়তে আরম্ভ করল সেই উপন্যাস। সত্যিই খুব ভাল, একঘণ্টার মধ্যে বই শেষ হয়ে গেল।

শেষ হতেই ভদ্রলোক বললেন "আরও একটি হাভানা নিননা, ভাল জিনিস সব সময়েই ভাল লাগে।"

যুবকটি বলল, "না, ধন্যবাদ, আর আমার সময় নেই, এইবার নামতে হবে আমাকে—এই পরবর্তী স্টেশনেই। আপনাকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই।"

"না না ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই, don't mention it."

যুবক এতক্ষণে মনখুলে কথা বলার সুযোগ পেল। এতক্ষণ সে ভদ্রলোকের ব্যবহারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল, তার কেবলই সন্দেহ হচ্ছিল ভদ্রলোক তাকে নিশ্চয়ই চেনেন, নইলে এত খাতির করবেন কেন। তাই সে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি আমাকে চেনেন?—কিছু মনে করবেন না আমার এই কৌতূহলের জন্য—হয়তো আগে আমাকে দেখে থাকবেন কোথায়ও?"

ভদ্রলোক বললেন "না, আপনাকে কখনো দেখিনি, চিনিও না।"

"আমার নাম জানেন?"

"না।"

"তাহলে দয়া ক'রে বলবেন আমার প্রতি আপনার এই স্নেহ এবং সৌজন্য কেন, আমাকে না জেনে আমাকে এত খাতির করলেন কেন, আমি তো এমন কোথায়ও দেখিনি। আপনাকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না, আমার মনে হয় আপনি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ, সহৃদয় এবং স্নেহপ্রবণ। আভিজাত্য আপনার মনের ধর্ম, আপনার কথা আমি আজীবন মনে রাখব, আপনাকে আমি আদর্শ মানুষ বলে উল্লেখ করব সবার কাছে, যদি দয়া ক'রে আপনার পরিচয়টা আমাকে দেন।"

ভদ্রলোক এই প্রশংসা বর্ষণে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন—

"যুবক, আমার এ ব্যবহারের কারণ আমি খুলে বলছি। ইতিপূর্বে যে সব 'লোফার'কে আমার স্ত্রীর মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকতে দেখেছি তাদের সহ্য করেছি বড়জোর একঘণ্টা, তারপর উঠে তাদের ঘাড় মটকেছি। ফলে অনেক হাঙ্গামা হয়েছে, খরচও হয়েছে অনেক। তাই আমি ভোল এবং ভঙ্গি বদলেছি। এখন আমি সেই সব 'লোফার'কে ঘুষ দেবার জন্য ভাল ভাল বই আর সিগার সঙ্গে রাখি। তুমি যদি আরও শ' খানেক মাইল আমাদের সঙ্গে যেতে, আমি তোমাকে ব্র্যাণ্ডি দিতাম, নতুন ক্রসওয়ার্ড ধাঁধা দিতাম, আরও দুখানা নতুন কাগজ দিতাম, আমার স্ত্রীও নিশ্চিন্তভাবে বসে থাকতে পারত।"

"কিন্তু—কিন্তু—আমি—"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে ঘাড় ধরে গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়ার চেয়ে এ অনেক শস্তা, হাঙ্গামা কম। আশা করি নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছে যাবে, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি বড়ই খুশি হয়েছি, আচ্ছা গাড়ি এবারে থেমেছে, বিদায়।"

(১৯২৭)

আগন্তুকের ডায়ারি

আজ ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৪৯, রবিবার। স্বর্গের একখানা দৈনিকের রিপোর্টার আমি। দুদিনের জন্য কলকাতা এসেছি। এখানে এসে প্রথমেই চোখে পড়ল সিকি মাইল দীর্ঘ বিভিন্ন বয়সের এক মানুষের সারি। এ বিষয়ে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না, শুধু স্বর্গের এক সংবাদপত্রে পড়েছিলাম কলকাতা শহরে চিনি দুষ্প্রাপ্য, সে জন্য ক্রেতারা তাদের নির্দিষ্ট চিনির বরাদ্দ এইভাবে দাঁড়িয়ে কিনতে বাধ্য হচ্ছে। চিনি সম্পর্কে আমার নিজের বিতৃষ্ণা, আমি স্বর্গ থেকে এসেছি—সেখানে সবই মধুর, সবই চিনির স্বাদ। তাই আমি এখানে চিনি সম্পর্কে সাক্ষাৎ কোনো অভিজ্ঞতাই লাভ করতে সঙ্কোচ বোধ করেছি। কিন্তু এত বড় দীর্ঘ সারির পাশ দিয়ে যাব অথচ পাশ কাটিয়ে যাব, কথাটা ভাবতে নিজেরই কাছে খারাপ লাগল, তাই একটু এগিয়ে গেলাম। উক্ত সারির একটা জায়গায় একটা পনেরো-ষোল বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখি বাইরের এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার সঙ্গে কি নিয়ে তর্ক করছেন। সমস্ত নীরব সারিটার মধ্যে ঐ একটিমাত্র স্থানেই কিছু কথা চলছে দেখে ঐখানেই এগিয়ে গেলাম. কিন্তু ওদের তর্কের কথাগুলো শুনে কেমন যেন সন্দেহ হল যে ওটা তাহ'লে চিনির লাইন নয়। কথা যেটুকু শুনলাম তা এই :

প্রৌঢ় ব্যক্তি : তোকে এত ক'রে বললাম চিনি নেই, চিনির লাইনে দাঁড়াগে যা, আর তুই এসে দাঁড়িয়েছিস সিনেমার লাইনে ? হতভাগা ছেলে—বেরো ওখান থেকে।

বালক চিনির লাইনে অতক্ষণ আমি দাঁড়াতে পারব না।

প্রৌঢ় ব্যক্তি : আমার নবাব পুত্তুর, এখানে তিন ঘণ্টা দাঁড়াতে পারেন—কাজের বেলা পা ব্যথা করে।

বিষয়টা নিতান্তই ব্যক্তিগত মনে হওয়াতে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আমার অন্যায় মনে হল, আমি দ্রুতবেগে সেখান থেকে সরে গিয়ে দূর থেকে তর্কের ফলাফল লক্ষ্য করতে লাগলাম। ওদের কোনো কথা আমার কানে গেল না, কিন্তু পরিণামটা চোখে দেখা গেল। দেখলাম, ছেলে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই রইল, প্রৌঢ় ভদ্রলোক উত্তেজিতভাবে সেখান থেকে চলে গেলেন।

লাইনের অপর প্রান্তের দিকে চেয়ে দেখলাম সিনেমাই বটে। সিনেমার আকর্ষণ তা হ'লে চিনির আকর্ষণের চেয়ে বেশি। ছেলেটির সঙ্গে এ বিষয়ে

কিছু আলাপ করার বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। আবার এগিয়ে গেলাম তার কাছে।

ছেলেটি দেখতে রোগা এবং কালো। মুহূর্ত আগে সে গাল খেয়েছে, কিন্তু চোখে-মুখে কিছুমাত্র উত্তেজনার ভাব নেই। দৃষ্টি ইতিমধ্যেই প্রশান্ত হয়েছে।

আমি ছেলেটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "যে সিনেমা ছবিটি দেখতে যাচ্ছ সেটি নিশ্চয় খুব ভাল?"

ছেলেটি এ প্রশ্নে অবাক হয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বলল, "জানি না, আগে দেখিনি।" উদ্ধত সংক্ষিপ্ত জবাব।

আমিও সবিস্ময়ে বললাম "ভাল কি না, না জেনেই যাচ্ছ?"

আমার কথায় হঠাৎ যেন ছেলেটির চোখ দুটি উন্মাদের মতো লাল হয়ে উঠল, ফস ক'রে সে ডানহাতের আস্তিন গুটিয়ে আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, "কি বললেন? ভাল মন্দ না জেনে যাই কেন?"

আমি ওর উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য ক'রে দু-পা পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছেলেটি বেশ চড়া গলায় বলতে লাগল "যাই, কারণ আমরা তরুণ, আমরা দিনক্ষণ মানি না, আমরা উদ্দাম, আমরা দুর্বার, দুঃসাহসী, দুর্মদ, দুর্ধর্ষ, আমরা হাউইয়ের মতো আগুন ছড়াতে ছড়াতে আকাশে উড়ে যাই, আমরা ধূমকেতু, আমরা"-

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, "থাক।" এবং দ্রুত পা চালিয়ে সেখান থেকে সরে একজন বয়স্ক লোকের কাছে গেলাম। বস্তুত সিনেমা সম্পর্কে আমার কৌতূহল এমেই অদম্য হয়ে উঠেছিল। যাঁর কাছে গেলাম তাঁকে বেশ সম্রান্ত এবং পরিণত বুদ্ধি বলে মনে হল। সুতরাং অনেকটা নির্ভয়ে তাকেও সেই পুরনো প্রশ্নটিই জিজ্ঞাসা করলাম, "ছবিটা নিশ্চয় ভাল?"

ভদ্রলোক এতক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে ছিলেন, আমার প্রশ্নে চমকে উঠে আমার দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, আমিও যথারীতি দু-পা পিছিয়ে যাবার উপক্রম করতেই ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে ভয় কেটে গেল, কারণ কণ্ঠস্বরে উন্মাদের লক্ষণ ছিল না। আমাকে সহাস্য স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "শহরে নতুন বুঝি?"

আমি বিনীতভাবে বললাম, "সম্পূর্ণ নতুন।"

"তাই বলুন! শহরের বাসিন্দা হলে এ কথা জিজ্ঞাসা করতেন না। কারণ সিনেমা ভাল কি মন্দ এ প্রশ্ন আমাদের কাছে অবান্তর।"

আমি বললাম "কিছু আগে একটা বালকও অনেকটা সেই রকমই বলছিল।"

ভদ্রলোক সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, "আগে আমাদের এই কিউ-এর দৈর্ঘ্যটা দেখুন "

'কিউ' অর্থাৎ সেই দীর্ঘ মানব সারির দৈর্ঘ্যটা আর একবার ভাল ক'রে দেখলাম। এতক্ষণ সেটি আকারে আরও বেড়ে গেছে, পিছন দিকটা ঘুরে একটা গলির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছে তাই মোট কতটা দীর্ঘ হয়েছে আর বোঝা গেল না।

ভদ্রলোক বললেন, "আধ মাইল হবে। এই মানব সারিকে সিনেমা ঘর পর্যন্ত পৌছতে অন্তত তিন ঘণ্টা লাগবে।"

"ভাল লাগে এ রকম দাঁড়ানো ?"

"বলেন কি! এই হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ—এইখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়ানো।"

আমি এর মধ্যে আকর্ষণ ঠিক কোথায় তা বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোক সেটি হৃদয়ঙ্গম ক'রে বলতে লাগলেন, "সিনেমা হচ্ছে দিনের সকল কাজের শেষে, সকল কর্তব্যের বোঝামুক্ত অবসরের মুক্তি। এই মুক্তি আমাদের শুরু হয় এইখানে কোনরকমে একটি স্থান পাবার পর থেকেই। মুক্তি যে সময় থেকে ঠিক শুরু হয়, সেই সময় থেকেই কি তা উপভোগ্য হয়ে ওঠে না ?"

"কথাটা ঠিক, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটু ধাঁধা থেকে যাচ্ছে, আরও একটু বুঝিয়ে বলুন।"

ভদ্রলোক বেশ খুশিভাবেই বলতে লাগলেন "কথাটা অত্যন্ত সহজ। সিনেমা হচ্ছে লক্ষ্য, আর এই কিউ হচ্ছে সেই লক্ষ্যে যাবার পথ। শাস্ত্রে আছে যত মত তত পথ, কিন্তু এই নীতি সিনেমায় সম্পূর্ণ খাটে না, বিশেষ ক'রে মধ্যবিত্তদের বেলায়। এখানে যত মতই থাক, পথ এই একটিই—এই দশ আনার পথ। দেখুন না কেন, আমি এপিডেমিক ড্রপসির রুগী, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে আমার পা ফুলে যায়, কিন্তু তবু এই পথ আমার ছাড়বার উপায় নেই। শুধু যে আমি ছাড়তে পারি না তাই নয়, এই মাইল-দীর্ঘ কিউতে যত লোক আছে সবাই নাছোড়।"

"আপনি অন্য সবাইকে অসুখের কথা বলে কিছু আগে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো আপনার সুবিধা হতে পারে।"

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন, "দাঙ্গা বেধে যাবে প্রস্তাব শুনলে। আমার

পা ফুলেছে, শুধু এই কৈফিয়তে পথ সংক্ষেপ করা চলবে না। এখানে ছোট-বড় সবল-দুর্বল সবাই এক, এখানে কেউ কারো চেয়ে ছোটও নয়, বড়ও নয়। ঐ দেখুন, মাঝে মাঝে দু একটি স্থান খালি পডে আছে, কিন্তু আসলে খালি নয়। ঐ সব শূন্য স্থানে শুধু এক জোড়া ক'রে জুতো ? কিন্তু এ পথের এমনই নিয়ম যে ঐ জুতো সরিয়েও সেখানে অন্য কেউ দাঁড়াতে পারে না।"

জুতোর মালিক কোথায় ভাবছি এমন সময় ভদ্রলোক বললেন "কেউ হয়তো বাডিতে খেতে গেছে, ছেলেদের কারো হয়তো প্রাইভেট টিউটর বাডিতে এসে গেছে, তাই জুতো দিয়ে জায়গার দখল চিহ্ন এঁকে বেরিয়ে গেছে লাইন থেকে। ওদের কাজ শেষ হলে ফিরে এসে আবার ঐ সব জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবে। ওদের অনুপস্থিতকালে জুতোই হচ্ছে ওদের প্রতিনিধি।"

আমি বললাম, "কিন্তু আপনাদের মুক্তি এইখান থেকে শুরু হলেও এর মধ্যে আনন্দ তো কিছু দেখছি না।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "না দেখাই স্বাভাবিক, কারণ কিউতে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা আপনার নেই। কিন্তু আমরা এইখানে দাঁডিয়ে চলমান সংসারের রূপ ভাল ক'রে দেখতে পাই। এইখানে দাঁডিয়ে আমরা নিজেদের ছবি দেখি। আমরা যখন নিজেরা চলি, তখন অন্যদের চলা আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু একবার এই কিউতে এসে দাঁড়ালে সব দৃশ্য বদলে যায়। এখানে চলমান মানুষের রূপ দেখি। হাজার হাজার লোক ছুটে চলেছে বিচিত্র লক্ষ্য পথে। এক একখানা ট্রাম ও বাস বোঝাই হয়ে চলেছে শত শত মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সাধু বুদ্ধি দুষ্ট বুদ্ধি। কেউ থেমে নেই, সবাই চলেছে। বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত এই পথে। কেউ উদাসীন ভাবে চলেছে, তার হয়তো এ সংসারে আশা করবার কিছু নেই, কেউ চলেছে গর্বিত পায়ে সচ্ছলতার ছাপ সর্বাঙ্গে ফুটিয়ে, এই পথে এই মধ্যবিত্ত পাডার পথে সে বড, হয়তো চলতে চলতে অভিজাত পল্লীতে গিয়ে সে নিজেকে হীন মনে করতে থাকবে। কিন্তু থাক এ সব কথা, এ সব আমাদের মনের চোখে দেখা ছবি, আপনি হয়তো এর রসগ্রহণ করতে পারবেন না।

আমি বললাম, "হয় তো তাই, কিন্তু আপনি আপনার নিজের দেখাকে সবার দেখা বলছেন কেন ? সব সময়েই আপনি 'আমরা' বহু বচনটি ব্যবহার করছেন, কিন্তু সত্যই কি এই কিউতে যত লোক দাঁডিয়েছে তারা সবাই আপনার মতো দেখতে পায় ?"

ভদ্রলোক উদাসীনভাবে জবাব দিলেন, "কি জানি, সবাই হয় তো এক রকম দেখে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস কিছু একটা আনন্দ তারাও এখানে পায়।"

আমি বললাম, "আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না, শুধু একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করব। আপনি বহু অসুবিধা ভোগ করছেন দৈহিক, সুতরাং দৈহিক ক্লান্তিও আপনার হচ্ছে। আবার মনের দৃষ্টি সব সময় জাগ্রত থাকায় মনও কিছু ক্লান্ত হচ্ছে। সুতরাং দৈহিক এবং মানসিক এতটা ক্লান্তি ভোগ করার পরে সিনেমা ঘরে গিয়ে যদি দেখেন ছবিটি খারাপ, তা হ'লে কি সব পরিশ্রমটাই ব্যর্থ মনে হয় না ?"

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, "কথাটা অন্যায় বলেন নি, কিন্তু আমার এবং আমার মতো আর সবার সম্পর্কে এ প্রশ্ন অবান্তর।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "কেন ?"

ভদ্রলোক বললেন, "লক্ষ্যে পৌঁছে আমরা তো সিনেমা দেখি না—আমরা আসনে বসেই ঘুমিয়ে পড়ি।"

আমি বিদায় নিয়ে কিউ বরাবর চলতে লাগলাম, কৌতূহল ছিল, শেষ প্রান্তটি গলির মধ্যে কতদূর বিস্তারলাভ করেছে তাই দেখব। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই থেমে যেতে হল। কিউতে দণ্ডায়মান এক ভদ্রলোক তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান এক তরুণ যুবককে গড় গড় ক'রে কি যেন বলে যাচ্ছেন। যুবকটি তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে (কিউতে যেমন থাকে) তার হাতে একখানা নোট বই ও পেন্সিল, আর ভদ্রলোকের একখানা মোটা বই।

ভদ্রলোক যুবকটিকে বলে যাচ্ছেন আর সে পেন্সিল দিয়ে খাতায় কিছু কিছু লিখে নিচ্ছে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠল, আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, "আমাকে মাফ করবেন, আমি বিদেশী, আমি আপনার এই আলোচনা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম, কিন্তু সিনেমার কিউতে রাষ্ট্র-নীতির এমন সুন্দর আলোচনাটা একটু ব্যর্থ হচ্ছে না কি ?"

ভদ্রলোক আমার দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার সম্মুখে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে সে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, আর আমি সেই কলেজের প্রোফেসর, সিভিক্স পড়াই। কিন্তু সেটাই সব কথা নয়, আমি ওর প্রাইভেট টিউটরও বটে। অথচ আমাদের দুজনেরই সিনেমা দেখার ঝোঁক খুব বেশি। তাই আমরা পরস্পর এই ব্যবস্থা করেছি যে, যে দিন আমরা সিনেমায় যাব সেই দিনের পড়াটা কিউতে দাঁড়িয়েই শেষ করব। এখানে সুবিধাও বেশি, কারণ বহু সময় এখানে নষ্ট হয় অকারণ, সেই সময়টা আমরা এই ভাবে কাজে লাগাই। কিন্তু সবাই যদি এভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করত, বিনা কাজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে না থাকত, তা

হলে শত শত লোকের তিন-চার ঘণ্টার কাজ যোগ হয়ে সেটা জাতীয় লাভে পরিণত হত সহজেই। এ বিষয়ে মেয়েরা অনেক উন্নত। ধরুন সিনেমার জন্য যদি মেয়েদের কিউ হত, তা হ'লে দেখতেন সেখানে তারা প্রত্যেকেই হয় উল বুনছে, কিংবা রুমাল তৈরি করছে, কিংবা জামা সেলাই করছে। আমি মশায় অর্থনীতির ছাত্র, তাই এভাবে ম্যান-পাওয়ার এবং ম্যান-আওয়ার নষ্ট হতে দেখলে আমার গা জ্বালা করে।"

আমি বললাম, "কিন্তু সিনেমায় দু তিন ঘণ্টা বসে থাকাও কি সময় নষ্ট নয়?"

ভদ্রলোক বললেন, "না। কারণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ঐখানে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিই।"

"আপনিও ঘুমোন?"

"বয়স্ক লোক মাত্রেই ঘুমোয়। পরিণত বুদ্ধি যাদের, তাদের জাগিয়ে রাখবার মতো সিনেমা ছবি তৈরি হতে এখনো অনেক দেরি আছে।"

প্রোফেসরের কথাগুলো খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হল। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ওখান থেকে বিদায় নিলাম এবং কিউ অনুসরণ ক'রে অল্পক্ষণের মধ্যেই গলিতে গিয়ে প্রবেশ করলাম। কিন্তু এখানে দেখলাম একটি অতি বেদনাময় দৃশ্য। আমি ইতিমধ্যেই শহরের হালচাল সম্পর্কে এতটা বিজ্ঞতা লাভ করেছি যে, দৃশ্যটি দেখেই এবারে তার সমস্ত অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখলাম একটি উজ্জ্বল পোষাক পরা বারো-তেরো বছরের ছেলে কিউতে দাঁড়িয়ে আছে আর তার পাশে কিউ-এর বাইরে এক চশমা পরা বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে তাকে পড়াচ্ছেন। ধনীর ছেলে পয়সা চুরি ক'রে সিনেমা দেখতে এসেছে, কিন্তু দরিদ্র শিক্ষক, পাছে চাকরিটি যায় সেই ভয়ে, সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে কিউতে দণ্ডায়মান ছেলেকে যথা সময়ে পড়াতে এসেছেন। সিনেমায় গিয়ে ঘুমনোর মতো তাঁর পয়সা নেই, চেহারা দেখে মনে হল অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ঘুমোবেন, এবং সিনেমার বাইরেই।

(১৯৪৯)

লেখকের অন্যান্য বই

ট্রামের সেই লোকটি
ব্ল্যাক মার্কেট
ঘুঘু
ডিটেকটিভ শিবনাথ
মারকে লেঙ্গে
দুষ্মন্তের বিচার
আধুনিক আলোকচিত্রণ